পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)

ইদ্রিস আলী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৪১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মার্চ, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীন

এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেসবাহ কামাল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

ইদ্রিস আলী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৪১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, ইদ্রিস আলী, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. ফিল. গবেষক। তার গবেষণার শিরোনাম 'পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)'। রচিত ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং গবেষক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন।

তার অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে মুদ্রণ বা ডিগ্রির জন্য তিনি উপস্থাপন করেননি।

(ড. মেসবাহ কামাল)

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব রচনা। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সাময়িকীতে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

ইদ্রিস আলী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বর: ১৪১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নিরাপত্তা বরাবরই আমার আগ্রহের জায়গা। বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা খ্যাত ৬ দফা অধ্যয়নকালে ৬ দফার ৬ নম্বর দফা নিয়ে আমার কৌতুহল ছিল অন্য দফাগুলো থেকে একটু বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বেড়ে ওঠায় প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের সাথে নিত্য পরিচয় ঘটে। দুর্যোগ নিয়ে যখন একাডেমিক পড়াশোনা শুরু করি তখন ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কথা সামনে আসে। যে ঘূর্নিঝড়ের কারণে উপদ্রুত এলাকায় বহুল প্রতীক্ষিত ১৯৭০ এর নির্বাচন পিছিয়ে যায়। ১৯৭০ সালের ঘূর্নিঝড়ের ভয়াবহতা অতীতের সকল দুর্যোগের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়।

এই গবেষণাকর্মের প্রতিটা পর্যায়ে যার দিক নির্দেশনা, উপদেশ ও উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। তাঁর অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও করোনাকালীন সময়ে ই-মেইল, মেসেঞ্জার ও ফোনের মাধ্যমে তিনি আমার গবেষণার সার্বিক খোঁজ-খবর নিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের অধ্যায়গুলো যত্নসহকারে পড়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। স্যারের এই সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে সহযোগিতা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী আমাকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ , উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অধাপক নুরুল হুদা আবুল মনসুর স্যার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন অভিসন্দর্ভের বিষয়ে বিভিন্ন বইয়ের খোঁজ-খবর দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি ইতিহাস বিভাগের সকল শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, সাতক্ষীরা জেলা গ্রন্থাগার, সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরি, খুলনা জেলা গ্রন্থাগার, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার। এছাড়া প্রাথমিক উৎসের সন্ধানে যেতে হয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আরকাইভসে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনার অন্যতম উৎস সাক্ষাৎকার। যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার ক্ষেত্রে রেফারেন্স সহ খুটি-নাটি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন আন্তর্জাতিক জন-ইতিহাস ইনস্টিটিউটের অন্যতম পরিচালক ড. মো. শাহিনুর রশীদ টুটুল। এজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এম. ফিল. ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে মোঃ মাসুদুর রহমান, চন্দন কুমার বিশ্বাস ও শৈশব দে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার ছোট ভাই তুল্য ইলিয়াস হোসেন ও ইংরেজি বিভাগের শরিফুল ইসলাম। তারাও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

পরিশেষে এই গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপের সহযাত্রী আমার স্ত্রী মাহবুবা সুলতানার কথা বলব। সাংসারিক নানা ব্যস্ততার মধ্যেও সে আমাকে গবেষণার জন্য যেমন সময় বের করে দিয়েছে, তেমনি মানসিকভাবেও সাপোর্ট দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি ‘পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি যদি বাংলাদেশের নিরাপত্তার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সামান্যতম অবদান রাখে এবং শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকদের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হয়- তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ইদ্রিস আলী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

ক) আলোচনার উত্থাপন ২
খ) প্রকাশনা পর্যালোচনা ৪
গ) গবেষণার যৌক্তিকতা ৭
ঘ) গবেষণার পরিধি ৮
ঙ) গবেষণা পদ্ধতি ৮
চ) অধ্যায় বিভাজন ৯
ছ) গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

২.১ নিরাপত্তা কী ১৪
২.২ নিরাপত্তার প্রচলিত ধারণা ও প্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামোয় পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ১৬
২.৩ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতি ১৮
২.৪ নিরাপত্তার অপ্রচলিত ধারণা ২৬
ক) খাদ্য নিরাপত্তা ২৬
(১) খাদ্য সংকট নিয়ে মাওলানা ভাসানীর উদ্বেগ ৩২
(২) খাদ্য সংকট নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদ ৩৪
(৩) পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সভায় খাদ্য সংকট বিষয়ক আলোচনা ৩৫
(৪) লবণ সঙ্কট ৩৭
খ) জ্বালানি নিরাপত্তা ৪৩
গ) জলবায়ু পরিবর্তন ৪৬
ঘ) মানবিক নিরাপত্তা ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা ও যুদ্ধে বাঙালির ভূমিকা

৩.১ যুদ্ধের পটভূমি ৬২
৩.২ যুদ্ধে বাঙালির ভূমিকা ৬৫
৩.৩ যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা ৬৯
৩.৪ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলায় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ৭৩
৩.৫ পাক- ভারত যুদ্ধে বহিঃর্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ৭৫
৩.৬ পাক-ভারত যুদ্ধ ও ৬ দফা ৭৬

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৬ ও ১১ দফা এবং সত্তরের নির্বাচন ও জলোচ্ছ্বাসঃ নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন

৪.১ ৬ দফার পটভূমি ৮১
৪.২ ৬ দফার দফা সমূহ ৮২
৪.৩ ৬ দফায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যু ৮৩
৪.৪ ১১ দফাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ ৮৫
৪.৫ সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা ৮৮
৪.৬ জলোচ্ছ্বাস ও নিরাপত্তা সংকট ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ৯৬
৪.৮ জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ১০২
৪.৯ জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতায় ভাসানীর উদ্বেগ: শামসুর রাহমানের কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবি' ১০৮
৪.১০ ১৯৭০ এর সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস: সাধারণ নির্বাচনে এর প্রভাব ১১০

পঞ্চম অধ্যায়: ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা
৫.১ মুক্তিযুদ্ধকালীন অপ্রচলিত নিরাপত্তা ইস্যুসমূহ ১১৭
৫.২ মুক্তিযুদ্ধকালীন নিরাপত্তা সংকটে দেশবাসী ১২৩
৫.৩ শরনার্থীদের নিরাপত্তা ১২৫
৫.৪ মুক্তিযুদ্ধকালে চিকিৎসা ব্যবস্থা: শরনার্থীদের 'জয়বংলা' রোগ ১৩০
৫.৫ প্রতিরক্ষায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা ১৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার
উপসংহার ১৪০

গ্রন্থপঞ্জী **১৪৫**

পরিশিষ্ট তালিকা (Appendix)

পরিশিষ্ট: ১ পূর্ব বাংলায় লবণ সংকট ১৫৫
পরিশিষ্ট: ২ পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট বিতর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ১৬৭
পরিশিষ্ট: ৩ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সভায় প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বাজেট বক্তৃতা ১৭১
পরিশিষ্ট: ৪ আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী ১৮২
পরিশিষ্ট: ৫ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ১৯৭
পরিশিষ্ট: ৬ ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ২০০
পরিশিষ্ট: ৭ ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীর ভাষণ ২০৬
পরিশিষ্ট: ৮ সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি: পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (২০ মার্চ, ১৯৬৬) ২০৯
পরিশিষ্ট: ৯ ৬ দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে রংপুরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ২১২
পরিশিষ্ট: ১০ ৬ দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে যশোরে জনসভা ২১৭
পরিশিষ্ট: ১১ ৬ দফার পক্ষে চট্রগ্রামের সাতকানিয়ায় আওয়ামী লীগের জনসভার বিবরণী ২২৯
পরিশিষ্ট: ১২ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত স্থিরচিত্র ২৩৫
পরিশিষ্ট: ১৩ ৬ দফা সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র ২৩৭
পরিশিষ্ট: ১৪ ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত স্থিরচিত্র ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি-১: সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ১৯
সারণি-২: পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার অবস্থান ২০
সারণি-৩: ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দুই অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনীর আর্মি ও নেভিতে নিয়োগ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের বৈষম্য ২১
সারণি-৪: ১৯৪৭-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডিফেন্স সার্ভিসে দুই প্রদেশে বেসামরিক চাকরিজীবীর আনুপাতিক হার ২২
সারণি-৫: ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত Naval Dockyard এ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত স্টফদের সংখ্যা ২৫
সারণি-৬: পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের প্রাক্কলন ব্যয় ৫১
সারণি-৭: বন্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের গৃহীত প্রকল্প ও অর্থ বরাদ্দ ৫২
সারণি-৮: পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা (১) ৫৫
সারণি-৯: পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা (২) ৫৫
সারণি-১০: পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ৫৬
সারণি-১১: ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫৭
সারণি-১২: স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ৫৮
সারণি-১৩: ১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ১১২
সারণি-১৪: ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের প্রদেশ অনুসারে ফলাফল ১১৩
সারণি-১৫: ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন বিভিন্ন পণ্যের মূল্যমান ১২০
সারণি-১৬: বিভিন্ন প্রদেশে শরনার্থী অনুপ্রবেশ ১২৬
সারণি-১৭: শরনার্থী প্রতিস্থাপনের পর বিভিন্ন প্রদেশে শরনার্থীদের সংখ্যা ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

নিরাপত্তা মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি নিরাপত্তা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভাবাদর্শ তৈরী হয়, অন্য অনেক কিছু ছাপিয়ে ধর্মই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর নীতি নির্ধারকরা পূর্ব বাংলার প্রতি স্বাভাবিক আচরণ না করে সর্বক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করে। রাষ্ট্র গঠনের একেবারে শুরুতে সে আচরণ বাঙালি জাতির মাতৃভাষা অবমাননার মাধ্যমে সামনে আসে। ভাষা অবমাননার পরে বাঙালি সংস্কৃতির অন্য অংশ বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিষয়ের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের তীব্র বিরোধিতা কাজ করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি তাদের একধরনের ঘৃণা ও অবজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র টিকে থাকে মূলত তার নিরাপত্তা ক্ষেত্রগুলোর শক্তিশালী ভিত্তির উপর। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সেই শক্তিশালী ভিত্তিগুলো কার্যত অনুপস্থিত ছিল। নিরাপত্তার মৌল অবকাঠামো বিনির্মাণে পাকিস্তান সরকার যেন পূর্ব বাংলাকে বিবেচনায় আনেনি। এজন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন সদর দফতর, এমনকি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোও পূর্ব বাংলায় স্থাপন করেনি। বাঙালির বীরত্বকে অস্বীকারের পাশাপাশি তাকে সবসময় ঘৃণা ও ছোট করে দেখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের একেবারে শুরুর দিকে (১৯৫১ সালে) পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে মানুষ ব্যাপক খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়। এসময় লবণের মূল্য এতই বেড়ে যায় যে, লবণে হাড় ও চিনি মেশানোর ফলে নারায়নগঞ্জে ২ জন মারা যায় এবং চট্টগ্রামে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের বন্যা থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকাবস্থায় বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা, পর্যাপ্ত হাসপাতাল ও চিকিৎসকের অভাব, নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে পূর্ব বাংলার মানুষের জনজীবন বিঘ্নিত হয়। ১৯৬৫ সালের ১৭ দিন ব্যাপী চলা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান সরকার তাঁর পূর্বাংশের নিরাপত্তার জন্য কার্যত কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনা । অথচ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী , শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ সবাই যুদ্ধে পাকিস্তানকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে। যুদ্ধ চলাকালে ও সমাপ্তিতে পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ নিরাপত্তা সংকটের তীব্রতা অনুধাবণ করতে পারে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা যে নিরাপদ না- সেটি প্রমাণিত হয়ে যায়। নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

সহ দীর্ঘদিনের বঞ্চিত প্রসঙ্গ গুলো একত্রিত করে রচিত হয় ৬ দফা। বাঙালির মুক্তি সনদ ১৯৬৬ সালের ৬ দফার শেষ দফাতে প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি সেই উদ্বিগ্নতার প্রমাণ। ৬ দফাকে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাই নিজেদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে হুমকি মনে করে। এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও নেতৃবৃন্দের ফাঁকা বুলির অসারতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। নিরাপত্তার প্রচলিত কাঠামোর সকল স্তরে পূর্ব বাংলাকে নায্য অধিকার না দিয়ে বরং বঞ্চিত করা হয়।

পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সত্তরের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। যদিও এর আগে এমন দুর্যোগ পূর্ব বাংলায় আঘাত করেছে, কিন্ত এই সময়ের দুর্যোগ যেমন ভয়াবহ ছিল, তেমনি ছিল হৃদয় বিদারক। দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙালি যে কত অসহায়- এবারের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সারা বিশ্বের কাছে সেই সত্যই তুলে ধরেছে। এই দুর্যোগে পাকিস্তান সরকারের বিমাতাসুলভ কর্মকান্ড আরেকবার প্রমাণ করে দেয় যে, অরক্ষিত পূর্ব বাংলাকে নিজের অধিকার, নিজের বঞ্চনার মোচন দূর করতে আর হাজার মাইল দূরের শাসকের উপর নির্ভর করলে চলবেনা। আসন্ন নির্বাচনে তাই তারা ব্যালটের মাধ্যমে শাসনের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার ব্যবস্থা করে। নির্বাচনের ফলাফলে যার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার চরম অধঃপতন লক্ষ্য করা যায় একাত্তরের যুদ্ধকালীন ৯ মাসে। জীবনের নিরাপত্তা, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার নিরাপত্তা, শরনার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়ে গমনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্থবিরতার পাশাপাশি চরম মাত্রায় অত্যাচার-নিপীড়নের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতার এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হয়। ইয়াহিয়া খানের অবিবেচক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হওয়া এই গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তি সংগ্রামে। সরাসরি যারা যুদ্ধে যেতে পারেননি, বা যাবার সুযোগও ছিলনা, সেই শ্রেণির মানুষও মুক্তি সংগ্রামে অবিস্মরনীয় ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিয়মিত- অনিয়মিত বাহিনী ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলস্বরূপ হানাদার বাহিনী ন্যাক্কারজনক এই গণহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ পেয়ে পূর্ব বাংলা নিজেই নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে থাকলেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিদ্যমান বৈষম্যকে ছাড়িয়ে যায় নিরাপত্তা বৈষম্য। নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে পূর্ব বাংলা বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। অপ্রথাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্র যেমন, খাদ্য, জ্বালানী, জলবায়ু ও মানবিক বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ব বাংলা ভয়াবহ ধরনের অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ১৯৬৫ সালের পাক-

Dhaka University Institutional Repository

ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলায় কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রাখা, ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে সৃষ্ট মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা-বাঙালিকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত করে। নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দাবি আদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্তেহার ও স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে নিরাপত্তা বৈষম্যের বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়। পাকিস্তান শাসনাধীন ২৪ বছরে পূর্ব বাংলাকে নিরাপত্তায় আত্মনির্ভর করার দাবীতে কর্ণপাত না করে পাকিস্তান সরকার কার্যত পরনির্ভর করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

(১৯৪৭-১৯৭১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভূমিকা

ক) আলোচনার উত্থাপন

অভিসন্দর্ভটিতে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা বঞ্চনার স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রথম আগ্রাসন শুরু হয় ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। হাজার মাইল দূরে ভিন্ন ভৌগোলিক আবহে অবস্থানরত বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান তাদের নিজেদের সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভাষা কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে না উঠতে শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনা সামনে চলে আসে। বাঙালি তার বৈষম্য ও বঞ্চনার জায়গা গুলো ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকে। এসব বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈষম্যের দিকটি অন্যতম।

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর আয়ত্ত্বাধীন পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কয়েকভাবে দেখা যায়। প্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামো তথা জন নিরাপত্তা ও অপ্রচলিত নিরাপত্তা তথা সামাজিক নিরাপত্তা। নিরাপত্তার এই দুই ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা বঞ্চিত হয়েছে তার নিজস্ব অধিকার থেকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে নিজস্ব নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে না রেখে বরং পশ্চিম পাকিস্তান ও কাশ্মীর কেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হয়। পূর্ব বাংলা নদীবহুল ও সমুদ্রের সাথে উপযুক্ত সংযোগ ব্যবস্থা থাকলেও এখানে নৌবাহিনীর সদর দফতর করতে পাকিস্তান সরকার আগ্রহ দেখায়না। নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার নির্মিত হয় করাচীতে। অর্ডন্যান্স কারখানা ও বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল যথাক্রমে রাওয়ালপিন্ডি ও করাচীতে। সুপারসনিক জেট বিমান পশ্চিম পাকিস্তানে শত শত থাকলেও পূর্ব বাংলায় সেগুলো নামার জন্য এয়ারপোর্টও ছিল না। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভৌত অবকাঠামোগত ভিত্তি যেমন পূর্ব বাংলায় ছিলনা; তেমনি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তিতেও বৈষম্য বিরাজমান ছিল। যদিও পূর্ব বাংলার জনমানুষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান বারবার এসব বিষয় নিয়ে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলায় কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের আস্থা উঠে যায়। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে আলাদা চিন্তা- ভাবনা শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা খ্যাত ৬ দফা এবং যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবী জানানো হয়।

খাদ্য, পানি, জ্বালানি, এবং বন্যা-জলোচ্ছ্বাসেও মানুষের নিরাপত্তা তথা জনজীবন বিঘ্নিত হয়। যে নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তান শাসনামলের শুরুর দিকেই খাদ্য সঙ্কটের কারণে পূর্ব বাংলার অনেক জায়গাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লবণের মত নিত্য ব্যবহার্য সস্তা খাদ্য পন্যও ১৬ টাকা পর্যন্ত কেজিতে বিক্রি হয়। উচ্চ মূল্যের লবণের অভাবে বিকল্প দূষিত লবণ খেয়ে অনেকে সে সময় মারাও যায়। তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, আনবিক শক্তির মত জ্বালানী সুবিধার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষের পরিধেয় পোশাক, খাদ্য, চিকিৎসা সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের অবস্থা বিরাজমান ছিল। ডায়রিয়া, কলেরা ও যক্ষ্মার মত রোগের প্রকোপ ছিল খুব বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবনের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। পাকিস্তান শাসনামলের ২৪ বছরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। তবে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ভয়াবহতার দিক থেকে পূর্বের সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। পূর্ব বাংলার উপকূলীয় এলাকায় বিশেষকরে চট্রগ্রামের সন্দীপ, ভোলা, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল এলাকায় এই প্রলয়ংকারী ঝড় তীব্র মাত্রায় আঘাত হানে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার দুর্গত এলাকায় ত্রান ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য পাঠালেও পাকিস্তান সরকার এ সময় আন্তরিকতা দেখায় না। এমন কি এমন দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পূনর্বাসনে ও মৃত দেহ সৎকারেও বিদেশী হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে হয়। দুর্যোগ সংগঠিত হবার পূর্বে চিরাচরিত নিয়মে যে সতর্ক সংকেত প্রদানের রেওয়াজ ছিল সেটি পর্যন্ত অবমাননা করা হয়। নিজ দেশের সরকারের এমন আচরণ বাঙালি জাতি মেনে নিতে পারেনা। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তারা এর সঠিক জবাব দেয়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। প্রচলিত নিরাপত্তা তথা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রগুলো যুদ্ধকালে ভয়াবহ রকমের পরিবর্তন হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠী, দেশের বাইরে ও ভিতরে অবস্থিত শরনার্থীরা অবর্ণনীয় কষ্ট ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সময় কাটায়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর যোগসাজশে অবিবেচক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গণহত্যার প্রতবাদে বাঙালি জাতি প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। নিয়মিত অনিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, মুটে-মজুর, নারী, শিশু-সবাই যুদ্ধে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে স্বাধীন হয় পূর্ব বাংলা। স্বাধীনতা অর্জনের পরে অন্যান্য বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেনা পূর্ব বাংলা। নিজেদের প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে যুদ্ধ চলমান থাকাবস্থায় গঠিত হয় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী।

খ) প্রকাশনা পর্যালোচনা

পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা থাকলেও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো পূর্নাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কোনো কোনো লেখক তাদের গ্রন্থের কোনো একটা অধ্যায়ে নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করলেও সেখান থেকে পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার পূর্নাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়না।

মোঃ হাবিবউল্লাহ বাহার রচিত *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য* গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি ঢাকা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ৫৪৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে ৬ টি অধ্যায় ও ১৮টি পরিশিষ্ঠ অনর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটির ২৪৯ পৃষ্টায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে দুই অঞ্চলের বৈষম্য উঠে এসেছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার পাশাপাশি পার্লামেন্টের ধরণ ও কার্যাবলীর বর্ণনা এসেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরণের ধারণা ও পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলায় এর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করে আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদ কায়েম করে। পাকিস্তানের দু অঞ্চলের বৈষম্য বিষয়ক এই গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈষম্য সংক্রান্ত বিতর্কে পূর্ব বাংলার অপ্রথাগত নিরাপত্তা বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা ও সেচ ব্যবস্থা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার চিকিৎসা ব্যবস্থার আলোচনা এসেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এসব বৈষম্য সংক্রান্ত বিতর্ক কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা এসেছে।

সত্য মামলা আগরতলা শিরোনামে ২০১১ সালে প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা থেকে কর্নেল শওকত আলীর সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মকালীন অভিজ্ঞতালব্ধ বয়ান প্রকাশিত হয়। ২০৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ ১০ টি চ্যাপ্টারে ভাগ করা হয়েছে।গ্রন্থটিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সংশ্লিষ্ঠতা নিয়ে প্রথম চ্যাপ্টারে আলোচনা এসেছে। এর পর লেখকের সেনাবাহিনীতে যোগদান ও তদসংশ্লিষ্ট ঘটনা এসেছে। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের যে হীন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভিতরে থেকে লেখক তা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং এই গ্রন্থে তুলে ধরেন। এর পরে আইয়ুব খানের আমলের বিভিন ঘটনা, ৬ দফা কর্মসূচি, আগরতলা মামলায় গ্রেফতার ও বিচার এবং শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক তার বক্তব্য শেষ করেন। বইটির ৫১ থেকে ৬৯ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীতে বাঙালিদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, 'পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বেসামরিক ক্ষেত্রের চাকরির মত সশস্ত্রবাহিনীতেও পাঞ্জাবীদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য ও বিপুল সংখ্যাধিক্য। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে কিন্তু খুবই গর্বের সঙ্গে তারা মএ করত এটা তাদের অধিকার এবং এরকম হওয়া উচিৎ।

সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত *মওলনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি* গ্রন্থটি আগামী প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট ১৩ টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভাসানীর বেড়ে ওঠা, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সিলেটে গণভোট, চতুর্থ অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার সংশ্লিষ্ট আলোচনা, কাগমারী সম্মেলন ও আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কারাবরণ, আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ, চীন সফর , টোকিও ধর্ম সম্মেলন, পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫, ন্যাপে ভাঙ্গন ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গ এসেছে। অষ্টম অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। অষ্টম অধ্যায়ে 'একি মন্ত্র জপলেন মওলানা ভাসানী: স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'- শিরোনামে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ঘটে যাওয়া শতাব্দীর সব থেকে প্রলয়ংকারী ঘূর্নিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। এই জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব বাংলার নানা অনিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাসানী ে পশ্চিম পাকিস্তানকে পূনর্বার 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলেন। উক্ত গ্রন্থের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় ভাসানীর জবানীতে লেখক আবুল মকসুদ উদ্ধৃত করেন- 'আজ হইতে ১৩ বছর পূর্বে ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাস ঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আচ্ছালামু আলাইকুম বলিয়াছিলাম, হয়ত বঙ্গবাসী নাটকের সব কয়টি অঙ্ক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো বাঙালিকে বুঝাইতে হবেনা যে, মানবতা বর্জিত সম্পর্কের মহড়া চুড়ান্ত পর্যায় উঠিয়েছে। এই বার নেমেসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায় আমরা আছি। যা হইবার তাহাই হইবে।' ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সরকারের উদাসীনতা ও অনীহার তীব্র কাটাক্ষ করে ভাসানী বলেন, "আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোনদের মৃত্যু সংবাদ রেডিও পাকিস্তান ও সরকার আমাদের জানায়নি। আট হাজার মাইল দূর থেকে বিবিসি মারফত আমরা এই দুঃসহ সংবাদ জানতে পেরেছি। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী শিল্পীরা এগিয়ে আসলেও আমাদের ইসলামাবাদের সরকার দুর্গত বাঙালির সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। সরকারের সমালচনা করে তিনি বলেন, 'বাঙালির দুঃখের দিনে সরকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। অথচ কথায় কথায় জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। এই সব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোগাস।'

মওদুদ আহমদ রচিত *বাংলাদেশঃ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা* ইউ পি এল, ঢাকা থেকে গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। ১২ টি অধ্যায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আলোচনায় এসেছে। ৭১ থেকে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঞ্চম অধ্যায় বিস্তৃত। এখানে ৬ দফা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৬ দফা সম্পর্কে লেখক বলেন, এটা ছিল প্রাথমিকভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত, উদীয়মান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের আশা-আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিকভাবে জনপ্রিয় একটি আন্দোলন হিসেবে অচিরেই ৬ দফা নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থন অর্জন করে। অত্র গ্রন্থে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় Rounaq Zahan এর গ্রন্থ *Pakistan: Failure in National Integration* গ্রন্থটিতে একটি উপসংহার, ৮ টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। এটি মূলত একটি পিএইচডি থিসিস যা হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা থেকে ১৯৬৯ সালে প্রফেসর মার্লে ফেইনসড এর তত্ত্বাবধান সম্পন্ন হয়। গ্রন্থাকার বইটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য সারণির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মূলত লেখক ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্যের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে রাষ্ট্র ও জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় পরপর দুটি সংবিধান রচনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইয়ুব আমলের একটি বিশ্লেষণ, জাতিগঠন ও আমলাতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন, ইয়াহিয়া খানের আমলে পাকিস্তানের জাতিগত অসঙ্গতি, পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিকাশ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি দুই অঞ্চলের বৈষম্যের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ করে অপ্রচলিত নিরাপত্তা ভাবনা সেখানে স্থান পায়নি।

আকবর আলি খান রচিত *পুরানো সেই দিনের কথা* গ্রন্থটি ২০২২ সালে প্রথমা প্রকাশনী ঢাকা থেকে বের হয়। এটি মূলত আকবর আলি খানের আত্মজীবনী । এই গ্রন্থে ১৫ টি অধ্যায় রয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখকের বেড়ে ওঠা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানাবিধ ঘটনা আলোচনার পাশাপাশি সিভিল সার্ভিসে যোগদানকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা এসেছে। সিভিল সার্ভিসে যোগদানের শুরুতে শিক্ষানবিশ ট্রেনিংয়ে পাকিস্তানের লাহোরে থেকেছেন। পূর্ব বাংলা সম্পর্কে সেখানকার কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। এছাড়া ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ও তার পূর্বে হবিগঞ্জের এসডিও হিসেবে মাঠ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছেন লেখক। যুদ্ধকালে কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের

সহযোগিতা ও সংগঠিত করেছেন তার বর্ণনা এসেছে গ্রন্থটিতে সবিস্তারে। *পুরানো সেই দিনের কথা* গ্রন্থে লেখক পাকিস্তান বিমান বাহিনী কেন্দ্রের একজন পরিচালকের মন্তব্য তুলে ধরেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী কেন্দ্রের সেই পরিচালক বলেন, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘঠিত হলে পাকিস্তানি বিমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উড়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে বোমা নিক্ষেপ করতে করতে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছাবে। জ্বালানি ও বোমা নিয়ে সেই বিমান ঢাকা থেকে পূণরায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করতে করতে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবে। অতএব ভারত কোন মতেই পূর্ব পাকিস্তনের বিমান বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না। পাকিস্তানের এই কর্মকর্তার এমন মন্তব্যে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত রচিত *বাংলাদেশঃ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব গ্রন্থটি* ২০০০ সালে সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মূলত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। ১৬ টি অধ্যায় ও ১৪ টি পরিশিষ্ট সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে পৃষ্ঠার সংখ্যা ৩৮৩। এই গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ' শীর্ষক শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে পাকিস্তানের শোষণকে লেখক লিখেছেন -'পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে পেল একটি দুগ্ধবতী গাভী হিসেবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া চলল আরও জোরেশোরে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য তাকে দেশের সম্পদ বিভাজনের সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের সম্পদের বিভাজন পূর্ব বাংলাকে একটি শোষিত উপনিবেশে পরিণত করে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশ থেকে এই সময়ে প্রচুর সম্পদ পশ্চিমে পাচার হয়।'

তারেক শামসুর রহমান রচিত *বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনাঃ অপ্রচলিত ধারণাসমূহ*-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ১৭৩ পৃষ্ঠার এই বইটি শোভা প্রকাশ, ঢাকা থেকে ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নিরাপত্তার অপ্রচলিত ধারণা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে রচিত বইটিতে জ্বালানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি নিরাপত্তা, মানবিক নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তা বিভ্রাট সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে বইটিতে প্রথাগত নিরাপত্তা প্রসঙ্গ একেবারেই আলোচনা করা হয়নি।

গ) গবেষণার যৌক্তিকতা

গবেষণার যৌক্তিকতা হল- পূর্ব বাংলা নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করা। পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের উপেক্ষা ও অনীহার কারণে যে নিরাপত্তা সংকট তৈরী হয়- সেটা তুলে ধরা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময় বলে আসত যে, পূর্ব পাকিস্তান নিরাপদ। ভারতের সেনাবাহিনী ঢাকা আক্রমণের পূর্বে তাদের সৈন্যরা দিল্লী আক্রমন করবে। ১৯৬৫ সালের পাক

ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব বাংলায় শুরু হওয়া নিরাপত্তা সংকট থেকে বাঙালির সচেতন অংশ বুঝতে পারে যে, পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বাগাড়ম্বরতা ও বাকচাতুর্য ভিত্তিহীন।

নিরাপত্তা সংকট সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যাবার পরে সেটা সহ অন্যান্য সংকট মিলে বাঙালি জনগোষ্ঠির মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে সেটা কিভাবে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে রূপ নেয় সেটা জানা যাবে এই গবেষণায়। পাশাপাশি অপ্রথাগত নিরাপত্তা ইস্যুতে পূর্ব বাংলা কতটা পিছিয়ে ছিল সেটা জানতে সহায়ক হবে। এছাড়া এই গবেষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অনালোচিত গণ মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়ে জানা যাবে। এসবের পাশাপাশি গবেষণাটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে সৃষ্ট হওয়া ভয়াবহ শরনার্থী সংকটের মানবিক দিক সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে।

ঘ) গবেষণার পরিধি:

এই গবেষণার পরিধি হচ্ছে- ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত পূর্ববাংলায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত যে নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে ওঠে তা যথাযথভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সময়কালে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করা।

ঙ) গবেষণার পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুটোই স্থান পেয়েছে। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈত্বয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস:

প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, (১৬ খণ্ড), মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য, আতাউর রহমান খানের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তব্য, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, সম-সাময়িক পত্রিকা, এসেম্বলি ডিবেটস, East Bengal Legislative Assembly proceedings এবং আরকাইভসে সংরক্ষিত দলিলপত্র। সম্প্রতি হাক্কানি পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ-২০১৮ সাল) *Secret Document of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman* (দশ খণ্ড) থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য। এছাড়া বাংলাদেশ, ভারত,

পাকিস্তান ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ডকুমেন্টস ও দলিলপত্র প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎস

দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বইপত্র, আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় গ্রন্থগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থগার, গণ গ্রন্থগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ ও জার্নাল।

চ) অধ্যায় বিভাজন

এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে রূপ দেওয়ার জন্য ভূমিকা এবং উপসংহার সহ মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা পর্বে গবেষণার সার-সংক্ষেপ, প্রকাশনা পর্যালোচনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায় বিভাজন ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নিরাপত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পূর্বক পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার ধরণ-কাঠামো, নিরাপত্তা কাঠামোয় বাঙালিদের বৈষম্যের জায়গা, সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতি, অপ্রচলিত নিরাপত্তার ধারণায় নিরাপত্তাকে বিশ্লেষন পূর্বক খাদ্য, জ্বালানী, জলবায়ু ও মানবিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংকট তৈরি হলে সেটা পূর্ব বাংলাকে কিভাবে প্রভাবিত করে-তা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অপ্রথাগত নিরাপত্তা সংকটে বিশেষ করে খাদ্য ও লবণ সংকট তৈরী হলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীন অবস্থা দেখানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সৈনিকদের কৃতিত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে ও সমাপ্তিতে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের ও বাইরের দেশের প্রতিক্রিয়ার উঠে এসেছে। এই যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতার পরবর্তীতে কিভাবে ৬ দফাকে প্রভাবিত করছিল সেটা দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা ও ১১ দফা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এই দফাগুলোতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকায় তা নিবন্ধে স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে সত্তরের ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় ও

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা, দুর্যোগ কবলিত এলাকায় প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পূনর্বাসনে পাকিস্তান সরকার যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় সেটার আলোচনা এসেছে। পাশাপাশি ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কিভাবে সাধারণ মানুষের ও এতদ অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের চেতনায় প্রভাব ফেলে সেটার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে যুদ্ধকালে অপ্রচলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রসঙ্গ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। যুদ্ধকালে সকল স্তরের মানুষ কেমন নিরাপত্তা সংকটে ছিল, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর-পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামসের কাছে জিম্মি পূর্ব বাংলার মানুষের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শরনার্থীদের দুঃসহ অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি দেশের মধ্যে ও বাইরে তারা কেমন অনিরাপদ জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল তা এই অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের সরকার থেকে শুরু করে কবি, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মহানুভবতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি 'জয়বাংলা রোগ' কিভাবে শরনার্থী শিবির ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জনজীবন বিপর্যস্থ করেছিল সে বিষয়টি উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত-অনিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গ এসেছে বিশদভাবে।

উপসংহার হিসেবে সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর সারনির্যাস উপসংহারে তুলে ধরে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের ফল যে সুখকর ছিলনা সেটি দেখানো হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের মূলবক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপসংহারে স্থান পেয়েছে।

ছ) গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। বর্তমান গবেষনাকর্মটিও তার ব্যতিক্রম নয়। নিরাপত্তা একটি জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়। পাকিস্তান শাসনাধীনে থাকাবস্থায় পূর্ব বাংলার সামগ্রিক নিরাপত্তা অন্বেষণ একটু দুরূহ। নিরাপত্তা নিয়ে পাকিস্তানের শাসকরা নিজেদের মনগড়া একধরনের বক্তব্য দিয়েছেন, আবার সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে নিজেরা বইও রচনা করেছেন। সেসব বক্তব্য ও রচিত বইয়ের বিরুদ্ধাচারণ করে লিখিত বইয়ের সংখ্যাও কম। আবার নিরাপত্তা নিয়ে রচিত বইগুলোতে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও ১৯৬৬ সালের ৬ দফা নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। অথবা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত বইগুলোতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আংশিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকে মারা গিয়েছেন, আবার যারা জীবিত আছেন তারা স্মৃতিভ্রষ্ট বা নানাকারণে অনেক কথা গোপন করেছেন বা অস্পষ্ঠভাবে বলেছেন যা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার অন্তরায়। যার ফলে গবেষণাকর্মটিকে অনেকাংশেই দ্বৈতয়িক উৎসের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। তবে লিখিত উৎস ও মৌখিক বক্তব্য এই দুটোর মধ্যে সত্যাসত্য যাচাই করে অভিসন্দর্ভটিকে বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্বক্তিক করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পরিসর বিস্তৃত। বিস্তৃত পরিসরের কারণে এখানে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই, গুরুত্বপূর্ন ঘটনাসমূহের বাইরে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আরও যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো নিয়ে গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিরাপত্তা মানব জীবনের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। জীবনে অথবা রাষ্ট্রে কোথায়ও নিরাপত্তাহীনতা কাম্য নয়। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলা ছিল বরাবরই উপেক্ষিত। যেসব ব্যাপারে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার ও নীতি নির্ধারকদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর মধ্যে নিরাপত্তা অন্যতম। পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিষয়ক চিন্তা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ন্যস্ত বলে পাকিস্তানের শাসকবর্গ বারবার যে যুক্তি দিত, তা ছিল কার্যত অসাড়। এই অযৌক্তিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকাঠামো তথা সামরিক ঘাটি নির্মাণ, মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা, সামরিক বাহিনীতে সদস্য নিয়োগ, ঊর্ধ্বতন পদে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তি এমনকি সামরিক বিভিন্ন অফিসে সামরিক বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগেও বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙালি জনগোষ্ঠি, তার স্বাধীকার আদায়ে সচেতন শ্রেণি ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক উপেক্ষিত অন্যান্য বিষয়ের মত নিরাপত্তার বিষয়টা বোধগম্য হয়। আর নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরাকারের উদাসীনতা বা একেবারেই গুরুত্ব না দেবার মত ঘটনা ঘটে ১৯৬৫ সালে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান তার পূর্ব অংশের নিরাপত্তা জোরদার করার পরিবর্তে এক প্রকার যোগাযোগই বিছিন্ন রাখে। অথচ সমগ্র পাকিস্তানকে একই আত্মার অংশ মনে করে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থনের পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ সমাপ্তির পর পূর্ব বাংলার সাথে যুদ্ধকালীন আচরণের জন্য অনুশোচনার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম বাংলার সাথে পূর্ব বাংলার ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়ে দেয়। নিরাপত্তা ও স্বাধিকার নিয়ে যখনই এ অঞ্চলের মানুষ সচেতন হয়েছিল, তখনই তাদেরকে বিভিন্ন মামলা, জেল ও হয়রানির মাধ্যমে থামিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। যার প্রমাণ মেলে বঙ্গবন্ধুসহ সামরিক -বেসামরিক ৩৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের ঘটনার মধ্য দিয়ে। এছাড়া ১৯৭০ সালে নভেম্বরে সংঘটিত স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়েও পাকিস্তান সরকার সেভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। সরকারি সংস্থার আগেই বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণ সহ উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান

পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে সেখানেও যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে। যাতে সর্বস্তরের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটে।

২.১ নিরাপত্তা কী

নিরাপত্তা একটি ব্যাপক ধারণাগত প্রত্যয়। এটি অস্পষ্ট ও একটি বহুমাত্রিক ধারণা। সাধারণত নিরাপত্তা বলতে কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, সর্বোপরি নিজের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে অন্য রাষ্ট্র কর্তক লঙ্ঘনের হাত থেকে রক্ষা করার সামর্থকেই বোঝায়। নিরাপত্তার ধারণাটি মানব ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। কারণ এর সাথে অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত।

নিরাপত্তাকে বিভিন্ন বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো বিশ্লেষক সামরিক দিক থেকে নিরাপত্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ কেউ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্টের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ নিরাপত্তা বলতে হুমকির বিপরীতে টিকে থাকার সক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন।[১] কারও কারও মতে, কোনো জাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় তার জাতীয় স্বার্থের সাথে জড়িত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নিশ্চিত করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[২]

কেউ কেউ আবার নিরাপত্তা বলতে সমন্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে বুঝিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে দুই শক্তিধর পরাশক্তির মধ্যে বিবদমান স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা পারমানবিক যুদ্ধের আশংকা থেকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অনেকেই প্রচলিত ধ্যান ধারনার আলোকে নিরাপত্তাকে দেখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নিরাপত্তার অপ্রচলিত ধারণা সে সময় সামনে আসেনি।[৩]

উন্নয়নশীল বিশ্বে দারিদ্রের বিষয়টি নিরাপত্তার ধারণায় যুক্ত হয় আশির দশকে এসে। এ সময়ে এসে নিরাপত্তার ধারণায় যুক্ত হয় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ। উন্নত ও উন্নয়নশীল, ধনী ও গরীব দেশ সমূহের মধ্যে যে বৈষম্য সেটা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে দেখা যায় জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডকে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিনি গঠন করেন নর্থ-সাউথ কমিশন। এই কমিশনের প্রতিবেদনে নিরাপত্তার ব্যাপারে যুদ্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আর যেসব প্রসঙ্গের কথা বলা হয়

---

১ Talukder Muniruzzaman, *The security of Small States in the Third World,* Canberra, 1982.

২ তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনা অপ্রচলিত ধারণাসমূহ,* শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১৪।

৩ ঐ, পৃ. ১৪ ।

সেগুলো ছিল-ক্ষুধা ুর করা, মানুষের কষ্ট কমিয়ে আনার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোতে অবস্থানরত মানুষের জীবন যাত্রার মানের তফাৎ দুর করা। নর্থ-সাউথ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নিরাপত্তার জন্য দরিদ্রতা হুমকির ন্যায়।[৪]

পরবর্তী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় সুইডেনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন Independent Commission on Disarmament and Security তে। এই কমিশন শান্তি ও নিরাপত্তার বিকল্প প্রস্তাব উথাপন করেন Common Security নামক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে। যেখানে বলা হয় যে, মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় যদি তারা অনাহারী না থাকে। তাদের জন্য তখনই সাধারণ নিরাপত্তা Common Security বাস্তবায়িত হবে যখন তারা দারিদ্র ও অভাবগ্রস্থ না থাকে।[৫]

এই ধারণার সাথে মিলে যায় স্টকহোম ইনিশিয়েটিভ অন গ্লোবাল সিকিউরিটি এন্ড গভর্নেন্স নামক একটি আহবানে। যেখানে বলা হয়েছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ, ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরীতে ব্যর্থতার কারনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্ট হয়। ১৯৯৫ সালের দিকে এসে Commission On Global Governance, our Global Neighborhood শিরোনামে তাদের এক প্রতিবেদনে বলেন যে, The concept of global security must be broadened from the traditional focus on the security of states to include the security of people and the security on the planet.[৬]

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগ, গঠিত কমিশন, তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় যে, স্নায়ুযুদ্ধের পরে নিরাপত্তা আর তার সনাতন কাঠামোর মধ্যে বন্দী থকেনি। আশির দশকের শেষ ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে এসে নিরাপত্তার ধারণায় মানব নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়। যেখানে ৭ টি

৪ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

৫ Jyoti M. Pathria, Bangladesh: Non Traditional Security, South Asia Analysis Group, www.southasiaanalysis.org.Visited on 29.03.2022.

৬ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এগুলো হচ্ছে, পরিবেশগত নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা, ব্যক্তি নিরাপত্তা, গোষ্ঠী নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা।[৭]

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষে নিরাপত্তায় পরিবেশের প্রসঙ্গটি আরও স্পর্শকাতর হিসেবে দেখা দেয়। ২১ শতকে এসে পরিবেশগত নিরাপত্তার ধারণা প্রাধান্যের শীর্ষে অবস্থান করে। উন্নয়নশীল বিশ্বে দারিদ্রতা ও পরিবেশ বিপর্যয় দুটো সমস্যাই প্রকট হয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য ৪ ধরনের নিরাপত্তা হুমকীর কথা বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ বিজ্ঞানী গ্রেগ মলিস। যেগুলো হল, অর্থনৈতিক হুমকি, পরিবেশগত হুমকি, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক হুমকি।[৮]

২.২ নিরাপত্তার প্রচলিত ধারণা ও প্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামোয় পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য

সরাসরি সামরিক আগ্রাসন বা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দেশের নিরাপত্তার যে সংকট তৈরী হয় তাকে মূলত ট্র্যাডিশনাল অর্থাৎ সনাতন বা প্রচলিত নিরাপত্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৯] সাধারণত প্রচলিত নিরাপত্তা বলতে একটি দেশের সামরিক সক্ষমতাকে বোঝায়। প্রচলিত নিরাপত্তা একটি ভূরাজনৈতিক ধারণা-যা জাতি রাষ্টের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবন্ধ এবং সামরিক কৌশল শক্তিসাম্যের সাথে সম্পর্কিত। একটি জাতিকে হুমকি প্রদানকারী প্রথাগত ইস্যু- ধ্বংস, সহিংসতা, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমন বা যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় থেকে নিরাপদ থাকাকে প্রচলিত নিরাপত্তা বলে।

নিরাপত্তা একটি রাষ্টের সার্বভৌমত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। বহিঃ শত্রুর হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রত্যেক রাষ্টের কর্তব্য। স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বরাবরই বৈষম্যমূলক মনোভাব পোষণ করে আসছে। বেসামরিক চাকরিতে যেমন পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য ছিল, তেমনি সশস্ত্র বাহিনীতেও ছিল পাঞ্জাবীদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙ্গালিদের যে দুটি ব্যাটালিয়ন ছিল সেখানেও

৭ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

৮ ঐ, পৃ. ১৬।

৯ ঐ, পৃ. ১৩।

পাঞ্জাবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োজিত মোট সংখ্যার ৮০ ভাগেরও বেশি পাঞ্জাবী। অন্যদিকে সে তুলনায় বাঙালি ছিল মাত্র ২ শতাংশ।[১০]

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে নিয়োগ ও ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ৬ অক্টোবর, ১৯৫৩ তারিখে পাকিস্তানের গণ ও জাতীয় পরিষদ বিতর্কে জানা যায় যে, এই সময়ে পাকিস্তান আর্মিতে নিয়োগকৃত ১৩ জনের মাত্র ৩ জন পূর্ব বাংলার। ৩ জুলাই, ১৯৬২ পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীর ট্রেনিংয়ের জন্য পাকিস্তানে অবস্থিত মোট ৪ টা ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে একটির অবস্থান ছিল পূর্ব বাংলায়। নৌ বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ৪ টা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪ টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। বিমান বাহিনীর জন্য ৫ টা ট্রেনিং সেন্টারের ৫ টিই পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল । কমিশনড অফিসার পদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পদাতিক বাহিনীতে ৭%, নৌ বাহিনী ৯% এবং বিমান বাহিনীতে ১৬% নিয়োগ দেওয়া হয়।[১১]

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ২৭ টি ক্যান্টনমেন্ট ছিল যা ১৫৯৫২১.৯৯ একর জমিতে বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তনে মাত্র ৪ টি ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম) ছিল, যা ৯৮৮৭ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ১৯৬৬ সালের ২১ মার্চ সংসদীয় সচিবের দেওয়া তথ্য মতে, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত রিক্রুটমেন্ট পাবলিসিটি বাবদ পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৫০৩৬৮.৩২ রূপি ও পূর্ব পাকিস্তানে ৫৪১৭৫৯.৭৪ রূপি খরচ করা হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটক্যিাল অফিস এর বরাত দিয়ে মোখলেছুজ্জামান বলেন যে, প্রতিরক্ষা খাতের ৫% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়।[১২]

প্রতিরক্ষা খাতে লোকবলের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ১৩% ও কম। বাকী সব পশ্চিম পাকিস্তানের। মিলিটারি স্কুল, এয়ারফোর্স, এয়ার ড্রাম সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৭ এ দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে যত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি হয়েছে তাঁর সব করা

---

১০ কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫২।

১১ হাবিবউল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ৭৪।

১২ ঐ, পৃ. ৭৪।

হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশরক্ষা বিভাগের এস্টাবলিশমেন্টের জন্য যে ব্যয় হয় তাঁর সবকিছুই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। [১৩]

২.৩। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতি

বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে সুদীর্ঘকালের ব্রিটিশ নীতির কারণে বাইরে রাখায় প্রবণতা ছিল। কিন্তু, যুদ্ধকালে স্বল্প সময়ের জন্য সীমিত সংখ্যক বাঙালির উপস্থিতি দেখা যেত। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলমান তখন ৭, ১১৭ জন বাঙালিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আবার যুদ্ধ সমাপ্তিতে তাদের নিয়োগ কোনো কোনো সময় কমে একেবারে শূণ্যের কাছাকাছি পৌছায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিয়োগ বিধির উপর কড়াকড়ি আরোপ শিথিল করা হলে বাঙালিদের সংখ্যা তুলনামূলক বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত মোট ২০,৪৭,৮০৩ জনের মধ্যে বাংলা থেকে যাওয়া সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,৭১,২৫২ জন।[১৪]

পাকিস্তান স্বাধীন হবার পরে ব্রিটিশদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান যে সেনাবাহিনী পায় তাতে বাঙালি সৈন্য সংখ্যা ছিল সীমিত। এ সময় সেনাবাহিনীতে যে ইউনিট গুলো ছিল তার মধ্যে কোনো বাঙালি মুসলিম ইউনিট ছিলনা। অল্প পরিমানে যে বাঙালি ছিল তাঁর মধ্যে আর্টিলারি ও সিগনালেও তাদের উপস্থিতি ছিল শূন্য। পূর্ববঙ্গে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী নিযুক্ত না থাকায় এখানে কোনো ক্যান্টনমেন্ট, রিক্রুটমেন্ট সেন্টার, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বা সামরিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল একেবারে নগণ্য। ঔপনিবেশিক আমলে সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের প্রবেশ নিয়ে ব্রিটিশ যে নীতি ছিল পাকিস্তান আমলেও সেই নীতি বহাল থাকার কারণে সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালি উপস্থিতি ছিল অনেক কম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার প্রাক্কালে পূর্ববাংলা সামরিক বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার ১ শতাংশ পরিমাণ সরবরাহ করত।[১৫]

---

১৩ ঐ, পৃ. ৭৪

১৪ এনায়েতুর রহিম, 'পাকিস্তানঃ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী (১৯৪৭-৭১)', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৪০৬।

১৫ Dawn, June 25, 1967.

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ৮৯৪ জন সেনা- অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। বিমান বাহিনীতে মোট ৬৪০ জন অফিসারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল ৮০ জন। এছাড়া নৌবাহিনীতে ৫৯৩ জন অফিসারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল মাত্র ৭ জন। ১৯৬৫ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১৩,০০০ জন ছিল বাঙালি।[১৬]

সারণি- ১

সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

সার্ভিস	অনুমোদিত শতাংশ	প্রকৃত শতাংশ
সোবাহিনী		
অফিসার	৭.৮১	৫
জুনিয়র কমিশনড অফিসার	৭.৮	৭.৪
অন্যান্য পদবি	৭.৮	৭.৪
বিমান বাহিনী		
অফিসার		১৬
ওয়ারেন্ট অফিসার		১৭
অন্যান্য পদবি		৩০
নৌবাহিনী		
অফিসার		১০
ব্যাঞ্চ অফিসার		৫
চিফ অফিসার		১০.৪
পেটি অফিসার		১৭.৩
লিডিং সিমেন ও তাঁর নীচে		২৮.৮

সূত্রঃ Rizvi, Military and Politics, pp. 38-39; Pakistan Asembly, Debates, vol.1.March 8, 1963, pp. 29-31

১৬ Dawn, July 20, 1965.

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বেশি পরিমাণে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তকরনের ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কিছু ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করত। যেমন, কখনও কখনও তারা বলত, বাঙালিরা শারীরিকভাবে সক্ষম না। কখনও বা বাঙালিরা ভীতু, কাপুরুষ এমন অপব্যাখ্যা দাঁড় করাত।[১৭] বাঙালি সৈনিকদের সাথে পাকিস্তান সৈনিকরা অন্যায় আচরণ করত। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের বলত-'বাঙালিরা মার্শাল রেস না'।[১৮]

বাঙালিদেরকে পাকিস্তানী শাসকরা নিম্ন শ্রেনির মনে করত। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের ভাষায়- Bengalees have all the inhabitants of a down trodden nation. [১৯]

সারণি- ২

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার অবস্থান

আর্মি

অফিসার	৫%
জেসিও	৭.৮%
মেডকেল অফিসার	২৩%
ওয়ারেন্ট অফিসার	০%
অন্যান্য র‍্যাংকস	৭.৪%

নেভি

পদ	টেকনিক্যাল	নন-টেকনিক্যাল
অফিসার	১০%	৯%
ব্রাঞ্চ অফিসার	৫%	৬%
চিফ পোর্ট অফিসার	১০.৪%	১৩.৪%
পোর্ট অফিসার	১৭.৩%	১৪.৭%
সী-ম্যান ও নিম্নপদস্থ	২৮.৪%	২৮.৫%

১৭ এনায়েতুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৭।

১৮ কর্নেল শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১৯ Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, A Political Autobiography, (New York, Oxford University Press, 1967

এয়ার ফোর্স

পদ	জি ডি পাইলট	নেভিগেটর	টেকনিক্যাল	প্রশাসন	শিক্ষা
অফিসার	১১%	২৭%	১৭%	৩১%	১৩%
ওয়ারেন্ট অফিসার	০%	০%	১৩.২%	৪৫%	১১.৩৭%
অন্যান্য র‍্যাংক	০%	০%	২৮%	৩৬%	৩৭.৮%

উৎসঃ National Assembly of Pakistan Debates, 8 march, 1963, vol-01, p:30-31

সারণি- ৩

১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দুই অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনীর আর্মি ও নেভিতে নিয়োগ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের বৈষম্যঃ

(রূপিতে)

পদ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
আর্মি	১২৩১৪০৪	৩২৮৩৫৩
নেভি	৮৯৮৫৮	৭৫১০৩

উৎসঃ National Assembly of Pakistan Debates, 3 April, 1963, vol-01, pt-2, p-1208

মিলিটারি একাউন্টস অফিস ছিল মোট ৯ টা। যার মধ্যে ১ টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আর ৮ টির অবস্থান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এসব অফিসে কর্মরত স্টাফদের সংখ্যা থেকেও অনুমান করা যায় যে, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ বেসমারিক পদ থেকেও বাঙালিদের কত বৈষম্য আরোপ করা হত। পূর্ব পাকিস্তানের যে অফিস ছিল সেখানে মোট কর্মরত কর্মকর্তা ও স্টাফ ছিল ২৯৬ জন। যার মধ্যে ২৭৮ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পাকিস্তান মিলিটারি একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে কর্মরতদের মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীর মধ্যে একজন মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের। ২য় শ্রেণীর যে ৮ জন ছিল তাদের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। ৩য় শ্রেণীর যে ১৯১ জন ছিল তাঁর মধ্যে ৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। শতকরা

হিসেবে দেখা যায় যে, ২.৫% পূর্ব পাকিস্তানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ৯৭.৫%। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ শোয়েব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাকে যদিও অবমূল্যায়ণ করা হচ্ছে তবুও প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রে সমতার দরকার নেই।[২০]

সারণি- ৪

১৯৪৭-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডিফেন্স সার্ভিসে দুই প্রদেশে বেসামরিক চাকরিজীবীর আনুপাতিক হার

১। পাকিস্তান আর্মি			শতকরার হার	
বছর	মোট সিভিলিয়ান এমপ্লয়ি	মোট	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭	তথ্য পর্যাপ্ত নয়		-	-
১৯৬৫	প্রথম শ্রেণি	১৪২	৫%	৯৫%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	১৯০	২.৬%	৯৭.৪%
	দ্বিতীয় শ্রেণির নন গেজেটেড	৩০১	৩.৩%	৯৬.৭%
	তৃতীয় শ্রেণি অস্থায়ীসহ	১৪৩৩৬	৪.৯%	৯৫.১%
	৪র্থ শেণি অস্থায়ীসহ	২৯১৬৭	৭.৬%	৯২.৪%

২। পাকিস্তান নেভি			শতকরার হার	
বছর	শ্রেণি			
১৯৪৭	প্রথম শ্রেণি	০	০০%	০০%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	১	০০%	১০০%
	দ্বিতীয় শ্রেণির নন গেজেটেড	৯	০০%	১০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	২৬০	৩%	৯৭%
	৪র্থ শেণি	১৯৫	২%	৯৮%
১৯৬৫	দ্বিতীয় শ্রেণি	১৬	৬%	৯৪%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	৪০	১৫%	৮৫%

২০ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

	দ্বিতীয় শ্রেণির নন গেজেটেড	৫৬	০০%	১০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	২৭৬৮	৯.৫%	৯০.৫%
	৪র্থ শেণি	১৬৩৮	৭%	৯৩%

পাকিস্তান এয়ারফোর্স

২। পাকিস্তান নেভি			শতকরার হার	
বছর	শ্রেণি			
১৯৪৭	তৃতীয় শ্রেণি	১৪৮	০.৬%	৯৯.৪৫%
১৯৬৫	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	১৪	১৪.৩%	৮৫.৭%
	দ্বিতীয় শ্রেণি নন গেজেটেড	২০	০০%	১০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	২৪৫২	৬.১%	৯৩.৯%

আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারস

১৯৪৭	প্রথম শ্রেণি	১	০০%	১০০%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	১৮	০০%	১০০%
	দ্বিতীয় শ্রেণি নন গেজেটেড	৪৫	০০%	১০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	৮০২	১.৭%	৯৮.৩%
	৪র্থ শেণি	৩২৩	০.৬%	৯৯.৪%
১৯৬৫	প্রথম শ্রেণি	৬৫	৩.৭%	৯৬.৩%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	১২৬	২.৩%	৯৭.৭%
	দ্বিতীয় শ্রেণি নন গেজেটেড	১৫৪	১.২%	৯৮.৮%
	তৃতীয় শ্রেণি	২৯৩৫	৪.৮%	৯৫.২%
	৪র্থ শেণি	১৩৯৮	১.৪%	৯৮.৬%

১৯৪৭	প্রথম শ্রেণি	৩০	০০%	১০০%
	দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	০০	০০%	০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	১১৩	১৮%	৮২%
	৪র্থ শেণি	১৭৯	৯%	৯১%
১৯৬৫	প্রথম শ্রেণি	৪৫	২৫%	৭৫%
	দ্বিতীয় শ্রেণি	০০	০০%	০০%
	তৃতীয় শ্রেণি	১৬৭	১৬%	৮৪%
	৪র্থ শেণি	১৭৯	১৫%	৮৫%

উৎস: National Assembly of Pakistan Debates, 15 Nov 1965

সামরিক বাহিনীর ঘাটি তথা ক্যান্টনমেন্ট নির্মানের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মিত ক্যান্টনমেন্ট গুলোর দিকে নজর দিলে বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এ সময়কালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলে ১৩টি, লাহোর অঞ্চলে ৯টি, করাচিতে ৫টি সহ সর্বমোট ক্যান্টনমেন্ট ছিল ২৭ টি। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোরে এ সময় মাত্র ৪ টি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। আর্মি ও নেভি রিক্রুটিং অফিস পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছিল মাত্র ৩ টি সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ১৫ টি। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ২ টি এবং পশ্চিম পাস্তিানের ৫ টি অফিস। মিলিটারি একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের নিয়োগকৃত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী, কর্মকর্তা নিয়োগেও ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

এ অফিসে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এই তিন শ্রেনিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১১৫৪ জন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ৫৪ জন।[২১]

সারণি- ৫

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত Naval Dockyard এ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত স্টফদের সংখ্যা

পদ	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তানি
কারিগরী পরিদর্শক স্টাফ	৩	৮১
দোকানদার	১০৫	১০০২
শ্রমিক	৫৫	৪৬৬
শিক্ষানবিস	১২ (Indenture) ১ (Non- Indenture)	৯৪ (Indenture) ১৪ (Non- Indenture)
সাচিবিক স্টাফ	১৫	১০১
চতুর্থ শ্রেণি	৩	৩২
ভান্ডার রক্ষক স্টাফ	২	৪৫
পুলিশ স্টাফ	০০	২০৫
অগ্নিনির্বাপক স্টাফ	০০	৮৩

উৎস: National Assembly of Pakistan Debates, 1958, 4 march, 1958

সামরিক- আধা সামরিক যেসব ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশি ছিল তার মধ্যে অন্যতম ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। এখানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল অফিসার ৯২%, জেসিও ৪৮%, এনসিও ৪১%, অন্যান্য র‍্যাংকে ১৮%। পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্চারে পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার ছিল ০০%, জেসিও ৩%, এনসিও ০%, অন্যান্য ব্র্যাঙ্গকে .০১%। Frontier Constabulary তে পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার অফিসার ছিল ৬.৬৬%, জেসিও ০%, এনসিও ও অন্যান্য র‍্যাঙ্কে ০%।[২২]

[২১] ঐ, পৃ. ২৫৩।

[২২] ঐ, পৃ. ২৫৬।

২.৪। নিরাপত্তার অপ্রচলিত ধারণা

ক) খাদ্য নিরাপত্তা

খ) জ্বালানী নিরাপত্তা

গ) জলবায়ু পরিবর্তন

ঘ) মানবিক নিরাপত্তা

ক) খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য সংকট পৃথিবীর যেকোনো দেশের নিরাপত্তাকে একটি বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। খাদ্য সংকটকে জাতিসংঘ নীরব সুনামি হিসেবে সনাক্ত করেছে।[২৩] খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টির সাথে অনেক কিছুই জড়িত। ১৯৮৭ সালে World Commission on Environment and Development (যা কিনা Brundtland Commission নামে পরিচিত) তাদের একটি রিপোর্ট "Food security: Sustaining the Potential" এ উল্লেখ করেছিল, "More than 730 million people did not eat enough to lead fully productive working lives." [২৪] অর্থ্যাৎ মানুষ পরিমাণ মত খেতে পারেনা, যার মাধ্যমে সে নিজেকে কর্মক্ষম করতে পারে। এটাই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। পূর্ব বাংলা ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে স্বাধীন হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় খাদ্য সংকটে জর্জরিত ছিল।

১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ছিল কার্যত দুর্ভিক্ষ কবলিত। এসময়কালে চাষীদের কষ্টের সীমা ছিলনা। তাদের প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হত। অপুষ্টি ও ক্ষুধা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। খাদ্য ঘাটতি পূরণে সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কৃষকরা তাদের জমাজমি বন্ধক রেখে অথবা বিক্রি করে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে যাচ্ছিল। পূর্ব বাংলার যখন দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছিল তখন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে অধিবাসীরা আরাম আর বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছিল। এ অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে একটি স্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ' ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়-লাখো

---

[২৩] তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

[২৪] ঐ, পৃ. ১০০।

ইনসান ভুখা হায়'।[২৫] ১৯৫০ সালের ২৪ ডিসেম্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় তার ভাষণে বলেন, 'যে দেশের মানুষ ট্রেনে রুটি পড়ে থাকলে তুলে খায়, কুকুরের মুখের গ্রাস তুলে খেতেও যাদের বাধে না, সে দেশের মন্ত্রীরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ ভ্রমণ করেন।'[২৬]

১৯৪৭ সালের শুরুর দিকে পূর্ব বাংলায় খাদ্য পরিস্থিতি অবনতি হতে শুরু করে। আগষ্ট মাসে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পরিস্থিতিতে রীতিমত খাদ্য সংকট ভয়াবহ অবস্থায় পরিণত হয়।[২৭] পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার খোলা চিঠিতে খাদ্য পরিস্থিতি র সামগ্রিক একটা চিত্র পাওয়া যায়। চিঠিতে তারা বলেন,

> "ঠিক এই মুহূর্তে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে তখন এক ভয়াবহ খাদ্য সংকট সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্তিতি খুবই খারাপ। চালের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠে গেছে।.... এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সকলকে আজ পাইকারি হারে উপবাস থাকতে হচ্ছে। আমাদেরকে ১৯৪৩ সালের ভয়ানক দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।"[২৮]

তবে ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় যে ব্যাপক খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা তৈরি হয় সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার তেমন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়না। এই সময়ের খাদ্য সংকট ১৯৪৩ সালের খাদ্য সংকটের মত এত বিস্তৃত পরিসরে ও ভয়াবহ ছিলনা । কিন্তু এই সংকট জনমনে যে প্রভাব ফেলেছিল তাঁকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। [২৯]

খাদ্য সংকটের পাশাপাশি ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলার বস্ত্র সংকটের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। এই সংকট সমাধানের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে মনোরঞ্জন ধর চরখা প্রবর্তন ও প্রচলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে তিনি বলেন, "এদিক বস্ত্র সংকট যে কি নিদারুণ আকার ধার করেছে তার প্রমাণ আমরা নিত্য নিয়ত পাই। আজ আমাদের মা বোনদের লজ্জা নিবারণের কোনো

---

[২৫] আবুল কাশেম ফজলুল হক, *ভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল*, পৃ. ৬৩-৬৫।

[২৬] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮।

[২৭] Peoples Age, 15-8-1947. Vol. vi. No. 5.

[২৮] Ibid.

[২৯] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৬৯ পৃ. ৬২।

সংস্থান নাই, আমি জানি অনেক মেয়ে ঘরের বাইরে আসতে পারেনা কাপড়ের অভাবে। অনেক মা, বোন আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখের অবসান ঘটিয়েছে লজ্জা নিবারষ করতে না পেরে।" [৩০]

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের হিসাব বিবরণী তৈরিতে পূর্ব বাংলার টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে কম করে করে দেখানো হতো। পূর্ব বাংলার ক্যালোরিযুক্ত চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পড়ত। দেশ ভাগের পর থেকে শুরু হওয়া খাদ্য সংকট ১৯৪৮-৪৯ সালে এসে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে ও ১৯৫০ সালে এই অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হয়ে স্বাভাবিক আকার ধারন করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে খাদ্য পরিস্থিতি আবার অবনতি ঘটতে থাকে। যে সমস্ত এলাকার অবস্থা এসময় জটিল আকার ধারণ করে তার মধ্যে খুলনা অন্যতম। বন্যার ফলে এসময় খুলনাতে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের দিকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল- শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি, পাইকগাছা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য এলাকার খাদ্যদ্রব্যের অভাব ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। ভাত না পেয়ে অত্র অঞ্চলের মানুষ চালকুমড়া ও সজনের ডাঁটা খাওয়াতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের পেটের অসুখ দেখা দেয়; এমনকি অনেকে মৃত্যু বরণ করে। .... কয়েকমাস পূর্বে যে জমি ৪০০ টাকা বিক্রি হতো তার দাম এ সময় কমে এসে ৪০ টাকা দাঁড়ায়। আবার এই সমস্ত অঞ্চলে ধান ও চাল সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। [৩১]

১০ মে ১৯৫১ সালে সাপ্তাহিক সৈনিক খুলনার খাদ্য সংকট নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। "খুলনায় দুর্ভিক্ষ" নামে সম্পাদকীয়তে তারা বলেন যে, খুলনায় একটি বড় অংশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। সংকটাপন্ন অঞ্চলকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষের অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার আবেদন করে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।এই রিপোর্টে আরও বলা হয়, পাঞ্জাবের বন্যার সময় সরকার যেভাবে বিপুল সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল পূর্ব বাংলার এই বিপদের দিনেও সরকারকে সেভাবে এগিয়ে আসা উচিত। বাগেরহাট তমুদ্দন মজলিশের পক্ষ হতে মহম্মদ আশরফ কতৃক প্রেরিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালের জুন মাসে খুলনা জেলার শুধু সাতক্ষীরা ও সদর মহকুমাই নয়, বাগেরহাট মহকুমার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলেও প্রায় দু'মাস থেকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষাবস্থা শুরু হয়েছে।[৩২] চৈত্র মাস থেকে এসব অঞ্চলের

---

[৩০] East Bengal Legislative Assembly proceedings, vol. ii. P 28.

৩১ সাপ্তাহিক নওবেলাল, ১২-০৪-১৯৫১।

৩২ সৈনিক (পত্রিকা), ২৪-০৬-১৯৫১।

মানুষ ভাত না পেয়ে খাদ্যাভাবে আলু, কচু পোড়া ইত্যাদি খেয়ে কোনোরকম জীবন কাটাচ্ছে। খাদ্য সংকটের সাথে কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব তাদের জীবনকে আরও অসহনীয় করে তুলছে।[৩৩]

খুলনা, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে সাহায্যের জন্য ২৯ মে তমুদ্দন মজলিশ 'দুর্গত এলাকা ' ঘোষণা করে। এদিন মজলিশের কর্মীরা ঢাকার রাস্তায় গান গেয়ে দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করছিল। সংগৃহীত অর্থ নিয়ে তমুদ্দন মজলিশ কর্মীরা দুর্গত অঞ্চল সমূহে যান । মজলিশ কর্মীরা খুলনাতে পরিদর্শনে গেলে সেখানকার করুণ অবস্থা তাদের রিপোর্টে সবিস্তারে ফুটে ওঠে। এ. আই .এম তোহার একটি রিপোর্ট থেকে এ সময়ের অবস্থা জানা যায়ঃ

> "দুর্ভিক্ষ পীড়িত খুলনায় মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের মিছিল। অন্ন-বস্ত্রহীন নর-নারীর মর্মান্তিক আর্তনাদ। পথে ঘাটে মানুষের মৃতদেহ । ক্ষুধার্ত জনতার করুণ আওয়াজ অন্ন চাই-বস্ত্র চাই। ক্ষুধার জ্বালায় কাদা ভক্ষণ । ঢাকা থেকে খুলনার পথে রওনা হলুম। সঙ্গে ছিল কম্বল, গরম কাপড়, ধুতি শাড়ি। খুলনা স্টেশনে এসে পৌছালে রেলের জনৈক গার্ড এসে প্রশ্ন করল-'' আপনাদের সাথে কি আছে?" উত্তর দিলাম- "খুলনার দুর্গত এলাকার অধিবাসিদের জন্য কাপড় নিয়ে যাচ্ছি"। দীর্ঘ নিশ্বাসের সাথে গার্ড বললেন, "বাঁচাবার জন্য কাপড়, বলুন তাদেরকে কাফন দেবার জন্য এই কাপড় নিয়ে এসেছেন"। তিনি দূরে একটা লঙ্গরখানার দিকে হাত তুলে দেখালেন, 'ঐ দেখুন চেয়ে আজ খুলনার পরিস্থিতি কত বয়াবহ রূপ ধারণ করেছে'।
>
> চেয়ে দেখলুম এক মুঠো অন্নের আশায় শত শত নর-নারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে- কখন এক মুঠো ভাত পাবে। খুলনা থেকে বড়দল এসে পৌছালাম। দুর্ভিক্ষের নগ্ন দৃশ্য রুপে দেখা দিয়েছে। নদী পার হয়ে আমরা চান্দখালীতে গেলাম। দেখলাম গ্রামের বাইরে মানিক গাজীর পাঁচ বছরের মেয়ে অনাহারে মারা গেছে। অনাহারে মৃত্যু এত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কে কোথায় মরছে তার খবর রাখা অসম্ভর। 'কপোতাক্ষী' নদীর পাশে দেখলাম সদ্য দেওয়া কয়েকটি কবর। কাতুলিয়া গ্রামের মাদার, গজালিয়া গ্রামের 'গওর' আজ দুনিয়ার সমস্ত অন্নাভাবের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নদীর ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে। এগিয়ে চললাম, চারিদিকে হাহাকার আর আর্তনাদ। যখন গ্রামের পর গ্রামে এরুপ বীভৎস দৃশ্য অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি তখন দেখলাম আশাশুনি সদরে ফুলের গেট তৈরী করা হচ্ছে....খবর নিয়ে জানতে পারলাম প্রধানমন্ত্রী আসছে তাই এই আয়োজন। বকচর গ্রামের শরত মন্ডলের স্ত্রী শীতলা ও কেশব আত্নহত্যা করেছে। স্থানীয় সাহায্য বিতরণ কেন্দ্রের সামনে চাউল না পাওয়াতে

৩৩ বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৩ ।

> কয়েকদিনের উপবাসী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফেলে চলে গেছে। পরবর্তী গন্তব্যস্থল নওবেকীর দিকে রওনা হলাম। বাতনী ও তার তিন ছেলে-মেয়েকে দেখলাম বাঁধেল উপর বসে ক্ষুধার তাড়নায় কাদা খাচ্ছে। আজ এখানে প্রধানমন্ত্রীর আসার কথা। চারিদিকে কয়েক হাজার নিরন্ন, বিবস্ত্র, বুভুক্ষু খোদার বান্দারা দাঁড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী যে সভাতে বক্তৃতা দেবেন সে সভাতেই কয়েকদিন ধরে উপবসী আসগর আলী ও দলিল উদ্দীনের স্ত্রী মারা গেলেন।" [৩৪]

রিপোর্টের শেষে আরও বলা হয়েছে, খুলনার দুর্গত এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি স্থানের অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, নদীতে লাশের পর লাশ। মফিজুদ্দিন সাহেব, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী করাচীতে বলেছেন, 'পুষ্টির অভাবে কয়েকজন মারা গেছে'। নিজের তথাকথিত সম্মান বাঁচানোর জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ যে চরম আত্ন-প্রবঞ্চনা করেছেন, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। সরকারের অদুরদর্শিতা আজ খুলনার পরিস্থিতিকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চাইতেও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে নিশ্চিত রূপে ঠেলে দিয়েছে''।

এই সময়কার দুর্ভিক্ষাবস্থা শুধু একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ফরিদপুর, খুলনা, যশোর,ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। আবার ১৯৫১-৫২ সালের দিকে দুর্ভিক্ষ বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লাতে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক অবস্থা শেরে বাংলা এ কে ফজুলুল হকের বর্ণনায় ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, 'মানুষে ও কুকুরে খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি। কোনো অমানুষ না হইলে এই দৃশ্য দেখিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারেনা।' [৩৫]

১৯৪৭ সালে ফরিদপুরের ৪ টি মহকুমার জনগণের মধ্যে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। অন্য জেলা থেকে উপার্জিত ধান ফরিদপুরে নিতে না দেওয়ায় সৃষ্ট খাদ্য সংকট পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষে রুপ নেয়। শেখ মুজিবুর রহমান এসময়কার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অসমাপ্ত আত্নজীবনী গ্রন্থে বলেন,

> "এই সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল কয়েকটা জেলায়। বিশেষ করে ফরিদপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার জনসাধারণ এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করেছিল। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কোনো খাদ্য যেতে দেওয়া হতনা। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক খুলনা ও বরিশালে ধান কাটার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসেবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত।

---

৩৪ সৈনিক , ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫১।

৩৫ ঐ, ১৪ নভেম্বর, ১৯৫২ ।

এদেরকে 'দাওয়াল বলা হত। এরা প্রায় সকলেই গরীব ও দিনমজুর।..... বহু বছর যাবত এই পদ্ধতি চলে আসছিল। ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার লোক এই ধানের উপর নির্ভর করত। দাওয়ালরা যখন ধান কাটতে যায় তখন সরকার বাঁধা দিলনা। যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষু মা-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য যারা পথ চেয়ে আছে, আর কোনো মতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে- কখন তাদের স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে পেট ভরে কিছু দিন ভাত খাবে এই আশায়। তখন নৌকায় রওনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পথ রোধ করা হয়। 'ধান দিতে পারবেনা, সরকারের হুকুম, ধান জমা দিয়ে যেতে হবে নতুবা নৌকা সমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। সহজে কি ধান দিতে চায়? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধান নামিয়ে রেখে লোকগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হল।"[৩৬]

সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। কর্ডন প্রথা যদিও সিলেটে তুলে নেওয়া হয়েছিল তবুও কৃষকদের স্বল্পমূল্যে ধান বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ক্রয়ক্রীত ধান সরকার আবার জেলার বাইরে নিয়ে যায়। খাদ্য সংকট যখন দেখা দেয় তখন সরকার কম মূল্যে চাল সরবরাহ করেনি। চালের দাম ৫০ টাকা মন উঠে যায়। বিপরীতে পানির দামে পাট বিক্রি হয়।[৩৭] শুরু হয় ভয়ংকর খাদ্য সংকট। 'সৈনিক' এর এক রিপোর্টে পরিস্থিতির করুণ চিত্র ফুটে ওঠে।

''প্রত্যেক গ্রামে দুই-এক ঘর ছাড়া সকলেই উপবাস করিতেছে। মা-বাপের সামনে পাঁচ-ছয় দিনের উপবাসী সন্তানরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে। কিন্তু অসহায় মা-বাপ এক মুঠো ভাতও তাহাদিগকে দিতে পারিতেছেনা। ধর্মপাশা থানার চাপাইতি গ্রামের ওলুর মা উপবাস করিয়া মরিয়াছে ২৬ শে অগ্রহায়ণ। ঐ গ্রামের হাফিজ উদ্দীন ওরফে পানিয়ার বাপের পারিবারের পাঁচজন লোক আজ মরনের মুখে। .....চাপাইতি আলী হোসেন ওরফে আলুফার পরিবাররের পাঁচজন লোক আজ মরণের মুখে। ....চাপাইতি আলী হোসেন ওরফে আলুফার পরিবারের অবস্থা এমন শোচনীয় - ৬ জন লোক উপবাস করিয়া মরিতে বসেছে। চাপাইতি গ্রামে ৫০/৬০ টি পরিবার বাস করে। এখন পর্যন্ত মাত্র ২/৩ টি পরিবারের খোরাকী আছে। আর সকলেই অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামেই আজরাইল হানা দিতেছে।'' [৩৮]

---

৩৬ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১০৩-১০৪।

৩৭ সৈনিক, ৩ মাঘ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

৩৮ ঐ।

অন্য বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার প্রায় প্রত্যেকটি এলাকায় এই সময়ে মর্মান্তিক অবস্থা দৃশ্যমান হয়। তৎকালীন পত্রিকা 'সৈনিক' এর প্রতিনিধি এ সময় ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ঘুরে এসে যে প্রতিবেদন দেন তা হলঃ

> ''....শতকরা ৭৫ জন লোকেই এ অঞ্চলে অনাহারে অর্ধাহারে অখাদ্য খাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। অনেকে কচু পাতা খাইয়া কোনোমতে এতদিন টিকিয়া ছিল, এখন তাহাও আর পাওয়া যাইতেছেনা। কিছুদিন ধরিয়া গভর্নমেন্ট কন্টোলে আটা সরবরাহ করিতেছে। তাহা প্রায় অবিক্রিত রহিয়া যাইতেছে কারণ সস্তায়ও ক্রয় করার টাকা এদের কারও হাতে নেই। পূর্বে দৈনিক দুই-আড়াই টাকায় লোকে দিন মজুরী করিত, এখন এরা বিনা পয়সায় শুধু একমুঠো ভাতের বদলে কাজ চাহিয়াও কোথায়ও স্ত্রী-পুত্রের এক বেলারও অন্ন জোগাইতে পারিতেছেনা।" [৩৯]

১৯৫৯-৬০ সালে এক টন চালের দাম যখন পূর্ব বাংলায় ছিল ৫১৮ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তখন ঐ একই জিনিসের দাম ছিল ৩৩৪ টাকা। সে সময় এক টন গমের দাম ছিল পূর্ব বাংলায় ৫১৭ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ২৬৭ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব বাংলায় এম মন চালের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩৭ পয়সা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ২২ টাকা। [৪০] আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পূর্ব বাংলায় প্রচন্ড খাদ্য অভাব দেখা দেয়। খাদ্যের দাবীতে মানুষের ভুখানাঙ্গা মিছিল পর্যন্ত বের করে। [৪১]

১. খাদ্য সংকট নিয়ে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর উদ্বেগঃ

১৯৫১ সালের খাদ্য সংকটের পরে নতুন করে খাদ্য সংকট দেখা দেয় ১৯৫৬ সালে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রিপাবলিকান পার্টির সাথে কোয়ালিশন করে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে ক্ষমতায় আসেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই পর দিন সোহরাওয়ার্দী ঢাকা আসেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে এ দিন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। জনসভায় বক্তারা যখন সোহরাওয়ার্দীর গুণকীর্তনে ব্যস্ত তখন সভাপতির ভাষণ দানকালে মওলানা ভাসানী নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে এমন মন্তব্যও করেন যে, প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে না পারলে জনতার সামনেই বেত্রাঘাত

---

৩৯ ঐ, ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৪৯।

৪০ রেহমান সোবহান, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৫৮৫।

৪১ রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৪১।

করা হবে। তিনি আরও বলেন, "দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি নয়টি জেলায় নয় হাজার মন খাদ্য পাঠাতে না পারো তবে তোমার ঐ প্রধানমন্ত্রীর গদিতে আমি পদাঘাত করি"। [৪২]

১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলা ঘুরে ঢাকায় এসে দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, অতিসত্তর মফস্বলে খাদ্য সরবরাহ শুরু না করলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যাবে। সরকার তাঁর কথা তেমন আমলে না নিলে খাদ্য সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘটের ডাক দেন। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত অর্থ মঞ্জুর না করা পর্যন্ত অশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। [৪৩] মওলানা ভাসানীর এই অনশনব্রত পালনকালে কেন্দ্রীয় খাদ্রমন্ত্রী বসন্ত কুমার দাস এক চিঠিতে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। ভাসানীকে তিনি লেখেন- [৪৪]

আদাব পর নিবেদন এই,

মৌলানা সাহেব, আপনি অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি যে মহান উদ্দেশ্য নিয়া এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমার সহানুভুতি থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, জাতির এই সংকট মুহূর্তে আপনার এই মূল্যবান জীবনকে এইভাবে বিপন্ন করিয়া জাতির ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করিতেছেন। এই জন্য আমার একান্ত অনুরোধ আপনি এই অনশন হইতে বিরত হউন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমাকে আগামীকল্য সকালেই অন্যত্র যাইতে হইতেছে। নতুবা আমি আপনার নিকট উপস্থিত আপনাকে এই ঐকান্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিতাম।

ইতি নিবেদক

বসন্ত কুমার দাস

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ভাসানী স্বীয় সিদ্ধান্ত অটুট থাকেন। ভাসানীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা আবু হোসেন সরকারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন । ইস্কান্দার মির্জা আরও বলেন যে, ভাসানীর পছন্দের

৪২ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

৪৩ ঐ, পৃ. ১২১।

৪৪ ঐ, পৃ. ১৫০।

ব্যক্তিকে দিয়েই বিদেশ থেকে চাল আমদানি করা হবে। ইস্কান্দার মির্জার আশ্বাস ও দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ভাসানী ১৭ দিন পর অনশন ভঙ্গ করেন।

২. খাদ্য সংকট নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদঃ

খাদ্য ও লবন নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন, ১৯৫৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি করাচীতে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, Sir, the central government can also make treaties in respect of some subject included in the provincial list. You see, Sir, There is the subject food and the subject salt.[৪৫]

১৯৫৬ সালের ১০ অক্টোবর এসেম্বলিতে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে পূর্ব বাংলায় চরম খাদ্য সংকট চলাকালে পাকিস্তান সরকারের খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে বক্তব্যে বলেন,

> "Mr. Suhrawardy, Maolana Bhasani and hundreds of other political workers of our party shouted that the food position in East Pakistan was very very serious but unfortunately the then central Government and provincial Governement never informed the House or the country or to the people that the situation was worse. They also contradicted your statement that the people were dying of hunger and starvation in spite of the fact that there were 33 lakhs maunds of the rice in the godowns. They distributed the rice wothout any programme, without any planning as to how to sell. Who will sell, in what area they will sell. One of the ministers declared: We will give so much rice, May it will be flooded and they flooded so much that the people have died. Instead of food they received lathi charge and bullets and several persons were killed. Such a thing never took place anywhere in the world. No Governement in any country could dperpetrate such cruelties on hung people except the United Front Government here and the Government at the centre at that

৪৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

time. The hungry people who sought food wree killed mercilessly in the Dhaka areas.....as soon as we came to power we had conferences at the Government House and then we went Karachi and held cabinet meetings and arranged permits for people to bring rich from Karachi. But your permits failed to bring rice from Karachi. ....we cannot allow our people to die for food. What is the position now? Free distribution of food is going on in Dhaka and in the suburban areas. In Kamalapur and Fakirapul areas 2 maunds of rice is distributed every day, we were collecting money from the public and workers. They are cooking food and distributing food to the people. We have also started gruel kitchens. Altogether 22 gruel kitchens have been working and we have introduced rations in some areas and increased rations is being given." [৪৬]

খাদ্য সংকটের এই সময়ে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করেন। গোডাউনে লক্ষ লক্ষ টন চাউল ও গম মজুদ থাকা সত্ত্বেও তারা ভুখানাঙ্গা মানুষকে তা না দিয়ে নিজেদের দলীয় লোক ও আত্মীয়স্বজনকে দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, On the other hand what they did was that they stored lakhs of tons of rice and wheat in their godowns and they distributed this food grains to their nephews, their brothers in low and their party ML.A.s only to be soldin black market and smuggled across the border.[৪৭]

৩. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সভায় খাদ্য সংকট বিষয়ক আলোচনাঃ

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝিতে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার অবতারণা হয়। ১১ জুন, ১৯৪৮ বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নূরুল আমিন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির উপর বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, আমার মনে হয় সাধারণভাবে চালের দরবৃদ্ধির মূল কারণ হলও পাটের প্রচলিত চড়া দর; বরিশাল ময়মনসিংহ ও সিলেট এই তিনটি উদ্বৃত্ত

৪৬ Oath and signing of the roll of members and the Electorate bill, Dhaka, Wednesday, the 10th October, 1956, 9.00 P.M .

৪৭ Ibid.

জেলার কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়ার ফলে প্রদেশের বিস্তৃত এলাকায় কন্ট্রোল ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়া; মজুতদারী এবং বর্ষা ও কীট ইত্যাদি আরও কতগুলো কারণ। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে পরীক্ষামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী ঘাটতি জেলাসমূহের স্বার্থে কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়া হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, পূর্বোল্লিখিত উদ্বৃত্ত জেলা সমূহের কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার ঠিক পরপরই পার্শ্ববর্তী ঘাটতি এলাকা সমূহের দর নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু, শ্রীঘ্রই উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি উভয় এলাকাতেই দর আবার চড়তে শুরু করে। আশা করা গিয়েছিল যে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসার নিয়ম মেনে চলবে এবং যুক্তিসঙ্গত মুনাফা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত ব্যবসাকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেবার ফলে আমাদের উদ্বেগের ফলে যেকোনো লোক ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে তাকেই আমরা মুক্ত হস্তে লাইসেন্স দিয়েছি। [৪৮] খাদ্য সংকট সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৪ জুন, ১৯৪৮ একটি দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের শুরুতে মনোরঞ্জন ধর সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন, সরকারের খাদ্য নীতি যাই হোক সেটা জনপ্রিয় হতে হবে। আর এ লক্ষ্যে সরকার যদি কর্ডন প্রথা ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান তাহলে তাঁর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জনগণকে ভালভাবে অবহিত করতে হবে।[৪৯]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, দেশে দুর্ভিক্ষ এসে গেছে অথচ সরকার এই সংকটকে দুর্ভিক্ষ হিসেবে স্বীকার করতে চাননা। সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্নীতির কথা বলেন। খুলনা জেলার সংগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকিউরমেন্ট অফিসার গ্রামে গিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে উঠলে গৃহস্থ বলে তার ধান আছে ৫০ মন। কিন্তু অফিসার বলে তার ধান আছে ১০০ মন। এরপর ঘুষ না দিয়ে ওই গৃহস্থের আর উপায় থাকেনা। [৫০] ফজলুল কাদের চৌধুরী সাম্প্রতিক ঘূর্ণি বার্তার উল্লেখ করে চট্টগ্রামের পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কলকাতার ইংরেজি দৈনিক ষ্টেটসম্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, কক্সবাজার থেকে ১০ হাজার গরীব মানুষ খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আকিয়াব সীমান্ত চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ধান চাল কেনার মত সামর্থ না থাকায় বাধ্য হয়ে তাদেরকে এমনভাবে দেশত্যাগ করতে হয়েছে।[৫১] নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বছরের শুরুর দিকে সেখানে মাছ ও তরি-তরকারি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই চালের দাম আবার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তিনি আরও

৪৮ E.B. L.A Proceedings, first Session, 1948, vol.-I. No-4, p-5.

৪৯ Ibid, vol. ii. No-4, p.122.

৫০ Ibid, p.126-27.

৫১ Ibid, p.127.

উল্লেখ করেন, চিনি, আটা ও কেরোসিন তেলের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং শরষের তেলের দাম তিন টাকা পর্যন্ত ওঠে।[৫২]

বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের তরফ থেকে বিদ্যমান খাদ্য পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের "এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আসতে দেবনা" শীর্ষক আশ্বাসের জোর দিয়ে বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করি যে, গত বছর যে অবস্থায় দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা দিয়েছিল এবার কি ঠিক সেই অবস্থায় দুর্ভিক্ষের ছায়া এসেছে। না অবস্থায় কোনো বৈষম্য হয়েছে? গেল বছর যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ে তখন দেখেছিলাম পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে যে বাণিজ্য সূত্র তা ছিন্ন হয়নি। আজ এই প্রদেশে যে অর্থনৈতিক সংকট এসেছে তা তখন ছিলনা- তখন দুর্নীতি পরায়ন গভর্নমেন্ট কর্মচারী দেখিনি। তখন আমরা কালবাজারী, মুনাফাখোর পাইনি। কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা চিন্তা করে দেখুন। খাদ্য পরিস্থিতি বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটা অংশ। এই যে ধান চালের দাম বেড়েছে এটা তাঁর একটা দিক মাত্র। একটা দিক আমরা আলোচনা করছি- সমগ্র আর্থিক অবস্থা আমরা আলোচনা করছিনা। আমরা কেবল খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করছি এবং অন্যান্য যে সকল কারণে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আলোচনা করছি না।" [৫৩]

৪. লবণ সংকট

দেশ ভাগের অব্যাবহিত পরে পূর্ব বাংলা যে সমস্ত সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল খাদ্য সংকট তাঁর মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হতে না হতেই ১৯৪৮-১৯৪৯ এ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়ংকর খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। যদিও ১৯৫০ সালে এসে খাদ্য সংকট সহনীয় মাত্রায় আসলে দুর্ভিক্ষাবস্থা অনেকখানি হ্রাস পায়। [৫৪] কিন্তু ১৯৫১ সালের শুরুর দিকে পূর্ব বাংলার নতুন করে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এই খাদ্য সংকটের মধ্যে লবণের মত স্বল্প মূল্যের পণ্যদ্রব্যও ছিল। পূর্ব বাংলায় প্রথম লবণ সংকট দেখা দেয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে এই লবণ সংকট পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ রূপ নেয়।

---

৫২ Ibid, p.130.

৫৩ Ibid, p.135-36.

৫৪ বদরুদ্দিন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১।

লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সের প্রতি ২ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১৬ টাকা সেরেও মানুষ লবণ কিনতে বাধ্য হয়। [৫৫] অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিশেষ করে করাচীর অধিবাসীরা মাত্র ২ আনা সের দরে লবণ কিনতে পারত। [৫৬] লবণের মত নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ সস্তা পণ্যের এই সংকট গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অবর্ণনীয় কষ্টে ফেলে।

লবণ দুর্ভিক্ষের কারণে পূর্ব বাংলায় সর্বত্র অসন্তোষ দানা বাধে। এই লবণ দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকম বলা হয়। পূর্ব বাংলা লবণ উৎপাদনের জন্য সহায়ক ও উর্বর পরিবেশ হলেও উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। পূর্ব বাংলায় অনেক আগে থেকেই লবণ তৈরী হত। পূর্ব বাংলার যেসব জায়গায় লবণ তৈরী হত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম তাঁর মধ্যে অন্যতম। ইনকাম ট্যাক্স বসানোর ফলে এসব জায়গায় লবণ তৈরী বন্ধ হয়ে যায়। [৫৭] আবার পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ লবণ আমদানীতে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে লবণের কারখানা তৈরীতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়নি। [৫৮] এসবের পাশাপাশি করাচী হতে অপর্যাপ্ত লবণ সরবরাহ অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক লবণের উপর আবগারি করারোপ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানির লক্ষ্যে জাহাজে ভাড়ার উচ্চ হার, লবণের জন্য জাহাজে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব ও অতিরিক্ত মূল্যকেও লবণ সংকটের জন্য দায়ী করা হয়।[৫৯] সরকার নিয়োগকৃত অসাধু আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা কেন্দ্রিক মনোভাবই পরিস্থিতি জটিল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। [৬০]

আবার, মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের কেউ কেউ নিজেদের আত্মীয় পোষণের জন্য পূর্ব বাংলায় লবণ তৈরীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং আত্মীয় স্বজনকে লবণ ব্যবসাতে একচ্ছত্র সুযোগ-সুবিধা দেন। তাদের অসাধু চক্রান্তের দুই আনা মূল্যের লবণ ১৬ টাক সের দরে পূর্ব পাকিস্তানিরা কিনতে বাধ্য

---

৫৫ সাপ্তাহিক নও বেলাল, ১-১১-১৯৫১।

৫৬ দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১।

৫৭ আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত*, সৈনিকের পাতা থেকে, ভলিউম নং - ২৩ পৃ.১৮।

৫৮ ঐ, পৃ. ১৯।

৫৯ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রসিডিংস, ষষ্ঠ সেশন, ১৯৫১, ভলিউম নং-২, পৃ. ১৫৪-১৫৬।

৬০ দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১।

হচ্ছে।[৬১] চট্টগ্রাম ব্যবসায়ী সংঘের অনারারী সেক্রেটারি এম এ ইদ্রিস ১৯৫১ সালের ১৪ নভেম্বর পাকিস্তান সরকারের খাদ্য ও কৃষি সচিবের নিকট পাঠানো এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন বিদেশ থেকে লবণ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের করণেই পূর্ব পাকিস্তানে লবণের সংকট দেখা দিয়েছে।[৬২]

ঢাকা বণিক সমিতির ভাষণে সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন সংকটের কারণ নিরূপণে আরও বলেন, সরকারি হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ মন লবণের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ সাধারণতঃ সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করেনা। তথায় বৎসরে মাত্র ৬ লক্ষ মণ লবণ খরচ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি লবণের কারখানা রহিয়াছে এবং তাহাতে বৎসরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও সেরূপ নামকরা কারখানা নাই। সুতরাং দেশে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন অপেক্ষা বৎসরে ৩৯ লক্ষ মণ ঘাটতি পড়ে।" [৬৩]

লবণ সংকটের কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ নিদারুন কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকে। লবণে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। লবণের ভিতর Bone Dust মেশানোর ফলে নারায়নগঞ্জে ২ জন লোক হাসপাতালে মারা যায়। চট্টগ্রামে ভেজাল লবণ খেয়ে লোকজন পেটের নানা ধরনের অসুখে ভুগতে থাকে। বরিশালের কোথাও কোথাও ভেজাল হিসেবে লবণে চিনি মেশানোর খবর শোনা যায়। [৬৪] লবণ সংকটের এই দুঃসময়ে যাদের হাতে কিছু অর্থ ছিল তারা কালোবাজারী করে বহু অর্থ রোজগার করছিল। অনেক স্থানে মুসলিম লীগের কোন কোন সভাপতি ও সহ-সভাপতিরাও কালোবাজারীর সাথে যুক্ত ছিল বলে শোনা যায়। [৬৫] লবণের অভাবে পূর্ব বাংলার বরিশাল ও পিরোজপুর অঞ্চলের মানুষ নারিকেল ডগা নিংড়িয়ে প্রাপ্ত রস লবণ হিসেবে ব্যবহার করত। [৬৬]

১৯৫১ সালের মে মাসে মাওলানা ভাসানী আসাম সফর থেকে ফিরে পত্রিকার যে দীর্ঘ বিবৃতি দেন সেখানে তিনি লবণ সংকটের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করার দাবি জানান। বিশেষ করে খুলনা ও বরিশালের দুর্ভিক্ষের প্রতি সরকারের অবহেলা ও যথাসময়ে সাহায্য না

---

৬১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ভলিউম ১, পৃ. ৪৬৬।

৬২ দৈনিক আজাদ, ২৪-১০-১৯৫১।

৬৩ সাপ্তাহিক নও বেলাল, ১-১১-১৯৫১।

৬৪ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ভলিউম–১, পৃ. ২২১–২২৯।

৬৫ ঐ, পৃ. ২২১–২২৯।

৬৬ সাক্ষাৎকার: অনিল শিকদার (৯০), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৮-০১-২০২০, স্থান: পিরোজপুর।

দেবার জন্য ভাসানী কঠোর ভাষায় সরকারের নিন্দা জানান। [৬৭] ১৯৫১ সালের ২ রা নভেম্বর কফিলউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে একটি জনসভা আহবান করা হয়। প্রায় ১৫ হাজার লোকের উপস্থিতিতে আহুত এই সভায় আতাউর রহমান খান বলেন, গড়ে দুই টাকা করে হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর নয় কোটি টাকা লুট করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের ওপর এবং প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে উভয় সরকারই এই লবণ সমস্যার জন্য দায়ী।[৬৮]

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে লবণ সংকট নিয়ে পরিষদ সদস্যদের মধ্যে বিতর্কের সুত্রপাত হয়। লবণ সংকট নিয়ে ২রা নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে সরবরাহ মন্ত্রী আফজাল হোসেনে একটি বিবৃতি দেন। সেখানে লবণ সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "অক্টোবর থেকে তারা যে সরবরাহ পেয়েছেন তা খুব দ্রুততার সাথে প্রদেশের সবখানে প্রেরণ করে নিয়ন্ত্রিত দরে লবণ বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। শহর গুলির রেশন দোকান সমূহের মাধ্যমে ৪ থেকে ৫ আনা সের দরে লবণ প্রদান করা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে বাছাই করা খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং দর নির্ধারিত হয়েছিল ৪ থেকে ৬ আনা। তিনি তার বক্তৃতায় লবণ সংকটের জন্য কিছু কিছু দুর্নীতির কথা স্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে জন নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানান । এরপরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকার লবণের প্রচলিত দরের একটি তালিকা পাঠ করে শোনান। এ প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন যে, পরিস্থিতি প্রায় তাদের আয়ত্বে এসে গেছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার কোনো জায়গাতেই সের প্রতি লবণের মূল্য ৬ টাকার বেশি নয়।"[৬৯]

সরবরাহ মন্ত্রীর বক্তব্যের পরে মীর আহম্মদ আলী লবণ সংকট বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা সম্পর্কে বলেন,

> 'পৃথিবী সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত লবণের দাম এমন হয় নাই। গ্রামের গরীবদের দুর্দশার শেষ নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না কেউ শোনেনা সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে জ্বাল দিলে যে পরিমাণ

৬৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৬৮ বদরুদীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।

৬৯ E.B. L.A Proceedings, Sixth Session, 1951, vol.-VI. No, p.136.

না জ্বলে দুঃখীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশী জ্বলে। ১৬ টাকা সেরে লবণ বিক্রয় হল। তাতে কোটি কোটি টাকার সর্বনাশ হয়ে গেল।'[৭০]

সরবরাহ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে প্রাদেশিক সরকারকে বাঁচানোর জন্য বিবৃতিতে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার প্রতিবাদে বিনোদ চক্র চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ করে সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের। সুতরাং, প্রাদেশিক সরকারকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে। অভিযোগ করে তিনি বলেন যে, লবণ ঘাটতি সম্পর্কে সময় মত সরকারকে সতর্ক করা হলেও সরকারের সেটা আমলে নেননি। [৭১]

লবণ সংকট থেকে ঘনীভূত সমস্যা প্রসূত জনগণের দুর্দশার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> আজ মাসাধিককাল লবণ সংকট দরুণ দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদিও দেশের জনসাধরণ নিষ্ক্রিয় বসে আছে। তাহলে এমন একদিন আসবে যখন তারাও চুপ করে থাকবেনা। এখন হয়ত জনসাধরণের সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি নাই, কথা বলাবার শক্তি নাই। কিন্তু এমন দিন চিরকাল থাকবেনা। দেশের এই সংকটকালে বর্তমান সরকার কোনো কার্যকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নাই। তারা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে জনসাধারণ তুষ্ট হতে পারেন নাই। গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে এমন ভাবেই চাপে রাখতে চান যাতে কোনো প্রকার অসুবিধাতেও তারা মাথা যেন না তুলতে পারে।[৭২]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় ৩১ অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে নিম্নলিখিত খবরটি ছাপা হয়ঃ

"পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী মিস্টার ফজলুর রহমান পাকিস্তান অবজারভারকে বলেন যে, পূর্ব বংলায় লবণের অভাব এবং তার মূল্য সম্পর্কে রিপোর্ট সমূহ খুবই অতিরঞ্জিত। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ লবণ বিতরণের জন্য ন্যস্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রদেশে লবণের ন্যায়সঙ্গত এবং যথোপযুক্ত বিতরণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের।"[৭৩]

---

৭০ Ibid, p.140-141.

৭১ Ibid, p. 141-142.

৭২ Ibid, p. 142-143.

৭৩ বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, খন্ড-২, পৃ.৯৫।

'লবণের মূল্য অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে'- এই খবরের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যমন্ত্রীর বিবৃতির জবাবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য প্রভাস চন্দ্র লহিড়ী প্রাদেশিক সরবরাহ মন্ত্রীর বিবৃতি উল্লেখ করে বলেন যে, তাতেই সরকারিভাবে লবণের দাম ৬ টাকা স্বীকার করা হয়েছে।[৭৪]

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী আরও উল্লেখ করেন যে, লবণের মধ্যে হাঁড়ের গুড়া ভেজাল দেওয়া হচ্ছে যা খেয়ে নারায়নগঞ্জে একজন মৃত্যু বরণ করেছেন। চট্টগ্রামেও ভেজাল লবণ খেয়ে লোকজন পেটের অসুখে ভুগছে। ভেজালের তালিকায় শুধু হাড়ের গুড়া নয়; লবণের সাথে ভেজাল হিসেবে চিনি মেশানো হচ্ছে বলে তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।[৭৫] পরিষদ সদস্য সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তার বক্তৃতায় বরিশাল জেলার গৌরনদী থানা অঞ্চলে লবণের সাথে চিনি ভেজাল দেওয়া সম্পর্কিত সংবাদপত্রে একটি খবরের উল্লেখ করেন।[৭৬]

মনোরঞ্জন ধর তার নির্ধারিত বক্তৃতায় বলেন যে, লবণ সংকটের মূল করণ ৪টি। সেগুলো হল- জাহাজে স্থানাভাব, আবগারী কর, জাহাজের ভাড়ার উচ্চহার এবং অতিরিক্ত মূল্য। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় লবণ সরবরাহের বিষয় উত্থাপন করে তিনি বলেন, আমাদের চাহিদা আসলে আমসে ৬০ লক্ষ মন বললেও আসলে চাহিদা ৭৫ লক্ষ মণ। করাচী এই সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু তা পালন করার যোগ্যতা করাচীর নেই। করাচীর উৎপাদিত লবণের ৪০ লক্ষ মণের বেশি তারা বাংলাতে সরবরাহ করতে পারেনা। ৩০ লক্ষ মন লবণের এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ সম্ভব তিনি সে প্রশ্ন করেন।[৭৭]

২ নভেম্বর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে যেদিন বিতর্ক শুরু হয় সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অর্থ সচিব গিয়াস উদ্দিন পাঠান ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে লবণ সমস্যার উপর দেওয়া এক বক্তব্যে বলেন যে, জাহাজের অভাব এবং পাকিস্তানের দুই অংশের দূরত্বই পূর্ব বাংলায়া লবণ সরবরাহের পথে প্রধান অন্তরায়।[৭৮]

লবণ সংকট এর কারণ সম্পর্কে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য সমূহ ও পরিষদীয় বিতর্ক থেকে উঠে আসা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের মুখপাত্রদের বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ঠ হয় তা

---

৭৪ E.B. L.A Proceedings, Sixth Session, 1951, vol.-VI. No, p.143-144.

৭৫ Ibid, p.144.

৭৬ Ibid, p.151.

৭৭ Ibid, p.154-156.

৭৮ দৈনিক আজাদ, ৩ নভেম্বর, ১৯৫১।

হলঃ পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন লবণকে পূর্ব পাকিস্তানের চালান দেওয়ার প্রবণতা সংকটের প্রধান কারণ। এছাড়া লবণ ব্যবসা পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার স্বার্থেই পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় লবণ তৈরী নিষিদ্ধ করা, লবণের উপর নিপীড়নমূলক শুল্ক নির্ধারণ, বিদেশ থেকে লবণ আমদানী নিষিদ্ধকরণ এবং লবণ কারবার একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব আনা- অন্যান্য সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসুচির ৫নং দফাতে লবণ সংকট প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলা হয়: পূর্ব বাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ন করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এবং তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এছাড়া ৭ নং দফাতে বলা হয়- খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৫৩ সালের ৩-৫ জুলাই অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে পূর্ব বাংলা থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের মাধ্যমে করাচীতে রাজপ্রাসাদ গড়া, পাকিস্তান জুটবোর্ড এর মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের পাট চাষীদের নায্য মূল্যের পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, সরকারি চাকরি ও সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার নায্য দাবী অস্বীকৃতি, পূর্ব বাংলায় ৬ টাকা মূল্যের কাপড় ১৬ টাকায় এবং ১ আনা সের মূল্যের লবণ ১৬ টাকা সের মূল্যে বিক্রয় - প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লিখিত ভাষণে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, আমি এই দেশের এই গুরুতর পরিস্থিতি নিয়া বিশেষ চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখিয়াছি। ইহার পাকাপাকি সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে।[৭৯]

খ) জ্বালানী নিরাপত্তা

জ্বালানি এমন একটি বিষয় যেটি কোন দেশের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোন দেশকে টিকে থাকতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি মজুদ থাকতে হয়। কারণ, জ্বালানির উপস্থিতি ছাড়া যেমন একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি প্রতিদিনের জীবন ধারণ ও উপভোগের জন্যও জ্বালানির

৭৯ দৈনিক আজাদ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৫১।

দরকার। জ্বালানির প্রধানতম উৎস হলঃ গ্যাস, তেল ও কয়লা। এছাড়া রয়েছে পরমাণু জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি। নিরাপত্তার সনাতন ধারণা পরিবর্তনের সাথে এ বিষয়টি বোধগম্য হওয়া শুরু হয়েছে যে, জ্বালানি সংকট দেখা দিলে সাথে সাথে সে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সামনে এসে হাজির হয়।[৮০]

দেশভাগের অনেক আগ থেকেই গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান শুরু হয়। অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টাকে তিনটা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এক. ১৯১০-১৯৩৩, দুই. ১৯৫১-১৯৭১, তিন. ১৯৭২ থেকে বর্তমান। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে আইপিসি কর্তৃক প্রথম অনুসন্ধান কূপের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ে আইপিসি আরও তিনটি ও বার্মা ওয়েল তিনটা অনুসন্ধান কূপের সন্ধান পায়। অনুসন্ধানকৃত প্রথম দিকের কূপ গুলো ৭৬৩ থেকে ১০৪৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয় যাতে সামান্য গ্যাসের নমুনা মেলে। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজে (১৯৫১-১৯৭১) দেশি বিদেশী অনেক সংস্থা অংশ গ্রহণ করে যার মধ্যে অন্যতম ছিল- সেল ওয়েল, স্টানভ্যাক, পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম কোম্পানি, ন্যাশনাল ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি। দেশি-বিদেশী এসব সংস্থার অনুসন্ধানে উপকূলে একটি সহ মোট ২২টি গ্যাসক্ষেত্রে আবিষ্কার হয় যার মধ্যে ৮টিতে গ্যাসের সন্ধান মেলে।[৮১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করে এক ভাষণে বলেন, "বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হতে পারেনা। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তাবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আনবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্পের অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।"[৮২]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে বিভিন্ন উৎস থেকে সমগ্র পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল মোট ৭১,৩৫৮ কিলোওয়াট। তন্মধ্যে পূর্ব বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৭,২৮৬

৮০ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

৮১ ঐ, পৃ. ৫৭।

৮২ দৈনিক আজাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০।

কিলোওয়াট। অর্থাৎ, মোট সরবরাহের মাত্র শতকরা ১০.২১ ভাগ। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬৪,০৭২ কিলোওয়াট। অর্থাৎ মোট সরবরাহের শতকরা ৮৯.৭৯ ভাগ।[৮৩]

১৯৫০ এর দশকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। যার ফলে ১৯৫৯-৬০ সালে সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার ২৮.৮ কিলোওয়াটে গিয়ে পৌঁছায়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার তুলনা করলে দেখা যায় যে, এ সময়কালে মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ ১.৬ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়।[৮৪]

পরমাণু জ্বালানি ও আনবিক শক্তিঃ

১৯৬৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচীতে ৩৬,১৬০৯২ রুপি ব্যয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রজেক্ট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেটার নির্মান শেষ হবার মেয়াদ ধরা হয় ১৯৭০ সাল নাগাদ। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাবনার রূপপুরে ৩৬৭২০০৬.৯৭ রূপি ব্যয়ে আরেকটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রজেক্ট স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধন্ত গৃহীত হয়। [৮৫] প্রকল্প অনুমোদন, টেন্ডার গ্রহণ, জমি দখল, মাটি পরীক্ষা-সব কিছুর পরও ১৭৭০ কিলোওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হবেনা এই যুক্তিতে রূপপুরের এই প্রকল্প শুরু হয়নি।[৮৬]

এ সময় পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে ইকোনোমিক কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার সহায়তায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানে ২ লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়। যেটির নির্মাণকাজ ১৯৭০ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে ১ লক্ষ ১০ হাজার কিলো ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের করা বলা হয়। যেটির নির্মাণ ১৯৭১ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে জানানও হয়। [৮৭]

---

৮৩ F B Arnold, *Economic and Commercial Condition in Pakistan*, 1955, p.144.

৮৪ রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৩।

৮৫ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৮৬ আবুল মনসুর আহমদ, *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৬৯।

৮৭ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, ২৭৪-৭৫।

গ) জলবায়ু পরিবর্তন

সারাবিশ্ব ব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন একটি অন্যতম আলোচনার বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রভাব থেকে মানুষের নিরাপত্তাজনিত সংকট সৃষ্টি হয়। খরার কারণে খাদ্য ঘাটটি দেখা দেয়, বন্যার কারণে খাদ্য ঘাটতির পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মুখে পড়তে হয়। নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে বড় বড় শহরে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করে।[৮৮]

১৯৪৭ সালে চট্টগ্রামে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। পাকিস্তান সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। একই অবস্থা দৃশ্যমান হয় ১৯৫০ সালে খুলনার বন্যার ক্ষেত্রে। সেবারও পাকিস্তান শাসকবর্গ নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের মত পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের দাবি করে ভাসানী ১৭ মার্চ ঢাকা থেকে এক ভাষণ দেয়; যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের নির্লিপ্ত অবস্থাকে কড়া সমালোচনা করেন। (দৈনিক ইনসাফ, ১৮ মার্চ ১৯৫১) ভাষণে তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পাঞ্জাবের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ক্ষমতা অধিষ্ঠিত দলের পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থকদের উপর বর্ষিত হইয়াছে। তথায় নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব পকিস্তানের লোকদিগকে বাদ দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদিগকে সামরিক বাহিনীতে অধিকতর পরিমাণে চাকরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে। অবশ্য আমার পাঞ্জাবী ভাইদের সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করাতে আমি মোটেও ঈর্ষান্বিত নয়; কিন্তু ইহার পিছনে যে গূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে তাহাই আপত্তিজনক। কারণ, ১৯৪৭ সনের চট্টগ্রাম বন্যা ও ১৯৫০ সনের খুলনা বন্যার সময় পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সাহায্য পাঠানো হয় নাই"।[৮৯] ১৯৫১ সালের মে-জুন মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল জেলার বন্যা কবলিত অঞ্চল সফর শেষে ভাসানী ঢাকাতে ফিরে এসে পত্রিকায় যে বিবৃতি দেন সেখানে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বৃত্ত বাজেট হইতে রিলিফের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ কোটি টাকা হইতে আমরা পূর্ব বঙ্গের রিলিফের জন্য কমপক্ষে এক কোটি টাকা দাবি করিয়াছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র পঁচিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগন্য।[৯০]

---

৮৮ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৮৯ দৈনিক ইনসাফ, ১৮ মার্চ ১৯৫১।

৯০ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭৮।

১৯৫৮ সালে পূর্ব বাংলায় অনাবৃষ্টিজনিত কারণে অস্বাভাবিক আবহাওয়া বিরাজ করছিল। এতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের দারুণ ক্ষতি হচ্ছিল। এ সময় স্টকহোমে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কিত বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। [৯১] পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আমন্ত্রণ পান। ১২ জুলাই ১৯৫৮ ভাসানী স্টকহোমের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এর একদিন আগে ১১ জুলাই ঢাকা প্রেসক্লাব পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি ভাসানীকে এক সংবর্ধনা দেন। যেখানে ভাসানীর বক্তব্যে পূর্ব বাংলার তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশের একটা ধারণা পাওয়া যায়। ভাসানী বলেন,

"পাকিস্তানের জনসাধারণ একান্তভাবেই শান্তি কামনা করে। শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ আজ পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে সাধারণ কৃষকের ও মনের কথা হইয়া দাড়াইয়াছে। এই বছরকার অনাবৃষ্টি ও অস্বাভাবিক আবহাওয়ার জন্য গ্রামের জনসাধারণ আনবিক অস্ত্র পরীক্ষাকেই দায়ী করিতেছে।"[৯২]

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আক্রান্ত নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর স্থানীয় একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব অভিযোগ করেন,

"ঘুর্ণিঝড়ের আশ্রয় নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ২০ কোটি টাাকা ১০ বছরেও পাওয়া যায়নি; কিন্তু ইসলামাবাদে অপচয় ও বিলাসের সৌধ নির্মাণের জন্য ২'শ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের

পরিকল্পনা তৈরী হবার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানে মঙ্গলা ভারবেলা ড্যাম নির্মাণের জন্য এক বিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।" [৯৩] বাংলাদেশের জনগণকে প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার পন্থা হিসেবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাশনের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, "৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং কোটারীভুক্ত শাসন ক্ষমতা যেদিন আমরা ছিনিয়ে নিতে পারব, তখনই আমাদের জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানের আশা করা যায়"।[৯৪]

বন্যার সময় পশ্চিম পাকিস্তানকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে দেখা যেতনা। অথচ পূর্ব বাংলা অবর্ণনীয় কষ্টে স্থানীয় সাহায্যে তা মোকাবেলা করত।এ অবস্থা উপলব্ধি করে আওয়ামীলীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন,

---

৯১ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩০।

৯২ অর্ধ-সাপ্তাহিক ধুমকেতু, ২৮ আষাঢ়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

৯৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

৯৪ ঐ, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

"বিগত দুই বছর দেশব্যাপী সর্বগ্রাসী বন্যা জনসাধারণের শান্তির নীড়কে চুরমার করে দিয়েছে। বন্যার পরে আবার মহামারী। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুজিবার স্থান নাই। তবুও সরকার নির্বাক। এই সভ্যযুগে বন্যার হাত থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়না ইহা শিশুও বিশ্বাস করবেনা। আমরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতের সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার দ্বারা বন্যার হাত হতে দেশকে রক্ষা করা হউক। সে ব্যাপারে সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সে আপনার ভাল জানেন"।[৯৫]

৪ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিব বলেন, "ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ১০ বছরের মধ্যে ভূমিরাজস্ব বিলোপ, কাশ্মীর ও ফারাক্কা বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রচেষ্টা, বন্যা সমস্যার সমাধান ও যমুনার উপর সেতু নির্মানের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ঘোষণা করেন"।[৯৬]

১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬ পরপর এই তিন বছর পাকিস্তানে প্রলয়ংকারী বন্যা সংঘটিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার পরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবনের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের সাহায্য কামনা করেন। জাতিসংঘের কারিগরী সহায়তা মিশন জেনারেল ক্রুগের তত্বাবধানে ব্যাপক অনুসন্ধান ও জরিপের পর পূর্ব বাংলার পানি সম্পদ বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশমালাসহ ১৯৯৫ সালে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। এই প্রতিবেদনের সুপারিশক্রমেই ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি উন্নয়ন কতৃপক্ষ (EPWAPDA) গঠন করা হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের অবশিষ্ঠ সুপারিশগুলো অর্থের অজুহাত দিয়ে কখনোই আর আলোর মুখ দেখেনি।[৯৭]

অন্যদিকে পাকিস্তান ১৯৬০ সালে ভারতের সাথে সিন্ধু নদীর পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করে। উভয় দেশের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলাপ- আলোচনা ও আপোষ-নিস্পত্তির পরে ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু করাচীতে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরের ফলে সব মৌসুমে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সিন্ধু নদীর পানির অবাধ প্রবাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। কিন্তু, পদ্মা ও অন্যান্য নদীগুলোর পানিবন্টন নিয়ে পূর্ব বাংলার সাথে ভারতের বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তরফ থেকে কোনো

---

৯৫ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫-১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো- আপারেটিভ-বুক সেসাইটি লি., ঢাকা, ২০১২, পৃ.৭৯।

৯৬ দৈনিক সংবাদ, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১।

৯৭ মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভুমি ১৯৬০ দশক*, পৃ-১২৯।

ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে হাজারা বিভাগের হরিপুর জেলার সিন্ধু নদীর উপর তারবেলা বাধ নির্মাণের কাজ শুরু করে ১৯৭৪ সালে তা শেষ করে। ১৪৮ মিটার উঁচু ও ২৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বাঁধটির নির্মাণ খরচ হয়েছিল ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার। যার উদ্দেশ্য ছিল শুস্ক মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু উৎপাদন। [৯৮]

দেশভাগের পর ১৯৫৪ সালে পর থেকে পূর্বের থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু, সে অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। তবে ১৯৫৫ সালে সব থেকে বড় বন্যা দেখা দেয়। দেশভাগের পরে একবছর বা দু বছর পর পর এই বন্যা দেখা দিত। কিন্তু এই সময় এসে বছরে একাধিক বারও বন্যার প্রকোপ লক্ষ্য করা যেতে থাকে। সে সময় বন্যায় প্রতিবছর যে পরিমাণ ক্ষতি হত গবাদি পশু ও ঘরবাড়ির হিসাব বাদে তাঁর পরিমাণ দুশো কোটি টাকার কাছাকাছি।[৯৯]

যে বছরে একাধিকবার বন্যা হত, সেবার খাদ্য ঘাটতি মারাত্মক আকার ধারন করত। পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত বন্যার প্রতিকার ও খাদ্য ঘাটতি দূর করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার তেমন কিছুই করে নাই। জাতিসংঘের পিয়ারসন কমিটির রিপোর্টে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর লক্ষ্যে তড়িৎ চালিত পাম্প ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে অনেক আগেই কৃষি উন্নয়নে ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু এরকম ব্যবস্থা পাকিস্তানের মরু অঞ্চলে করা হয়েছে।

গভীর নলকুপের সহায়তায় সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সংকটপূর্ণ অঞ্চলকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চলে রূপ দেওয়া হয়েছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবও হয়নি। অন্যদিকে শিল্পে অগ্রসরও হয়নি। যা হয়েছে তা হল ভয়াবহ দারিদ্রতা, খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ। সাথে আছে প্রতিবছর নিয়মিত বিরতিতে বন্যা।[১০০]

সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল পূর্বাঞ্চলে তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা, মংলাবাঁধ পরিকল্পনা যেমন সফলভাবে কার্যকর হয়েছিল তেমনি পরিকল্পনা ছাড়াই জমির লবণাক্ততা দূরীকরণের পদক্ষেপ সফল হয়েছিল। সফল হয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে পঞ্জাবের মরুভূমিতে রাজধানী স্থাপন করে দেওয়া। তারবেলা

---

৯৮ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

৯৯ জয় বাংলা সংবাদপত্র, ২৭ আগস্ট, ১৯৭১, সংগৃহীত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ভলিউম ৬।

১০০ ঐ।

বাঁধের জন্য বিশ্বব্যাংক ১৮৯ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়। বাঁধ নির্মানে কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী ইউকে, ইউএসএ (এক্সিম ব্যাংক), বিশ্ব ব্যাংক ৫১৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করে। এর পাশাপাশি সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও সেচের জন্য মোট ৫৫৭৪২ মিলিয়ন রুপি ব্যয় করে। ১৯৬৭ সালের জুনের শেষ নাগাদ সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্প ও মঙ্গলা বাঁধ প্রকল্পে সরকার ব্যয় করে যথাক্রমে ৪৯০.৪৮ কোটি রুপি ও ২৭৪.২৪ কোটি রুপি।[১০১] পশ্চিম পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার এসব পদক্ষেপ নিলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরকার ব্যর্থ হয় ১৯৯৫৫ সালের পর থেকে শুরু হওয়া বছরে এক বা একাধিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৫০০ কোটি টাকর একটা প্রাথমিক পরিকল্পনার জন্য ফান্ড ব্যবস্থা করতে। ব্যর্থ হয় এ অঞ্চলে প্রস্তাবিত একমাত্র আনবিক চুল্লী রূপপুর কেন্দ্রের জন্য বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করতে।[১০২] পশ্চিম পাকিস্তানের জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা রোধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪২ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়। পাশপাশি ১৯৬২ সালের জুনের মধ্যে রিকনা দোয়ার চার্জ কেয়ার, গাজা খায়েরপুর এলাকার উন্নয়নে ১০ কোটি রুপি বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০৩] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যায় জলমগ্নতা নিষ্কাশনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমির লবণাক্ততা দূর করতে ১৬১.৭৭ কোটি নির্দিষ্ট করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এতোদুদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩০০ কোটি রুপি। পূর্ব পাকিস্তানে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় ১০টি প্রকল্পে। এই পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে জন্য গৃহীত ৭টা প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় ৬৩.৩৩ মিলিয়ন রুপি। একই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মঞ্জুরকৃত ১১ টা প্রকল্পে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৭১৫.২৫ মিলিয়ন রুপি।[১০৪] বন্যা প্রতিরোধে বা বন্যা পরবর্তী পূনর্বাসন প্রকল্পে সরকারি সহায়তা পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার ব্যাপকতা ও ক্ষয়-ক্ষতিও বেশি হয়ে থাকে। ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুদান দেওয়া হয় ৩০০ লক্ষ রুপি ও ঋণ দেওয়া হয় ১৫০ লক্ষ রুপি। ১৯৫৫ সালে সেই অনুদান হয় ১৭০ লক্ষ রুপি ও ঋণ ১৫০ লক্ষ রুপি। অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে এই সংক্রান্ত অনুদানের পরিমাণ ছিল ১০০ লক্ষ রুপি। আর ১৯৫৫ সালে অনুদান ৮৩ লক্ষ রুপি ও ঋণের পরিমাণ ৪০০ লক্ষ রুপি। পশ্চিম পাকিস্তান ওয়াপদা কর্তৃপক্ষ ১০ বছরে মাস্টার প্লানের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৬১ সালে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে।

---

১০১ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৪।

১০২ জয় বাংলা সংবাদপত্র, ২৭ আগস্ট, ১৯৭১, সংগৃহীত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ভলিউম ৬।

১০৩ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৫।

১০৪ ন্যাশনাল এসেম্বলি অব পাকিস্তান ডিবেটস, ভলিউম- তিন, ২৪ জুন, ১৯৬৬, পৃ.১৩৭৫-৭৬।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য ৫০ লক্ষ রুপি প্রদান করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এ সময় এ সংক্রান্ত কোনো তহবিল মঞ্জুর করা হয়নি।[১০৫] বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদা ১৯৬৭ সালে আরেকটি মাস্টার প্লান করে যার খরচের পরিমাণ ছিল ২৮২০ মিলিয়ন রুপি। কিন্তু ১৯৬৮ সালে ভয়াবহ বন্যা হবার কারণে প্রাদেশিক সরকার একটি সাব-কমিটি গঠন করে। যাচাই-বাছাই পূর্বক এই কমিটি ১৯৬৮ সালে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।[১০৬]

সারণি- ৬

পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের প্রাক্কলন ব্যয়:[১০৭] (লক্ষ রুপিতে)

প্রথম পরিকল্পনা (প্রকৃত ব্যয়) (লক্ষ রুপিতে)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (প্রকৃত ব্যয়) (লক্ষ রুপিতে)	তৃতীয় পরিকল্পনা (প্রাক্কলিত ব্যয়) (লক্ষ রুপিতে)
৩১.১০	৪৬৬.৫৫	৭২৩.০০

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বরাদ্দ হলেও বন্যা নিয়নন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য সফলতা আসেনি। এ সময় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তাও সরকার গ্রহণ করেনি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী থাকা অবস্থায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রুগ মিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু, এই মিশন বাস্তবায়ন করার মত যথেষ্ঠ সময় তিনি পাননি। ১৯৫৭ সালে এই মিশন যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থার সুপারিশ করে তখন তা বাস্তবায়ন করতে খরচ পড়ত চারশ কোটি টাকা। কিন্তু, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ১৯৬৫ সালে এসে এই প্রকল্প আবার আলোচনায় আসে। তখন বলা হয় এই যে, এই প্রকল্প সম্পাদন করতে এখন পূর্বের থেকে নয় গুণ বেশি অর্থ অর্থ্যাৎ তিনহাজার ৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে। তখন সিদ্ধান্ত করা হল যে, এত বড় প্রকল্প একসাথে বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। এজন্য বড় প্রকল্পকে ভাগ করে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হল। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞও আনা হল। কিন্তু পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে ক্রুগ মিশন সফলতার মুখ দেখেনি।[১০৮] যখন

১০৫ ন্যাশনাল এসেম্বলি অব পাকিস্তান ডিবেটস, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ. ৪৪৬-৪৫০।

১০৬ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

১০৭ হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।

১০৮ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৬৯।

পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা আশা করেছিল যে, সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পন্ডিত নেহেরু যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি বন্যা ও সেচ সমস্যার সমাধানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও আসতেন। ক্রুগমিশন বাস্তাবায়ন ছিল অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ এটা ছিল তুলনামুলক অনেক বড় বাজেটের। অন্যদিকে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা বাজেটের স্বল্প মেয়াদি ব্রহ্মপুত্র বাঁধ ও পানি বিজলি প্রকল্পও অর্থাভাবে সরকার ও কাজ শুরু করেনি।[১০৯]

অতিরিক্ত বন্যা যেমন ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে তেমনি সেচ ব্যবস্থার অবহেলার দরুন কৃষিখাতের সার্বিক অগ্রগতিও পিছিয়ে পড়ে। কৃষিখাতে সরকারের অবহেলার দরুন সার্বিকভাবে এ খাতের অবহেলা দৃশ্যমান হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান শতকরা ষাট টাকা থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে তা গিয়ে দাড়ায় শতকরা ছেচল্লিশ টাকায়। কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবস্থাপনায় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সরকারি শস্যভান্ডার নির্মাণ তাঁর মধ্যে অন্যতম। দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলায় এই এই শস্যভান্ডার ছিল ১৫০টি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯০টি। ১৯৬৫ সালে এই শস্যভান্ডারের পরিমাণ দাঁড়ায় পূর্ব বাংলায় ২১১ টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০৮ টি।[১১০]

সারণি- ৭:

বন্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের গৃহীত প্রকল্প ও অর্থ বরাদ্দ

পূর্ব বাংলার প্রকল্প	প্রস্তাবিত খরচ (কোটি টাকায়)	পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকল্প	প্রস্তাবিত খরচ (কোটি টাকায়)
উপকূলীয় বাঁধ	৯৯.১৫	মঙ্গলা বাঁধ (অপর ৭টি প্রকল্পসহ)	৫০০
গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প	৫০.৯০	তারবেলা বাঁধ	৪২৫
তিস্তা বাঁধ প্রকল্প	৪৭.১৮	গোলাপযম বহুমুখী প্রকল্প	৩৮
বৃহত পানি উন্নয়ন এবং	১৩.৪৬	চাদ-দোয়াব প্রকল্প	৩০.৫০

১০৯ ঐ, পৃ-১৬৯।

১১০ ঐ, পৃ. ১২৭-১২৮।

পাম্প সেচ			
ব্রহ্মপুত্র বাঁধ প্রকল্প	৬.৩৯	নিম্নখাল প্রকল্প	২২.৪৪
ফেনি সাবডিভিশনে বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প	০০.৮৮	করাচী সেচ প্রকল্প	৮.৮৬
ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ডেমারা প্রকল্প	প্রস্তাবিত খরচের উল্লেখ নেই	ডান্ডা বাধ	৬.৬৮
ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম বহুমুখী প্রকল্প	প্রস্তাবিত খরচের উল্লেখ নেই	লারকানা-শিকারপুর প্রকল্প	২.২২
		উচ্চ রিচেনা প্রকল্প পাইলট উইং মিলস	২৭.২১
মোটা টাকা	২১৭.৯৬	মোট টাকা	১০৬০.৯৩

উৎস: পাকিস্তান ইকোনোমিক সার্ভে, ১৯৭৬-৯৬ থেকে সংগৃহীত

ঘ) মানবিক নিরাপত্তা

অপ্রথাগত নিরাপত্তার মধ্যে মানবিক নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানবিক নিরাপত্তাকে অন্যতম হুমকি হিসেবে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। রাষ্ট্র সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানব নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রকেই গণ্য করা হয়ে থাকে। মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটি ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এই ধারণাটি বিকাশ লাভ করে।[১১১] ১৯৯৪ সালের পরবর্তীতে মানব নিরাপত্তা প্রত্যয়টি ইউএনডিপির মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। মানব নিরাপত্তার বিষয়টির জনপ্রিয়তা ও প্রসারতার পিছনে ভূমিকা রাখেন দুই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ- অমর্ত্য সেন ও মাহবুবুল হক।

১১১ তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

মানবিক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে দারিদ্রতা অন্যতম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতা সুলভ আচরণে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলটিতে ক্ষুধা ও দারিদ্রের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানী সাংবাদিক এন্থনী মাসকারেনহাস পূর্ব বাংলার দারিদ্রতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,"পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও পূর্ব বাংলার মত অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য দেখিনি। একমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, পেশোয়ারের নিকটবর্তী এলকায় গুহাবাসী পাঠান উপজাতিদের দারিদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। ..... পূর্ব বাংলার বিরাট এলাকা জুড়ে মানুষের সীমাহীন দুঃখ ও দৈন্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা মেলা ভার। পূর্ব বাংলা দৈন্যদশা শহর ও গ্রাম অঞ্চলেও সমভাবে লক্ষ্যনীয় যা পশ্চিম পাকিস্তানে নেই। ঢাকার শীর্ণকায়ার রিকশাচালক রাত কাটায় রিকশায়। দেখতে বয়স চল্লিশ আসলে বয়স হবে বিশ। বরিশালের জেলেরা, চট্টগ্রামের ডাকশ্রমিক, কুমিল্লার ধানী জমির কৃষক এবং সিলেটের রাস্তার ধারের আনারস বিক্রেতাদের দেহের ঐ একই শীর্ণ অবস্থা। পুষ্টিহীনতা, যক্ষা ও অন্যান্য শ্বাসরোধ ও পেটের পীড়া স্থানীয়ভাবে ঘোরতর অসুখ এখানকার নিত্য সহচর হয়ে দাড়িয়েছে"।[১১২]

পূর্ব বাংলার মানুষের পরিধেয় পোশাকের বর্ণনাও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে মাসকারেনহাসের দৃষ্টিতে। মাসকারেনহাস যেমনটা বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার পুরুষের জন্য পোশাক বলতে একখানি লুঙ্গি এবং ময়লা বা ছেড়া শার্ট। শাড়িই নারীদের একমাত্র দেহের আবরণ। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে গরীব গ্রামীণ নারীর জন্যও তিন প্রস্থ আবরণ রয়েছে- সালোয়ার, কামিজ এবং দোপাট্টা। তাছাড়া আবশ্যিকভাবে তারা সবসময়ের কিছু অলংকার পরবে। আর পূর্ব বাংলার নিঃস্ব নারীদের অলংকার নেই। ফুলের হার কখনও তারা পরে। খাবার জুটে কখনও একবেলা, তাও এক থালা মোটা ভাতের সাথে মসুরির ডাল কিংবা এক টুকরো মাছ মাংস ও ডেইরি সামগ্রী কমই থাকে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানী গ্রামবাসী সবদিন মাংস পায়না ঠিকই; তবে যেকোনোভাবেই হোক দুধ বা লাচ্ছি তারা খাবেই"।[১১৩]

---

১১২ এন্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, পপুলার পাবলিশার্স, (রনাত্রী অনূদিত), ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.২৭।
১১৩ ঐ, পৃ-২৭

সারণি- ৮

পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা ১৯৪৯-৫০, ১৯৫৪-৫৫

বিষয়	বছর				
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫
মোট জাতীয় উৎপাদন মিলিয়ন ঢাকা	১১৫৬৯	১২২৯৫	১২৭৪৯	১৩১১৪	১৩৫
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪২.২৫	৪৩.২৯	৪৪.৩৬	৪৫.৪৫	৪৬.
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২৬৭	২৭৫	২৭৭	২৭৯	২৮৪
জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৬	৩	২	৩
জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও হার	-	৩.৭২	.৭২	১.৭	১.

উৎস: মহিউদ্দিন আলমগীর এবং লডউইজক জে, জে, বার্লেজ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচারঃ ১৯৪৯-৫০-১৯৬৯-৭০, বিআইডিএস ১৯৭৪, ঢাকা। পৃ-১৬২

সারণি- ৯:

পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতাঃ

১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৯-৭০

বিষয়	সাল ১৯৫৪-৫৫	সাল ১৯৫৯-৬০	সাল ১৯৬৯-৭০
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকায়)	১৩২২৮	১৪৪৪৮৯	২১৯৪২
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪৭.৭২	৫৩.৯০	৭২.৪০
মাথাপিছু উৎপাদন (টাকা)	২৭১	২৬২	২৯৭

উৎস: মহিউদ্দিন আলমগীর এবং লডউইজক জে,জে, বার্লেজ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচারঃ পৃ-১৬২

সারণি- ১০

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য [টাকার অঙ্কে]

সাল	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকস্তিান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১){২১}*১০০ ২
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	২৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস: পাকিস্তানের ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট। (পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের রিপোট)

মানবিক নিরাপত্তার অন্যতম অনুষঙ্গ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিরাপত্তা। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মত। পাকিস্তানের শুরুর দিকে যেসব প্রাণঘাতী রোগ মানুষকে নাজেহাল করত তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলঃ কলেরা, আমাশয়, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, গুটি বসন্ত প্রভৃতি।[১১৪] পশ্চিম পাকিস্তানে কলেরা, গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৯-১৯৫০ সালে মারা যায় ৫০০ জন। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মারা যায় ৩৭,৬০৫ জন। ১৯৪৮-৫২ সালের মধ্যে শুরু ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে পূর্ব বাংলায় মৃত্যুবরণ করে ৩,৮১,৭০৫ জন। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ৪০,২৭০ জন। ১৯৫২ সালে গুটি বসন্ত ও যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মারা যায় যথাক্রমে ২৫৭৯ জন ও ৭৫৭৩ জন। অন্যদিকে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় গুটি বসন্তে মারা যায় ৭১৫৪ জন, কলেরায় ১৮৩৬১ জন ও যক্ষ্মায় ৩৭২৩ জন। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে

[১১৪] হাবিবউল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। ১লা নভেম্বর ১৯৫০ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার গ্রাম ও শহরগুলোর মধ্যে মাত্র ২২টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ১৪৮টি।[১১৫]

বাইরের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালের দিকে পাকিস্তান বহু সাহায্য পায়। United Nations International Children Emergency Fund ইউনাইটেড ন্যাশন ইন্টারন্যাশনাল চিল্ড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড কর্তৃক রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে শিশু খাদ্যের জন্য যে বরাদ্দ করা হয় তার বেশির ভাগই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।[১১৬]

সারণি- ১১:

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৫৮	১৯৬৭
পূর্ব বাংলা	২	৬
পশ্চিম পাকিস্তান	৬	৬
মোট	০৮	১২

উৎস: National Assembly of Pakistan Debates, 4 February, 1969, Vol-I, P.410

১৯৫৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকার নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালের সংখ্যা ৭৩টি, যেখানে বেড সংখ্যা ৩৭৭২টি। অন্যদিকে এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি হাসপাতাল ছিল ১৭৩টি। যার বেড সংখ্যা ছিল ৮৮১৪টি। ১৯৬০ সালে এসে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫টি। যার বেড সংখ্যা ৮৮১৪টি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সময় হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ১৭৬ টি ও বেড সংখ্যা ১২, ৫৮৭ টি। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৬টি করে মোট ১২টি মেডিকেল কলেজ ছিল এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হাসপাতাল সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০০ টি ও ৩৯৭ টি। নার্সিং ইন্সটিটিউট পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৭টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৯টি। টিবি হাসপাতাল পূর্ব পাকিস্তানে ১০টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৪টি। কুষ্ঠ হাসপাতাল উভয় প্রদেশে ছিল ৪টি করে।[১১৭]

---

[১১৫] ঐ, পৃ. ২৩৫।

[১১৬] ঐ, পৃ. ২৩৩।

[১১৭] ঐ, পৃ. ২৩৩।

সারণি- ১২

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য[১১৮]

	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব বাংলা	
জনসংখ্যা	৫৫ মিলিয়ন		৭৫ মিলিয়ন	
ডাক্তারের মোট সংখ্যা	১২,৪০০		৭৬০০	
হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা	২৬০০০		৬০০০	
পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩২৫		৮৮	
আরবান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	৮১		৫২	
বেসরকারি শ্রমশক্তি নিয়োগ	পল্লী ৫৯%	শহর ৪১%	পল্লী ৮৬%	শহর ১৪%
মাথাপিছু আয় (রুপিতে)	১৯৬০-৩৩৫ (বৃদ্ধির হার ৪৬.৯%) ১৯৭০-৪৯২		১৯৬০-২৬৯ (বৃদ্ধির হার ১২.৬%) ১৯৭০-৩০৩	

উৎস: Bangladesh Documents, Ministry Of External Affairs, Government of India, New Delhi: 1971, Chapter 01, pp.21-22

স্বাস্থ্য সেবার সকল উপকরণ পূর্ব পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল। পর্যাপ্ত হাসপাতলের যেমন সংকট ছিল, তেমনি হাসপাতাল থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত আসন ছিল না। ঔষধের ডিস্পেন্সারিতেও প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া দুস্কর ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনাইনের অভাবে রোগীরা মৃত্যু বরণ করতে। খাবার পানির জন্য গ্রামে পর্যাপ্ত পুকুর ও টিউবওয়েল ছিলনা।[১১৯]

নিরাপত্তা একটি দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনের পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তার পূর্ব অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য কার্যত তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ সামনে আসলে এই অঞ্চলকে নিরাপত্তায় শক্তিশালী করার পরিবর্তে বরাবরই তারা পশ্চিম পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়েছেন। প্রচলিত তথা সনাতন নিরাপত্তা কাঠামোয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। নিরাপত্তা কাঠামো থেকে শুরু করে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, সামরিক বিভিন্ন দফতর, ঘাঁটি স্থাপন, ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণ-নিরাপত্তার প্রত্যেক স্তরেই ছিল দু'অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই

১১৮ ঐ, পৃ-১০১।
১১৯ ঐ, পৃ. ৩৪৫।

অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তার ২১ দফা সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহারে পূর্ব বাংলাকে আত্মরক্ষার স্বার্থে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থানান্তরের দাবী করা হয়। অন্যদিকে অপ্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামোয় যে বৈষম্য ছিল তা আকাশচুম্বী। খাদ্য সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা, খরা, জ্বালানী সংকট ও মানবিক নিরাপত্তায় পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফারাক ছিল বিস্তর। অপ্রথাগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতেও নজর দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করা হয়। পূর্ব বাংলার লবণ তৈরীর কারখানা স্থাপনে জোর দেওয়া, খাল খনন ও সেচের মাধ্যমে দেশকে বন্যা ও দূর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা, শিল্প ও খাদ্যে দেশকে সাবলম্বী করার দাবী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেগুলো উপেক্ষা করে যার ফলে নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে বাঙালিদের দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত ১৭ দিন ব্যাপী যুদ্ধে নিরাপত্তা নিয়ে বাঙালিদের আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়। এই যুদ্ধে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটা প্রদেশ হওয়া স্বত্ত্বেও তার নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কোনরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি বাঙালির মোহ ভঙ্গ হয় এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের দাবী দাওয়া ও পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা ও যুদ্ধে বাঙালির ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা ও যুদ্ধে বাঙালির ভূমিকা

১৯৬০ এর দশকটি সারা পৃথিবীর মত ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য ও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দশক ছিল। দীর্ঘ উপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে বিজয়ের পর স্বাধীন দেশ হিসেবে আলজেরিয়ার যাত্রা, কিউবা সংকট, ভিয়েতনাম-আমেরিকা যুদ্ধ, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম, ফ্রান্স ও জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, চে গুয়েভারার মৃত্যু, চীনে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় আলোচিত ছিল এই দশকটি।[১] ১৯৬০'র দশকটি আমাদের এই ভূখন্ডের জন্য ও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এই দশকেরই অনেকগুলো ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সহ পরবর্তীকালের অনেক কিছুর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই দশকের যে সমস্ত ঘটনা পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ অন্যতম। নিজের ইমেজ বৃদ্ধি ও নড়বড়ে অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইয়ুব খান এই যুদ্ধ শুরু করলেও তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কাশ্মীরের জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্যই তিনি যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধে যেমন পাকিস্তান সুবিধা করতে পারেনি, তেমনি জনগনও এই যুদ্ধের সমালোচনা করেছিল।[২] ১৭ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সরকার কার্যত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। কিন্তু, এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা যেমন বীরত্ব প্রদর্শন করে, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি প্রগতিশীল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি নৈতিক সমর্থন জোগায়। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিশেষ করে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালায়। যাইহোক, ৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধ তেমন দীর্ঘস্থায়ী না হলে ও এই যুদ্ধ পরবর্তীতে বাঙালির শিক্ষিত সচেতন শ্রেণিকে পাকিস্তান থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাবার

---

১ মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

২ গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর ঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা, ঢাকা, পৃ . ৫৮।

ক্ষেত্রে চিন্তার দ্বার প্রসারিত করে। যুদ্ধের শেষ হওয়ার মাস ছয়েক পরেই লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান কতৃক উত্থাপিত ছয় দফার প্রভাব থেকেই সেটি স্পষ্ট হয়।

৩.১ যুদ্ধের পটভূমিঃ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর থেকে যে সকল সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদমান ছিল তার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা অন্যতম। এই কাশ্মীর সমস্যা নিয়েই দেশ দুটি বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কাশ্মীর সমস্যা ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান প্রধান সমস্যা হলে ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়েও দেশ দুটির মধ্যে বিরোধ ছিল।

কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি অত্যন্ত জটিল। ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের সময় চুক্তি হয়েছিল যে করদ রাজ্য সমূহ জনমতের উপর ভিত্তি করে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করবে। কিন্তু কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা মহারাজা এই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনমতের দাবীকে অগ্রাহ্য করে ভারতের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কাশ্মীরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এর প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি খুব ঘোলাটে হয়ে ওঠে এবং তা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধে রূপ নেয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যত গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যা ভারত পাকিস্তান দুটি দেশই মেনে নেয়।

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ১৯৬৫ সালে। এই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর দেশ দুটি আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এটি ছিল দুটি দেশের মধ্যে এক বছরে সংঘটিত তিনটি বিবাদমান ঘটনার সর্বশেষ ধাপ। ঘটনাগুলো হল ঃ এপ্রিল মাসে কুচের রান এলাকায় স্বল্প পরিসরে পরীক্ষামূলক যুদ্ধ, আগষ্ট মাসে কাশ্মীরী জিহাদীদের ছদ্মবেশে পাকিস্তানীদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ এবং সবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে দু'দেশ পরস্পরের আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন।[৩] তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এই তিনটি ঘটনা এক বছরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি নয়। দেশ ভাগের পর থেকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা - ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর যুদ্ধ ও পরবর্তীতে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন করে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্তি, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত

৩ নুরুল হুদা আবুল মনসুর, 'পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৭।

যুদ্ধ, ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রভৃতি ঘটনায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী হতাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া ভারত চীন বৈরীতা এবং চীনের সাথে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে পাক-ভারত যুদ্ধে চীনকে কাছে পাবার সমূহ সম্ভাবনা, ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের মধ্য দিয়ে দু দেশের মধ্যকার সম্পর্ক বৃদ্ধি ভারতের বিরোদ্ধে যুদ্ধে আইয়ুব খানের মনোবল বৃদ্ধি করে। [৪]

G.W.Choudhury এর ভাষায় - The mini Indo-pakistan battle over the marshy lands of in the Rann of Kuch in the spring of 1965 gave the Pakistani armed forces a false sense of superiority, and memories of India's military defeats by the Chinese in 1962 were still fresh. Under this favourable circumstances, a group of the ruling elite- Bhutto being the most enthusiastic among them felt that a policy of confrontation with India over Kashmir might be fruitful." [৫]

কুচের রান এলাকার ঘটনা: ৩২০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রশস্ত কুচের রান এলাকাটি ভারতের গুজরাট রাজ্য ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি মরুময় ও জলাভূমি বেষ্ঠিত অঞ্চল। বাউন্ডারি কমিশনের ব্যর্থতার কারণে দেশ বিভাগের সময় প্রায় ৩৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল নিয়ে দুটি নতুন দেশের মধ্যে বিরোধ তৈরী হয়। জনমানবহীন মরুভূমির এই অঞ্চলটির উত্তর দিকের অর্ধেকটা দাবী করেছিল পাকিস্তান। আর ভারতের দাবী ছিল পুরোটাই তাদের।[৬] ১৯৬৫ সালের ৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিরোধপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করলে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের মধ্যস্থতায় ১৯৬৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে যুদ্ধ বিরতি কার্যকরী হয়।

অপারেশন জিব্রালটার: কুচ অঞ্চলের ঘটনার পরে আইয়ুব খান কাশ্মীর বিষয়ে আর ও মনোযোগী হন। এ দিকে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনগনের মধ্যে দেশ প্রেম ও ঐক্য সৃষ্টি করে'- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা করতে থাকেন। জিব্রাল্টার অপারেশন নামে পরিচিত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র কাশ্মীর ভূখন্ডে ভারতীয়দের সাথে স্থানীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

---

৪ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৫ G.W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan,* The UPL, Dhaka, 2011.p.21.

৬ কাজী আনওয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১২।

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরের ৭ হাজার মুজাহিদিন নিয়ে গঠিত ছিল এই বাহিনী। কিন্তু এই অভিযান পরবর্তীকালে ভিন্নরুপ নিলে পাকিস্তান ভারতের সাথে বড় ধরণের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।[৭]

অনুপ্রবেশকারীদের খবর পেয়ে ভারত সরকার ৫ আগস্ট পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু কওে ১৫ আগস্টেও মধ্যে উত্তর ফ্রন্টের কারগিলের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ি অবস্থান পুনদখল করে নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এর পরের ১০ দিনে উত্তর পশ্চিম ফ্রন্টের পির সাহেবা ও হাজী পীর গিরিপথের প্রতিরক্ষা পোস্ট গুলো আক্রমণ করে বেশ সাফল্য অর্জন করে।[৮] ২৭ আগস্টের ভিতর ভারতীয় সেনাবাহিনী ইউরি বেদরি এলাকার যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করলে পাকিস্তান সেনা বাহিনী ১ সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের দক্ষিন পশ্চিম প্রান্তের ভিম্বার চাম্ব যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করলে এই সংঘর্ষ ক্রমান্বয়ে জটিল রুপ ধারণ করে।

সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঃ ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমানা রেডক্লিফ লাইন অতিক্রম করলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সূচনা হয়।[৯] কাশ্মীর ফ্রন্টের চাপ কমানোর জন্য ভারত একই দিনে লাহোরে তীব্র অভিযান পরিচালনা করে এবং এর ঠিক পরের শিয়ালকোটে অভিযান শুরু করে। লাহোর আক্রমনে ভারত প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও পরবর্তীতে বেশ অসুবিধায় পড়ে। অন্য দিকে পাকিস্তান ভারত অধিকৃত পাঞ্জাবের খেমখারানে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করলে ভারতীয় বাহিনীর শক্তিমত্তার কাছে টিকতে না পেরে বহু ক্ষয় ক্ষতি ও প্রাণ হানির শিকার হয়। শিয়ালকোটে রণক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ট্যাংকযুদ্ধের এক পর্যায়ে ভারত অভিযান বন্ধ করে দিলে পাকিস্তান সাময়িকভাবে কিছুটা সাফল্য লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানেও যুদ্ধের কিছু ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার কুর্মিটোলা এলাকার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মুমিদ আহমেদ ভারতীয় বিমানের বোমার আঘাতে আহত হয়। পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। বোমার আঘাতে তার ঘুম ভেঙে গেলে বোমার টুকরা তার গায়ে লাগে।[১০]

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিন ১৯৪৯ সালের কাশ্মীর চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার দুই পার হইতে স্ব স্ব সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, 'বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যেকোনও প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত সরকার ও জনসাধারণ অভিনন্দন জানাইবে।' তার বাণীতে তিনি আরও বলেন- 'সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করিতেছে।

৭ নুরুল হুদা আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
৮ কাজী আনওয়ারুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩।
৯ নুরুল হুদা আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
১০ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

কারণ সোভিয়েত সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়াছে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাশ্মির সমস্যার সমাধান হইবে। সামরিক তৎপরতার ফলে সংঘর্ষ সম্প্রসারিত হইবে তা সুনিশ্চিত।'[১১] এরুপ পরিস্থিতিতে ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতির জন্য নমনীয় হয়। গণভোটের ব্যবস্থা বর্জিত প্রস্তাব ১০-০ ভোটে জাতিসংঘে পাস হয়। জর্ডান ভোট দানে বিরত থাকে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এমন কার্যক্রম হইতে উভয়পক্ষকে বিরত থাকার আহবান জানানো হয়।[১২] উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতির পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের উদ্যোগে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়।

৩.২ যুদ্ধে বাঙালির ভূমিকাঃ

১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধে যদিও পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার ব্যাপারে পাকিস্তান কোনো ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, তারপরে ও এই যুদ্ধে বাঙালিদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালিরা জীবন বাজি রেখে সরাসরি যেমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে ছাত্র, পেশাজীবী, সুশীল সমাজ এবং কবি সাহিত্যিকরা এই যুদ্ধে ভারতের বিপক্ষে তাদের স্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেন। ১৯৬৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ জামে মসজিদে বাদ জুমা সহস্রাধিক মুসলিম কাশ্মিরী জনগণের মুক্তি কামনা করে মোনাজাত করে।[১৩]

পূর্ব বাংলার জনগণ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে যেমন মিছিল ও মানববন্ধনের মাধ্যমে ভারতের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে, তেমনি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত পূর্ব বাংলার সৈনিক ও অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তানে রনাঙ্গণে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করে। ভারতীয় বাহিনী লাহোর আক্রমণ করলে সেখানে বার্ষিক মহড়া উপলক্ষে উপস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা জীবন বাজি রেখে মরণপণ সংগ্রামের মাধ্যমে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে।[১৪] বিমান যুদ্ধে ভারতের ৫টি বিমানকে ভূপাতিত করে বাঙালি বৈমানিক স্কোয়াড্রন লিডার মাহমুদ আলম সাহসিকতার পরিচয় দেন।

---

১১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
১২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
১৩ দৈনিক পাকিস্তান, ০৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
১৪ মোরশেদ শফিউল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৭ সেপ্টেম্বর তিনি একাই ৫টি ভারতীয় হান্টার জেট জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মধ্যে তিনিই একমাত্র পাইলট, যিনি সারগোদার প্রতিরক্ষা সংগ্রামে শত্রু পক্ষের উপর প্রথম পাল্টা আঘাত হানেন। তিনি শত্রুপক্ষের ১১টি হান্টার ভূপাতিত করেন। পুরষ্কার স্বরূপ যুদ্ধ শেষে সিতারাই জুরাত পদকে ভূষিত হন।[১৫] আর একাকী একটি মেশিন গান দিয়ে ভারতীয় সৈনিকদেরকে তার শেষ বুলিটটি খরচ না হওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ছেলে তাজুল ইসলাম। আর দলের অন্যরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে কৌশলগত কারণে সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে পশ্চাৎপসারণ করে বিআরবি ক্যাবলের পুল উড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় সৈনিকদের অগ্রযাত্রা রোধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যরা বাঙ্কারের মধ্যে বেয়নেট চার্জ করে তাজুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[১৬] তার বীরত্ব ও তেজোদ্দীপ্ত সাহসিকতার জন্যও তিনি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব পাননি। কারণ খেতাব পেতে প্রয়োজনীয় দুজন অফিসারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।[১৭] ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শৌর্য-বীর্যের প্রশংসা করে পশ্চিম পাকিস্তানী কবি আগা শোরেশ কাশ্মিরী এসময় কবিতা রচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সভা সমাবেশে যা পঠিত হয়।[১৮]

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধকালে বাঙালির অর্জনের স্বীকৃতিতে পূর্ব বাংলার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। যদিও যুদ্ধ শেষে পূর্ব বাংলা বিভিন্ন স্থানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সংবর্ধনাকে পাকিস্তানি সরকার ভালোভাবে নেয়নি। চট্টগ্রামের নিয়াজ স্টেডিয়ামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পন্ড করার চেষ্টার মাধ্যমে যার প্রমাণ মেলে। বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি বীর মেজর আজিজ ভাট্টিকে 'নিশান-ই-হায়দার' নামে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবে ভূষিত করা হয়। মেজর আজিজকে নিয়ে নির্মাণকৃত প্রামান্য চিত্র পূর্ব বাংলার সিনেমা হল গুলোতে বেশি বেশি প্রদর্শিত হয়। বিপরীতে তাজুল ইসলাম কিংবা মোবারক আলির মতো বাঙালি সৈনিক যারা যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছে তাদের সেসব বীরত্ব গাঁথা গল্প খুব কম মানুষই জানতে পারে। [১৯]

---

১৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

১৬ মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিন কাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৩।

১৭ ঐ।

১৮ মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

১৯ আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬১।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা দল মত নির্বিশেষে ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করতে থাকেন। আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য বিবৃতি দেন। ১৩ সেপ্টেম্বর মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতির মাধ্যমে এই যুদ্ধের নিন্দা করে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবী জানান। যুদ্ধের কয়েকদিন ভাসানী পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের পাশাপাশি ভারত ও আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেন। জাতিসংঘের নীরব দর্শকের মত ভূমিকা পালনের কারণে পাকিস্তান সরকারকে বলেন, 'প্রয়োজনে আমাদের জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে হবে।'[২০] যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরের দিন একবার এবং যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হওয়ার পরে আরেকবার নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিব সহ বিরোধী নেতৃবৃন্দ গভর্নর মুনায়েম খানের আমন্ত্রণে তার সাথে সাক্ষাত করেন। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তাসখন্দ যাবার আগে আইয়ুব খান ঢাকা আসেন তখন ও প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদেরও সাথে তিনি সাক্ষাৎ করে দুই দফা আলাপ করেন।[২১]

নারায়নগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবও কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘের কড়া সমালোচনা করেন।[২২] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান বিচারকালে ট্রাইবুনালের সামনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধ কালীন তাঁর ভূমিকা এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুনায়েম খান ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে তাঁর সাক্ষাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন:

'১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধচলাকালে যে সকল রাজনিতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাঁহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই। যুদ্ধচলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি

২০ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮।
২১ *ঐ*, পৃ. ২৭১।
২২ আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২।

আহবান জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করি।'[২৩]

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন পেশাজীবীরা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে 'Crush India লেখা ফেস্টুন ও ব্যানার সহ মিছিল বের করলে তাতে বহু মানুষ যোগ দেয়।[২৪] বহিঃবিশ্বের বহু বুদ্ধিজীবীর পাশাপাশি বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ও যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম প্রমুখ। পূর্ব বাংলার কবি, প্রগতিশীল বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এ সময় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতের আক্রমণের সমালোচনা করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর কবি সুফিয়া কামাল, সেলিমা আহমেদ ও মিসেস উইলস প্রমুখের নেতৃত্বে নারীদের একটি মিছিল প্রবল বর্ষণের মধ্যে বায়তুল মোকাররম থেকে সভা করে গভর্নর হাউসে গিয়ে গভর্নর মোনায়েম খানের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সংহিত ব্যক্ত করেন।[২৫] এছাড়া যুদ্ধের দিনগুলোতে বিভিন্নভাবে নৈতিক সমর্থনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে মেয়েদের রাইফেলসহ কুচকাওয়াজ ও ফার্স্ট এইডের মহড়া অন্যতম। পূর্ব বাংলার মৌলবীরা এ সময় জেহাদ ঘোষনা করে বসে। মৌলবীদের অনেকেই টিনের ছোট ছোট তলোয়ার কোমরে ঝুলিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করতে যেতে দেখা যায়।[২৬]

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখে যুদ্ধ উপলক্ষ্যে পাকিস্তানে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন করা হয়। দেশের সমস্ত ব্যাংক ও পোষ্ট অফিসকে জনসাধারণের নিকট হইতে নগদে ও ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও সিকিউরিটি তহবিলে চাঁদা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানে এগিয়ে আসে। আহসান উল্লাহ হল ছাত্র ইউনিয়ন, ইউনাইটেড ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, ইপিআরটিসি কর্মচারীবৃন্দ, বিসিজি রিসার্চ টিম, ইস্টার্ন ব্যাংক কোং, ঢাকা জেলা কাউন্সিল, ইউপিজি প্রেস ওয়ার্ক, কিশোরগঞ্জের মোক্তারদের সমিতি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ,

২৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, (২য় খন্ড), পৃ. ৩৬০।
২৪ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
২৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯।
২৬ আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ৩৪৯।

রেলওয়ে কর্মচারী, দিনাজপুর বার সমিতি, চট্টগ্রাম বার সমিতি, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, জয়পুরহাট পপুলার জুট বেলিং কোম্পানী প্রভৃতি। [২৭]

কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের অনেকেই এ সময় ভাতের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকা ও রেডিও টেলিভিশন মাধ্যমে প্রচারযুদ্ধে নেমে পড়ে। কবিতা, গল্প, গান, নাটক, কথিকা প্রচার হতে লাগল রেডিও ও টেলিভিশনে। এছাড়া নানা গালগল্পও ছড়ানো হতো। আতাউর রহমান খান তার *'স্বৈরাচারের দশ বছর'* বইতে উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> 'পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলল রেডিও মারফত। কবিতা, গল্প, গান, নাটক, কথিকা প্রচারিত হতে লাগল তুফানের বেগে। দিবারাত্র সবই দেশাত্মবোধক। বহু আজগুবি গল্প ও প্রচার হতে লাগল রেডিও মারফত অন্য সব ব্যবস্থা অচল কে একজন কোথায় স্বপ্ন দেখেছে, রাসুলুল্লাহ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন, জিজ্ঞাসা করা হল, হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত কোথায় তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন ? হুজুর জবাব দিলেন পাকিস্তানে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে দেশ বিপন্ন ওদের সাহায্য ও রক্ষার জন্যই আমার যেতে হচ্ছে সেখানে। এমনি কত এসব নাকি যুদ্ধের সময় নৈতিক বল বৃদ্ধি করে।'[২৮]

পূর্ব পাকিস্তানের লেখক সাংবাদিকদের একটি দল যুদ্ধ অবসানের পর পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যান। পাকিস্তানী সৈন্যদের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব গাঁথা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমানের সীমান্ত শিবির এবং মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক ও রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত রণাঙ্গন (১৯৬৬) অন্যতম।[২৯]

৩.৩ যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের অধীনস্থ পূর্ব বাংলা কার্যত নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে ছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো তৈরী করে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট ও ঢাকায় ভারতীয় বোমা বর্ষণের খবর পত্রিকা মারফতে

---

২৭ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
২৮ আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১।
২৯ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

পাওয়া যায়।[৩০] ১০ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলায় মোঘলহাট এলাকায় ৪ ঘন্টা ধরে বোমা বর্ষণের খবর পাওয়া যায়।[৩১] পরদিন ১১ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাটে প্রচন্ড বোমাবর্ষণের খবর শোনা যায়।[৩২] তবে স্থল পথে ভারতীয় আক্রমণের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

তবে কোনো কোনো উৎসে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় বিমান ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জায়গায় হামলা করার যে সংবাদ পত্রিকায় প্রচারিত হয়, যেটা এ অঞ্চলের অনেকেই বিশ্বাস করলেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, এ ধরনের হামলার কোন ঘটনা ঘটেনি। যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য এ সংক্রান্ত খবর প্রচারিত হয়েছে।[৩৩] ভারত যদি এ সময় পাকিস্তানের পূর্বাংশের উপর কোনো আক্রমণ পরিচালনা করত তাহলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার সামরিক সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি কোনটিই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছিলনা। এই যুদ্ধে ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আগ্রাসন চালাত তাহলে ৬ ঘন্টার বেশি সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যেত না বলে একজন পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক মেজর জেনারেল (অব:) গোলাম উমর পরবর্তীকালে অভিমত প্রকাশ করেন।[৩৪]

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। যুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের সাথে পূর্বাংশের বিমান চলাচল অকার্যকর হয়ে পড়ে। এছাড়া টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টার ছাড়াও স্থল, নৌ ও বিমান- কোন মাধ্যমেই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দু'অংশের মধ্যে যোগাযোগ ছিলনা। যুদ্ধকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অভ্যন্তরীন বিমান সার্ভিস, পাকিস্তান ভারত বিমান সার্ভিস, পি, আর, এ-র বিমান সার্ভিস বন্ধ ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জলপথের গমনের জন্য সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও স্থগিত ছিল। তবে বিদেশী সামুদ্রিক জাহাজ ও বিদেশী বিমানের চলাচল বন্ধ হয়নি বলে মনে করা হয়। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান ও

---

৩০ আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১০৪।

৩১ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

৩২ ঐ, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

৩৩ মুনতাসির মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬০।

৩৪ ঐ।

সামুদ্রিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৩৫] ৬-২৩ তারিখ পর্যন্ত বিমান যোগাযোগ বন্ধ ছিল তবে দুই প্রদেশের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল টেলিপ্রিন্টার ও টেলিগ্রাম।একমাত্র সবুর খান ছাড়া পাকিস্তানের সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান যে বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসেন সেখানেও পূর্ব অঞ্চলের কেউ উপস্থিত ছিলনা।[৩৬] তবে ঢাকার গভর্নর যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনার জন্য যাদের নিয়ে বসেছিলেন তারা সবাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের।

ভারত কতৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে পাকিস্তান সরকার যে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা, তা পূর্বাংশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ এই যুদ্ধের ফলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধাবসানের পরে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্য ও বঞ্চনার আরেকটি দিক স্পষ্ঠ হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা তৈরী হয়। যুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরের কাছে পূর্ব বাংলার বিরোধী নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। পাকিস্তানীরা খুব দম্ভ করে বলত যে, পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষনীয়, তার রক্ষার ভার পশ্চিমের উপর ন্যস্ত। ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকায় পৌছার পূর্বে তাদের সৈন্যরা দিল্লী দখল করবে। এমনকি ৬৫'র যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার কথা উঠলে পূর্ব বাংলার মানুষের উদ্বেগের জবাবে তাদের পুরাতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে শোনা যায়। জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদের ভাষণে বলেন যে, যুদ্ধের দিনগুলিতে চীন পূর্বপাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।[৩৭]

এই ধরনের চিন্তাধারা থেকে তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ ও সামরিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় নানারকম বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় দেখা গেছে বাঙালি সৈন্যরা লাহোরে অবস্থানকালীন সেখানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধের একেবারে শুরুতে পাকিস্তান সরকার সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারি করে। যুদ্ধকাল নিরাপত্তা দেবার পরিবর্তে এসময় প্রতিরক্ষা আইন নামক নির্যাতনধর্মী এক আইন বলবৎ করা হয়। যে আইনের বলে যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ

---

৩৫ আব্দুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৩৬ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ . ১০২।

৩৭ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এ. এ. কে. নিয়াজি *দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*, কাজী আখতারউদ্দিন (অনুদিত), দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৬৩।

পরবর্তীকালে বিরোধী দলীয় অসংখ্য নেতা-কর্মী, বাম ঘরানায় নেতা, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ নেতা-কর্মী, লেখক ও সাংবাদিক ও গ্রেফতার পূর্বক বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। কারও কারও গৃহবন্দী করে রাখা হয়। শত্রু সম্পত্তি নামক একটি অধ্যাদেশ এ সময় জারি করা হয়। যার মাধ্যমে হিন্দু মালিকানাধীন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শত্রু সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। যুদ্ধের দিন গুলোতে এমনকি যুদ্ধ শেষের ৮ মাস পর্যন্ত পাকিস্তান রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকে।[৩৮] ১৯৬৫'র যুদ্ধের পরে এবং এর আগে বিভিন্ন বৈষম্যের ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দারুণভাবে আশাহত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো স্পষ্ট হয়েছিল মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান তাঁর লেখা 'পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ (১৯৭৩)' গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করে বলেন 'পাকিস্তান তা দূর করতে পারেনি, বরং পুরনো ব্যবস্থাই বহাল রেখেছে।' ফজল মুকিমের মতে , ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানের মোহভঙ্গ ঘটে পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে। প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আইয়ুব খানের নিকট ফাতেমা জিন্নাহ হারার পরে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, এই ব্যবস্থায় তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবেনা।

সেনাবাহিনী ইচ্ছা করলে দুই অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারত। মুকিমের জবানীতে-"The feeling of uneasiness and loneliness produced by the war started taking root" [৩৯] সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান অসন্তোষ দূর করার জন্য পাকিস্তান সরকার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দুটি অঞ্চলকে একত্রিত করার জন্য পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে কোন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সরকার এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা। নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা ছিল এমন- নিষ্প্রদীপ থাকাকালে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত থাকবে। দোকানের আলো যাতে বাইরে না আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে, চলমান যানবাহনের আলো সম্পূর্ণভাবে না নিভিয়ে যথাযথভাবে ঢেকেয় রাখতে হবে। বিমান আক্রমনের সংকেত দেওয়া হলে যানবাহনের বাতি নিভাতে হবে। প্রয়োজনে গাড়ি থামিয়ে চালকেরা নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করবে। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রদেশের সবখানে নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। [৪০] এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার

---

৩৮ মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা. ১০৪।

৩৯ মুনতাসির মামুন, *পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, পৃ. ৪৮।

৪০ আব্দুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

আরও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার মধ্যে ছিল- ব্লাক আউট, যানবাহনে বাতি না জ্বালানো, যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন, আলোক ম্রিয়মাণ, বিপদ সংকেত বা সাইরেন মেনে গাড়ি চালানো, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রভৃতি। পূর্ব পাকিস্তানের দমকল বাহিনীর ডিরেক্টরের এক জরুরী নির্দেশনামায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঘরবাড়ী, দেশজ কারখানা, ব্যবসা কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপনের সরঞ্জামাদি, পর্যাপ্ত পানি ও বালি প্রস্তুত রাখতে বলা হয়। এজন্য প্রতি পরিবারে ২ বালতি পানি ও ২ বালতি বালি মজুদ করে রাখার কথা বলা হয়। ঘোষণায় বেসরকারি দেশ রক্ষা বাহিনী ও আনসার বাহিনীকে সাইরেন বাজার সাথে সাথে স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়। [৪১] ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে রাত সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায় নিষ্প্রদ্বীপ মহড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৪ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলায় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া: জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হলে উভয় দেশের শাসকগন তা মেনে নেয়। যুদ্ধে ভারতের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশি ক্ষতি হয়। যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ভারতের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দখলকৃত অঞ্চল পূনঃদখল ও কাশ্মীর সমস্যার গ্রহনযোগ্য সমাধান ছাড়া তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরকে তারা ভারতের কাছে পাকিস্তানের নতি স্বীকারের শামিল বলে মনে করে। প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল বের হলে বিক্ষুব্ধ জনতার উপরে পুলিশের গুলিবর্ষণে লাহোরে ২ জন ব্যক্তি মারা যায়। বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।[৪২]

৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ঘোষণার আবেদন করলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল তা প্রত্যাখ্যান করে। পিন্ডিতে প্রবীন কাশ্মির নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস, আফ্রো এশীয় অর্থনীতি পরিষদের সভাপতি জনাব গুল মোহাম্মদ লাহোরে নবগঠিত কাশ্মির মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, পাকিস্তান কাশ্মির কমিটি, করাচিতে আজাদ কাশ্মিরের সাবেক প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইয়ুম সহ

৪১ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
৪২ আব্দুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

সবাই একবাক্যে বলে- 'জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করা চলিবে না।' এপিপির খবরে বলা হয় লাহোরে রাজনৈতিক মহল যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে একবাক্যে পাকিস্তান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে।[৪৩]

পূর্ব বাংলায় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াঃ যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী সকলেই পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের পরে আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, এনডিএফ সহ পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এই শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রতিরক্ষা আইন নামক নিবর্তনমূলক এক আইন পাসের মাধ্যমে যুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তীতে বিরোধী ও বাম ঘরানার বহু নেতা কর্মীকে আটক করে রাখা হয়। এছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, লেখক ও সাংবাদিদেরকে গ্রেফতার করে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়।

পাকিস্তান সরকারের চিরাচরিত ভারত বিদ্বেষ এই সময় হিন্দু বিদ্বেষে পরিণত হয়। আর পূর্ব বাংলার হিন্দুরা পরিণত হয় পাকিস্তানের শত্রুতে।[৪৪] এছাড়া সরকার 'শত্রুসম্পত্তি' নামক একটি বিতর্কিত আইন জারী করলে পূর্ব বাংলার অনেক হিন্দু মালিকানাধীন বিষয় সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রাতারাতি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হয়।[৪৫] ভাসানী এ সময় পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তান সরকারের এ ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করেন। ২৫ অক্টোবর, ১৯৬৫ ভাসানী পার্বতীপুরের এক জনসভায় পূর্ব বাংলার হিন্দুরা যাতে কোনোভাবেই নির্যাতনের স্বীকার না হয় এজন্য সরকারকে সতর্ক করে দেয়।[৪৬] পাকিস্তান সরকারের এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে থাকে। এছাড়া যুদ্ধচলাকালে ও এর ৮ মাস পর পর্যন্ত রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ থাকে। এই যুদ্ধের পরে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যোগাযোগ পাকিস্তান সরকার হ্রাস করে। এমনকি বই পত্র আনা নেওয়ার উপরে ও কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা। এর ফলশ্রুতিতে বাংলার দু'অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দুদের প্রতি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিদ্বেষ হ্রাস পেয়ে বন্ধন দৃঢ় হয়।[৪৭] ৬৫'র পাক ভারতযুদ্ধ পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

---

৪৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
৪৪ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ . ১০৪।
৪৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ২৬৯।
৪৬ মোরশেদ শফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ . ১০৪।
৪৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯।

৩.৫ পাক- ভারত যুদ্ধে বহিঃর্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ পাকিস্তান ও ভারতের এই দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হলেও বহিঃবিশ্বে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ মুসলিম দেশকে এই যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পাকিস্তানকে সাহায্য করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।[৪৮] মালয়েশিয়া-ই একমাত্র মুসলিম দেশ যে ভারতকে সমর্থন করে। আর আফগানিস্তান, মিশর, ইয়েমেন ও মরোক্কো প্রায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের এই দুর্দিনে তুরস্ক, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদিআরব ও আলবেনিয়া নৈতিক সমর্থন জোগায়। বিদেশী কোনো প্রকার সামরিক সাহায্য এই সময় পাকিস্তান পায়নি। ইরান থেকে তেল ও তুরস্ক থেকে বাণিজ্যের ভিত্তিতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়।[৪৯]

এদিকে ভারতের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা সত্তেও আমেরিকা যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ আমেরিকা ভারত পাকিস্তান উভয়ের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'দেশের মধ্যকার সংঘর্ষ বন্ধে ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান যাতে কোনোক্রমেই চীনের বলয়ে না যায়, এজন্য যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উদ্বেগের কারণেই আইয়ুব খান ও শাস্ত্রীকে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। ২২ সেপ্টেম্বর উভয়পক্ষই এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

চীন কিছুটা পাকিস্তান ঘেষা নীতি অবলম্বন করে। চায়না সিকিম বর্ডার লংঘনের জন্য ভারতকে চীন অভিযুক্ত করে। মুলত জাতিসংঘের প্রচেষ্টাতেই পাক ভারত যুদ্ধ বিরতি (Ceasefire) কার্যকর হয়। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথান্ট যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ নিরাপত্তা পরিষদের ২০১ (১৯৬৫) পাশকৃত রেজুলেশনে দু'সরকারকেই জাতিসংঘ প্রেরিত

৪৮ গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ৫৮।
৪৯ G.W. Choudhury, *ibid,* p. 22.

UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) কে সহায়তা করার কথা বলা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর পাশকৃত ২০১ (১৯৬৫) রেজুলেশনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য সম্ভাব্য সকল ধরণের চেষ্টার কথা বলা হয়। যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে উথান্ট উপমহাদেশ যুদ্ধ বিধ্বস্থ অঞ্চল পরিদর্শন করে ১৬ সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দেন যে উভয় পক্ষই কঠিন কিছু শর্তসাপেক্ষে যুদ্ধ বিরতিতে রাজি। শুধুমাত্র যুদ্ধ বিরতি পাকিস্তান রাজি ছিল না। পাকিস্তানের দাবী হচ্ছে কাশ্মীরে জাতিসংঘের এশীয় আফ্রিকান সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ও তিন মাসের মধ্যে গণভোট অনুষ্ঠান কর। এই দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ঘোষণা করে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৫০] অবশেষে ২২ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে পাশকৃত ২১১ (১৯৬৫) রেজুলেশন মোতাবেক উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। বহিঃবিশ্বের বহু বুদ্ধিজীবী এই যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বার্টান্ড রাসেল, আর্নল্ড টয়েনবি সহ বহু বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেন।[৫১]

৩.৬ পাক -ভারত যুদ্ধ ও ৬ দফা

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাথে ৬ দফার একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে কোন ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তা এ অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানি শাসক ও নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থেকেও সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজীর লিখিত '*দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*' বইতে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে–

> '১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর জুলফিকার আলি ভুট্টো জাতীয় পরিষদে একটি বিবৃতি দেন, যার কারণে চারদিকে একটি হইচই সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানকে চীন রক্ষা করেছে।' এটি কেবল একটি বিবৃতি ছিল না, এই কথাটির একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। বাঙালিদের মনোজগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো। তারা বুঝতে শুরু করল যে, সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশটি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার মতো তেমন সেনা এখানে নেই, কাজেই পাকিস্তানের সাথে একটি ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার বাস্তবিক কোনো সুবিধা থাকে না। এই ধারণাটি অচিরেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। পশ্চিম

৫০ অব্দুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।
৫১ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯।

> পাকিস্তানের নেতারা তাদের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের রাজনৈতিক কৌশলের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারলেন না। বাঙালিরা আগের চেয়ে আরও নিশ্চিত হলেন যে, তাদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে। তবে একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত তাদের এ ধারণা অমূলক ছিল না।'[৫২]

পাকিস্তানের নীতিনির্ধারক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনেকেই নিজেদের সামরিক শক্তিমত্তা নিয়ে মাত্রাতিরক্ত বড়াই করতো। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট গবেষক আকবর আলী খান তাঁর আত্মজীবনী '*পুরানো সেই দিনের কথা*' গ্রন্থে পাকিস্তান বিমান বাহিনী কেন্দ্রের একজন পরিচালকের মন্তব্য তুলে ধরেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী কেন্দ্রের সেই পরিচালক বলেন, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘঠিত হলে পাকিস্তানি বিমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উড়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে বোমা নিক্ষেপ করতে করতে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছাবে। জ্বালানি ও বোমা নিয়ে সেই বিমান ঢাকা থেকে পুনরায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করতে করতে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবে। অতএব ভারত কোন মতেই পূর্ব পাকিস্তনের বিমান বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না।[৫৩] পাকিস্তানের এই কর্মকর্তার এমন মন্তব্যে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

১৯৫২ সালের ভাষাকেন্দ্রিক সমস্যা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলনের পরে ১৯৬৫ সালের এই যুদ্ধ বাঙালিদের চোখ খুলে দেয়। শেখ মুজিব যেমনটা বলেছিলেন-'এই ১৭ দিনের যুদ্ধে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে ইচ্ছা করলে পুরোটাই জয় করে নিতে পারতো।' কাশ্মির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রেখে ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের পুনরায় অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাঙালিদের দাবী-দাওয়া পূরণে পাকিস্তানিদের অনীহা ও যুদ্ধকালীন অনিরাপত্তাজনিত পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে পুঁজি করে শেখ মুজিব তার ৬ দফা ঘোষণা করে। ৬ দফার শেষ দফাটিতে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার জন্য প্যারামেলিশিয়া বাহিনীর কথা বলা হয়।

৬ দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে যশোরে জনসভায় দে্ওয়া বক্তব্যে শেখ মুজিব বলেন, '১৭ দিন যুদ্ধের সময় আয়ুব খাঁর কাছে প্রশ্ন করতে চাই- ১৭ দিন যুদ্ধ চলেছিল পূর্ব পাকিস্তানে আপনি কি আসতে পেরেছিলেন? আপনার C-in-C যিনি ছিলেন তিনি কি আসতে পেরেছিলেন ? টোটা, বন্দুক, বুলেটিন কারখানা আছে এখানে? আপনি এখানে আসতে পেরেছিলেন? দুনিয়া থেকে আমরা আলাদা হয়ে

---

৫২ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এ. এ. কে নিয়াজি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৫৩ আকবর আলী খান, *পুরানো সেই দিনের কথা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৯৫।

গিয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের যাওয়ার জায়গা আছে। পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তান যাওয়া যায়, করাচী থেকে সউদী আরবে যাওয়া যায়। হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাদের রাস্তা ছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলার ৫ কোটি লোকের কোনো রাস্তা ছিল না।'[৫৪]

অত্র আলোচনার শেষ প্রান্তে এস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ১৯৬৫'র পাক ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি হয়। যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তান প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করলে ও ভারতের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তান সে সাফল্য ধরে রাখতে পারেনি। নিজের ভঙ্গুর ইমেজ বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাবার লক্ষ্যে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও আইয়ুবের সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং কাশ্মীরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে ভারত আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় সক্ষম হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টা উপলব্ধি করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থায় চিড় ধরে। এর ফলে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ছয় দফা' প্রস্তাব দিতে দেখা যায় যেখানে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আর ১৯৬৫'র পাক ভারত যুদ্ধের প্রভাব এমন সুদূর প্রসারী হয় যে, পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দোলনে এর একটি স্পষ্ঠ প্রভাব পড়ে। যুদ্ধ পরবর্তীতে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের যেসমস্ত দাবী দাওয়া ছিল সেখানে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালে লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত ৬ দফা ও পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থান উদ্ভুত আন্দোলনের ১১ দফাতে নিরাপত্তার জন্য শাসক শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তান ব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে শতাব্দীর সব থেকে ভয়ংকর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানিতে মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দুর্গত অঞ্চলের মানুষের প্রতি যে আচরণ করা হয় তা ছিল অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত। পাকিস্তান শাসনের শেষ সময়ে এসে এমন বৈরী আচরণ বাঙালির দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হয়। শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে ব্যালটের মাধ্যমে পাকিস্তানের এমন বিমাতাসুলভ আচরণের জবাব দেয়ার ঘোষণা দেয়।

[৫৪] Secret Documents of Intelligence Branch of Father of the Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Volume 10, Hakkani Publishers, Dhaka, 2022, p. 421.

চতুর্থ অধ্যায়

৬ ও ১১ দফা এবং সত্তরের নির্বাচন ও জলোচ্ছ্বাস: নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন

চতুর্থ অধ্যায়

৬ ও ১১ দফা এবং সত্তরের নির্বাচন ও জলোচ্ছ্বাস: নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন

৬ দফাকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিরাপত্তা এখানে অন্যতম ইস্যু ছিল। ১৯৬৫ সালের পাক-ভরত যুদ্ধে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সচেতন অংশ তাদের অরক্ষিত বিষয়টা আরও বেশি বোধগম্য হয়। ১১ দফাতেও শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সামরিক চুক্তি বাতিল, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি, শ্রমিকদের নায্য মজুরীর পাশাপাশি ৬ দফায় উল্লেখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্বসহকারে অনর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ সারের বহুল আকাঙ্খিত নির্বাচনে মোড় পরিবর্তনকারী প্রভাব ফেলে ১২ নভেম্বর ঘটে যাওয়া ঘূর্নিঝড়। ঘূর্নিঝড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা পূর্ব বাংলার মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এ অঞ্চলের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে পাকিস্তান আসলে পাশে থাকবেনা। নিজেদের নিরাপত্তা, নিজেদের স্বাধীকার আদায়ের চেতনা আরও বেশি শক্তিশালী হয় এসময়। শেখ মুজিবুর রহমান যেমনটা বলেছিলেন, ''আমরা এখন নিশ্চিত যে, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে ছয় দফা, এগারো দফার ভিত্তিতে আমাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে হবে। ... বাংলাদেশ আজ জেগেছে। নির্বাচন যদি বানচাল করা না হয়, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমেই মানুষ তাঁর রায় জানিয়ে দেবে। আর নির্বাচন যদি বানচাল হয়, ঝড়ে নিহত দশ লাখ লোকের কাছে ঋণী বাংলাদেশের জনগণ আমরা যাতে মুক্ত জনতা হিসেবে বাঁচতে পারি এবং বাংলাদেশ যাতে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হলে আরও দশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দেবে।[১]

শতাব্দীর সব থেকে ভয়ংকর ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে নির্বাচন একেবারেই বাতিল না হয়ে উপদ্রুত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত আসনগুলোতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়। সত্তরের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয় ক্ষতি হলেও পাকিস্তান সরকার সেটাকে গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পূর্বে মানুষকে সাবধান করার জন্য সতর্কতা সংকেত পর্যন্ত দেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এই বিমাতাসুলভ মনোভাব

১ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

বুঝতে পেরে নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে।

৪.১ ৬ দফার পটভূমি

১৯৪৭ এ দেশভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক নানাদিক থেকে তার নায্য অধিকারবঞ্চিত হচ্ছিল। শুরুতে আঘাতটা এসেছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী এ অঞ্চলের মানুষ যখনই নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন হতে চেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য গঠন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। স্বাধীকার আদায়ের জন্য যেসব দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন এ অঞ্চলের প্রবাদ প্রতিম পুরুষেরা।

পূর্ব বাংলা যে কত ভয়ঙ্করভাবে অরক্ষিত ছিল তাঁর বাস্তব প্রমাণ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান তাঁর পূর্বাংশের নিরাপত্তার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ পূর্ব বাংলার বহু সৈনিক, সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ যুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছে। ১৭ দিন ধরে চলা এ যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের দূতিয়ালিতে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান-ভারত শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে শেষ হয়।[২]

তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিকট পাকিস্তানের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে মর্মে পাকিস্তানে আইয়ুব খান সমালোচনার মুখে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনার জন্য ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি সম্মেলন আহবান করেন। বঙ্গবন্ধুকে এ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আহবান জানিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিব এ সম্মেলনে যোগ দেবার ব্যাপারে শুরুতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কয়েকজনকে লাহোরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। দৈনিক ইত্তেফাক এর সম্পাদক মানিক মিয়ার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, মুজিবুর মিয়া, যদি যেতেই হয় আপনিই যান। আর আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে, সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক বা না শুনুক এতে কাজ হবে।[৩]

---

২ মহিউদ্দিন আহমেদ, *আওয়ামীলীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩২।
৩ মাজহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৩।

বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তার জন্য তৎকালীন বাঙ্গালি সিএসপি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুসকে একটা আলোচ্যসূচির জন্য বলেন। রুহুল কুদ্দুস ৭ দফা কর্মসূচির একটা ড্রাফট ঠিক করে দেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদের সহযোগিতায় সেটা পরিবর্ধন করে ৬ দফায় নিয়ে আসা হয়।[৪] অবশেষে মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরীসহ ১০ সদস্যের আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে।[৫] ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মাদ আফজালের সভাপতিত্বে চৌধুরী মোহাম্মাদ আলীর বাসায় সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। উপস্থিত অন্য সবার আপত্তির মুখে শেখ মুজিবের উত্থাপিত প্রস্তাব কার্যসূচিতে রাখা না হলে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি সম্মেলন থেকে ওয়াক আউট করেন। পরবর্তীতে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর ৬ দফা তুলে ধরেন।[৬]

৪.২ ৬ দফার দফাসমূহ

সংক্ষেপে ছয়দফার দফাগুলো ছিল নিম্নরুপ[৭]

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে যেকোনো একটি গ্রহণের কথা বলা হয়।

ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবেনা, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

---

৪ Karim, *S,A, Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*. UPL, Dhaka, 2009, p.38.

৫ সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *শেখ মুজিবুর রহমান*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ . ১৮৯।

৬ Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest For Freedom and Justice*, UPL, Dhaka, p. 17-18.

৭ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৭৩।

খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু, এ ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটা পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর, ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবেনা। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্দিষ্ট অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেশন সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়ঃ

১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে আদায় হইবে।

৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

৫) ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

৪.৩ ৬ দফায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যু

৬ দফার ৬ নম্বর দফাতেই মূলত নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রসঙ্গ এসেছে। এ দফাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করেছেন। লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬ দফা বিষয়ে ব্যাখ্যায় বলেন,

"সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটা মূখ্য হইয়া দেখা দিয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া চিত্রিত করা উচিৎ নয়। ... সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অকৃত্তিম ভালবাসায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার ব্যাপারে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী দেশ রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে থাকে। ... দেশ রক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইলে জাতি তাহাদের মাতৃভূমির সংহতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত যেকোনো হামলা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে। স্বায়ত্তশাসন জাতি ও সংহতির কোনও ক্ষতি তো করিবেইনা বরং পাকিস্তানকে আরও বেশি শক্তিশালী করিবে।"[৮]

১৯৬৬ সালের ১৮-২০ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ৬ দফার ৬ নং দফার বিশ্লেষণে বলা হয় যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে আছে'– এমন অবিবেচক কথা পশ্চিমের শাসকদের মুখে বেমানান। কারণ মাত্র ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই প্রমাণ করেছিল যে, এই পূর্ব অঞ্চলের মানুষ কত অসহায়। শত্রু পক্ষের সহানুভূতি ও দয়ার উপর একটা অঞ্চল টিকে থাকতে পারেনা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতিই আমাদেরকে সেভাবে থাকতে বাধ্য করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের উদ্বেগ নতুন নয় উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবীতেও নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিয়ে আমরা দাবী জানিয়েছিলাম। আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা, পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন, অস্ত্র কারখানা স্থাপন- প্রভৃতি ছিল ২১ দফার অন্যতম দাবী। সেই দাবী বাস্তবায়ন করা দূরের কথা তার পরিবর্তে সরকার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্ত ই.পি.আর বাহিনীকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। উপস্থিত কাউন্সিলরদের লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে মেজরিটি পাকিস্তানীর বসবাস সেহেতু এর নিরাপত্তা বিধানও কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনে কেন দাবী জানাতে হবে? এই দফার ব্যাখ্যায় শেখ মুজিব আরও দাবী করেন, ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংহতির লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত দেশ রক্ষা বাহিনী গঠন করা হোক। এ অঞ্চলে অস্ত্র কারখানা নির্মাণের পাশাপাশি নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্বাঞ্চলে স্থাপন করা

৮ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।

হোক। কাউন্সিলে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই- বোনদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বর্তমানে মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা দেশরক্ষা খাতে আর ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। সব মিলিয়ে শতকরা ৯৪ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়। পাকিস্তানের দেশরক্ষার প্রধান যে তিন দপ্তর সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানে থাকলে এই শতকরা ৯৪ টাকা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হত। আপনারা তখন আমাদের এমন মত এমন দাবী তুলতেন। আমাদের মত ১৮ বছর বসে না থেকে আপনারা আগেই এই দাবী উত্থাপন করতেন। [৯]

১ ডিসেম্বর, ১৯৭০ নির্বাচনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের বিষয়ে তিনি বলেন,

'আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সাথে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় কেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম'।[১০]

৪.৪। ১১ দফাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে যত আন্দোলন হয় সকল আন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরবর্তীতে সৃষ্ট গণঅভ্যুত্থানেও ছাত্ররাও তাদের সাহসী ভূমিকা অব্যাহত রাখে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গঠন করে। চলমান পরিস্থিতিতে এই সংগঠন তাদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১১ দফা দাবীনামা পেশ করে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলঃ সর্বত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, নারী শিক্ষার প্রসার, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ছয় দফার বাস্তবায়ন, কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স মওকুফ, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জরুরী আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি অন্যতম।

---

৯ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৭-২৭৩।

১০ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৮।

১১ দফার দফা সমূহ:[১১]

এগারো দফা দাবি (সংক্ষিপ্ত সার)

১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

২.প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা- এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারের রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহি:বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

---

১১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও হতশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তন মূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১১ দফাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রসঙ্গের আলোচনা এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পূর্ব আঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন, দ্বিপাক্ষিক,

বহুপাক্ষিক সামরিক চুক্তি-সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১১ দফার মত 'জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি' শীর্ষক ন্যাপের ১৪ দফাতেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবী উত্থাপিত হয়। ১৪ দফার ৪, ৫, ৭ ও ১৩ নম্বর দফাতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আলোচনা উঠে এসেছে। ৪ নং দফায় যেমন পাকিস্তানকে সিয়াটো- সেন্টোর সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবী করা হয়েছে, তেমনি সকল মার্কিন ঘাটির অবলুপ্তির পাশাপাশি নতুন করে এই ধরনের চুক্তিতে না জড়ানোর দাবী করা হয় এই দফায়। ৫ নম্বর দফাতে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পুনর্গঠন পূর্বক পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের দাবী করা হয়েছে। ৭ নং দফাতে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে সরকারি খাতে ন্যস্ত করে তা দেশের উভয়াংশে স্থাপনে দাবী করা হয়েছে।

১৩ নং দফাতে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়।৭ ৬ দফা ও ১১ দফার মত ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাতেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভাবনা উঠে এসেছে। যেমন, ২১ দফার ১৯ নং দফায় উঠে এসেছে: ''লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় পূর্ব বঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে। পাশাপাশি দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।[১২] বন্যা পূর্ববঙ্গের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে খনন ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গ রক্ষা পেতে পারে। বন্যা দুর্ভিক্ষ বিষয়ে ২১ দফার ৭ দফাতে বলা হয়েছেঃ 'খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।'[১৩]

৪.৫ সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা:

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাতে আঘাত হানে শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। ইংরেজি ১২ নভেম্বর, ১৯৭০,

১২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।
১৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

বাংলা ২৬ কার্তিক, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে বৃহস্পতিবার রাতে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি।[১৪] ঘূর্ণিঝড়টি ৮ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে তা উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। ১২ নভেম্বর রাতে ঘন্টায় ক্ষেত্র বিশেষ ১৫০ মাইল বেগে উপকূলীয় ৫ টি জেলা- বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি ২০-৩০ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হয়। ঘূর্ণিঝড়টি রাতে সংঘটিত হওয়ায় এবং পূর্ব থেকে কোনো ধরনের সতর্কতা সংকেত না থাকায় ঘুমন্ত মানুষ জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে চলে যায়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দুর্গত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটায় ক্ষয়-ক্ষতির তাৎক্ষনিক কোনো হিসাব পাওয়া যায়না। প্রথম দিকে যেসব মিডিয়া ক্ষয়-ক্ষতির ও মৃত্যুর যে তথ্য প্রকাশ করে যতদিন গড়াতে থাকে তত সেটার পরিমাণ বাড়তে থাকে। তখনকার পত্রিকাগুলোর ধারাবাহিক প্রতিবেদন দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমন, ১৫ নভেম্বর দৈনিক আজাদের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যদিকে সরকারি হিসেবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১১,১৩৬ জন।[১৫] দৈনিক ইত্তেফাকের ১৪ নভেম্বরের খবরে ৮০০ মৃতদেহ উদ্ধার করার কথা জানা যায়।[১৬] সরকারি হিসেবে ১৬ নভেম্বর ১৬ হাজার জন নিহত হবার খবর প্রকাশ করে।[১৭] ১৬ নভেম্বর দৈনিক আজাদ খবর প্রকাশ করে যে, ঘূর্ণিঝড়ে তিন লক্ষ লোক নিহত হয়েছে।[১৮] প্রাদেশিক রিলিফ কমিশনার এ এম আনিসুজ্জামান জানান যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩ হাজার। তাঁর দেওয়া তথ্যে আরও জানা যায় যে, ঘূর্ণিঝড়ে ২৩৩৮ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৫ টি জেলার ১৭ টি থানার ১৬৪ টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে ২৩ হাজার। আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বাড়ির সংখ্যা ১ লক্ষ ১৭ হাজার। ক্ষতির শিকার হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টি। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।[১৯]

এনার খবরে বলা হয় যে, ৫০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ঘরবাড়ি বিধ্বস্থ হয়েছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার, গৃহ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ১ লক্ষ, গৃহহীন হয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ, জমির ফসল নষ্ট হয়েছে ৫ লক্ষ একর।

---

১৪ দৈনিক আজাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
১৫ দৈনিক আজাদ, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
১৬ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭০।
১৭ দৈনিক সংবাদ, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
১৮ দৈনিক আজাদ, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।
১৯ দৈনিক আজাদ ও দৈনিক সংবাদ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

সরকারি হিসেবে এ সময় ৩৭ কোটি টাকা এবং বেসরকারি হিসেবে ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বঙ্গোপসাগরে ৬২ টি মালবাহী নৌকা ডুবে যায়, যেসব নৌকায় ৭০০ লোক ছিল। [২০] দৈনিক আজাদ ১৯৭০ সালের ১৮ নভেম্বর বক্স করে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে। যেখানে দেখানো হয় যে,[২১]

নিহত	-প্রায় ২ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
	-৩৩ হাজার (সরকারি হিসাব)
	-১ লক্ষ (এপিপি সংবাদ)
নিখোঁজ	-প্রায় ১ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা	-২২ হাজার ৩৩ হাজার
ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	-২৩৩৮ বর্গমাইল
ঘরবাড়ি বিনষ্ট	-২৪ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
	৩ লক্ষ ৩৫ হাজার (সরকারি হিসাব)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রদত্ত এক হিসেবে দেখা যায় যে, নিহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার, নিখোঁজ আনুমানিক ৩ লক্ষ, এছাড়া প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাড়ি, ফসল ও গবাদী পশু নষ্ট হয়েছে। (দৈনিক আজাদ, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০) ২৫ নভেম্বর সরকারি হিসেবে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯০ জনের নিহত হবার খবর প্রচার করা হয়।[২২]

উপরিউক্ত সংবাদ পত্রের বিভিন্ন সময়ের প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায়, যত দিন গড়ায় তত মৃত্যু ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর রাতে ঘটে যাওয়া প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কত মানুষ মারা যায় তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়না। এই ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২২৪ কিলোমিটার। এই ঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১০-৩৩ ফুট। আমেরিকার ত্রান সংস্থাগুলোর ধারণা, এই ঘূর্ণিঝড়ে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ মারা গেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র সংস্থার হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ।[২৩] বিবিসি বাংলার হিসেবে ৫ লাখ মানুষ নিহত হয়। জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যায় জলোচ্ছ্বাস পরবর্তীতে যারা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন তাদের জবানীতে। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শন শেষে এর ভয়াবহতা আঁচ করা যায় বঙ্গবন্ধুর জবানীতে: 'পটুয়াখালী, ভোলা ও

২০ দৈনিক সংবাদ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
২১ দৈনিক আজাদ, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭০।
২২ দৈনিক সংবাদ, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০।
২৩ মহিউদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

নোয়াখালির অনেক স্থানেই মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশি রক্ষা পায়নি, বেঁচে যারা আছেন তারাও সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আহতদের ক্ষত স্থানগুলোতে পচন ধরেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা নিরুপনের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টা চালানো হয়নি। ... তথাকথিত দুর্গম এলাকায় রিলিফ দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য সরকার বিশেষ কোনো চেষ্টায় করেননি।'[২৪]

তবে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে মৃত্যু যেমন হয়েছে, তেমনি ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে পর্যাপ্ত রিলিফ দ্রব্যের অভাবে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশি। পত্রিকা মারফত এমন খবরও পাওয়া যায় যে, ঘূর্ণিঝড় আঘাতের এক-দুই সপ্তাহ পরে ত্রাণ সামগ্রী ও ঔষধপত্র যখন দুর্গত এলাকায় পৌঁছায় তখন কোথাও কোথাও তা গ্রহণ করার মতও লোক অবশিষ্ট ছিলনা।[২৫] ফরাসী পত্রিকা *লা ফিগারোর* সাংবাদিক হিউগ্যাট দ্যা বাইসী ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক বলেন, 'এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসলীলা ভয়াবহতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে পেরুর ভূমিকম্পের চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক ও মর্মান্তিক। আমি উপকূলে মাইলে পর মাইলে দেখেছি। বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালী, নোয়াখালী জেলার উপকূলবর্তী দ্বীপ ও উপকূল এলাকার অধিকাংশ গ্রামে জনবসতির চিহ্ন নেই। সাগর ও নদীতে কচুরীপানার মত লাশ ভাসছে। বহু লাশ ও পশুর মৃতদেহ চরে উঠে আছে। পচা ফুলো মানুষের লাশ আর পশুর মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সর্বত্র। আকাশ-বাতাস দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত।'[২৬]

মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর আহসানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে, ঘরে ঘরে হিসাব করে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয় করা জটিল। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, দুর্গত অঞ্চলে ঘর বাড়ির কোনো নিশানা নাই। মৃতের সংখ্যা যে কত বেশি ছিল তা গভর্নরের এ বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়। জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা বোঝা যায় দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত পল্টনে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যেঃ "বাঙালি জীবনে আজ এক বেদনার দিন। আমাদের জীবনে মহা দুর্ভোগ নেমে এসেছে। খোলা আকাশের নিচে আমাদের মা- বোন উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। বিরান বিধ্বস্ত জনপদে কোথাও আশ্রয় নেই। শীতের দিনে ধনী-গরীব কারোরই মাথা গোঁজার উপযোগী ঠাঁই নেই।"[২৭] ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে মৃত্যুর সংখ্যার তুলনায় পরের মৃত্যু সংখ্যাও কম নয়। পত্রিকান্তরে জানা যায়,

---

২৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
২৫ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।
২৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭০।
২৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।

ঝড়ের এক/দুই সপ্তাহ পরে যখন ত্রাণ ও ঔষধ সামগ্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তখন তা গ্রহণ করার জন্য কেউ বেঁচে ছিলনা।[২৮]

জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে খুলনার ১০০ মাইল দক্ষিণে এম ভি মহাজগৎ মিত্র নামে ভারতীয় একটি জাহাজ ডুবে যায়। [২৯] দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সাংবাদিক ভূইয়া ইকবাল 'ভোলায় যা দেখেছি' -

> এই শিরোনামে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে দূর্গত এলাকা থেকে যে প্রতিবেদন পাঠান তাতে তিনি বলেন যে, বৃহস্পতিবার রাতে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের পানি ১৮ ফুট উচু ওয়াপদা বেড়ির আরও ৪-৫ ফুট উপর দিয়ে গেছে। এই এলাকায় সুপারি গাছে প্রায় ২৫ ফুট পর্যন্ত লবণাক্ত পানির দাগ দেখেছি। বেড়ির বাইরের ৯০ ভাগ লোক নিহত বা নিখোজ হয়েছে। ভোলা মহকুমার উপকূলবর্তী এলাকায় শতকরা একশ ভাগ ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমন ফসল সম্পূর্ণরুপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, গবাদী পশু শতকরা একশ ভাগ মরে গেছে। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় নলকূপগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে খাবার পানি নেই। ঘর বাড়ী ভিটের মাটি সহ নিশ্চিহ্ন। সর্বত্র মৃতদেহ রোববার বিকেল পর্যন্ত পচে গলে ফুলে নদী তীরে বাধের উপর, খালে, নদীতে পুকুরে ভাসছে। সমগ্র এলাকা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। মৃত মানুষ ও পশুর দেহ পাশাপাশি পড়ে রয়েছে। চকি ঘাটায় আমরা একজন লোক ও একটি সাপের দেহ জড়াজড়ি করে মৃত অবস্থায় দেখেছি। দৌলত খার খালে শিশুর মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখেছি। মেদুয়ায় পড়ে দুটি শিশুর দেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেছি। চকি ঘাটায় অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। স্থানীয় জীবিত লোকজনেরা শনি বার গভীর রাত পর্যন্ত মাটিতে পুতে ফেলেও কূল পাচ্ছে না। দাফন কবর অকল্পনীয় ব্যাপার হয়ে গেছে। অসংখ্য মৃতদেহ খেজুর গাছ ও মাদার গাছে ঝুলে থাকতে দেখা গেছে শনিবার পর্যন্ত। ওয়াপদার বাধের উপর মাছ ধরার ৩টি লঞ্চ ও প্রায় শ'খানের জেলে নৌকা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আমনী বাজারে কয়েকশ জেলে নৌকা মাঝিসহ নিখোঁজ। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের চতুর্থ দিনেও কোন সাহায্য দ্রব্য পৌঁছেনি। [৩০]

ভোলার দৌলতখানে সন্তান প্রসবরত অবস্থায় এক মহিলা মৃত্যুবরণ করে। দূর্গত এলাকায় সফররত দৈনিক পাকিস্তানের এক সাংবাদিককে ভোলার দৌলতখানের এক ছেলে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়- 'আপনারা সব বেল্লিকের দল। এহন আপনারা কি আরতে আইছেন, আপনারা সব বেল্লিকের দল, আপনারা সব কয়ডা বেল্লিক, বাড়িতে আমাগো ট্রানজিষ্টর নাই? এর ঠিক ঠিক খবর দিলেন না কেন? বারবার খবর দিলেন না কেন? কয় নাম্বার সিগন্যাল হেইডা বলেন না কেন? আপনারা কিয়ের রেডিও পাকিস্তান? সরকারি খবর

---

২৮ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।

[২৯] দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭০।

[৩০] ঐ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

জানেন না, নাকি জাইন্যা, শুইন্যাও দেন নাই? বেসরকারি একটা হিসাবে দেখা যায় ভোলার ৮৪% লোক জলোচ্ছ্বাসের পানিতে ভেসে গেছে। [৩১]

৪.৬। জলোচ্ছ্বাস ও নিরাপত্তা সংকটঃ

স্মরণকালের মধ্যে সব থেকে ভয়াবহ এই ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার ভঙ্গুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এ অঞ্চলের মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুর্যোগের যে তিনটি স্তর থাকে- দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী- এই তিনটি স্তরের কোনোটাতেই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোন সংঘটিত হবার পূর্বে যে সতর্ক সংকেত দেবার নিয়ম সেক্ষেত্রেও সেটা অনুসরণ করা হয়নি। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে রাষ্ট্রীয় বেতার, টেলিভিশন ও আবহাওয়া কেন্দ্র জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের খবর তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেনি। আসলে পাকিস্তানের আবহাওয়া দপ্তর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ঝড় আসার আগে সতর্কতা সংকেত হিসেবে বিপদ সংকেত নাম্বার উল্লেখ না করায়, উপকূলীয় জেলা ও দ্বীপসমূহের অধিবাসীদের মনে একধরনের ধুম্রজাল তৈরী হয়।[৩২]

সংকেত উল্লেখ না করার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া দপ্তরে একজন নতুন কর্মকর্তা যোগ দেন, যিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মরু অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি নতুন নির্দেশনামা জারি করেন যে, আবহাওয়ার সংবাদ রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তাঁর চিন্তা ছিল যে, আবহাওয়া সংকেত শুধুমাত্র নদীবন্দর ও সমুদ্র কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজন। জনসাধারণের জন্য এর প্রয়োজন নেই। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পূর্বের রাতে কোনো ধরণের সতর্কতা সংকেত না পেয়ে উপকূলীয় জনগণ ঘুমিয়ে পড়ে। সাইক্লোন মধ্যরাতে অতিক্রান্ত হওয়ায় ঘুমন্ত মানুষ আত্মরক্ষার সুযোগটুকু পর্যন্ত পায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জলোচ্ছ্বাসে স্রোতে ভেসে যায়।[৩৩] পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলেও দুর্গত এলাকার বাইরের মানুষ, এমনকি সারা পৃথিবী এ খবর অনেক দেরীতে জানতে পারে। ১১ নভেম্বর রাতে ঝড়টি আঘাত হানলেও সারা বিশ্ববাসী জানতে পারে ১৪ নভেম্বর। জলোচ্ছ্বাসের বানের স্রোতে যারা ভেসে গিয়েও মৃত্যুর সাথে লড়ছিল, উদ্ধার তৎপরতা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষধের অভাবে তারা মৃত্যু বরণ করে।[৩৪] তিন দিন পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয় যে, ২ লক্ষ মানুষ এতে নিহত

---

৩১ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ নভেম্বর, ১৯৭০।
৩২ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
৩৩ মোহাম্মাদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলিকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৪, পৃ. ২০৩-২০৪।
৩৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০।

হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০ লাখে। এমনকি কোনো কোনো সোর্সে তা ১৫ লাখে গিয়ে ঠেকে।[৩৫] ১১ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে পিপিআই এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- আবহাওয়া অফিস থেকে বিপদ সংকেত এর নাম্বার উল্লেখ না করায় সাধারণ মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে পারে নি। এদিন ঘন্টায় ৩৫ মাইল বেগে দমকা বাতাস ও কয়েক দফা বৃষ্টিপাত হয়। [৩৬]

বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, 'সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কে পূর্বাভাস ও হুঁশিয়ার সংকেত প্রদান, জনসাধারনের মধ্যে সেগুলোর যথাযথ প্রচারের ও তাদের মধ্যে আত্মরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিলে মরণ ছোবল থেকে প্রদেশের উপকূলীয় এলাকার লাখো মানুষকে রক্ষা করা যেত।'[৩৭] বিশেষজ্ঞ তথ্যে প্রকাশ- ১৭৮০ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ১৩টি বড় রকমের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। প্রতিটি জলোচ্ছ্বাসে ৩০-৪০ ফুট উচু পানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭০ এর ঝড়ে পানির উচ্চতা ২১ ফুটের বেশি হয়।

দুর্যোগ সংঘটিত হবার পরে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে ঝড়ের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রচার না করে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রচার করা হয়। দৈনিক আজাদ পত্রিকা নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে 'রোম যখন পোড়ে' শিরোনামের খবর থেকে সেটা বোঝা যায়।

> ''বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা যখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছে, কলহাস্যে মুখরিত জনপদ যখন শ্মশানের রূপ ধারণ করিয়াছে, অগণিত মানুষের আহাজারিতে যখন আকাশ বাতাস মুখরিত, তখন এই দেশেরই জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনে উক্ত মহা প্রলয়কান্ডের খবর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসহকারে প্রচার এবং ফূর্তির প্রোগ্রাম শুনিয়া কুষ্টিয়ার সর্বশ্রেণির মানুষ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক প্রভৃতি বেদনা বিস্ময়ে অবাক হইয়া পড়িয়াছেন। স্থানীয় জনমনে একটি প্রশ্নই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেশের বেতার ও টিভি কাহাদের জন্য?[৩৮]

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পরে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বশীল কেউ দেখতে পর্যন্ত আসেনি। যদিও পিকিং থেকে ফেরার পথে ইয়াহিয়া খান হেলিকপ্টারে

---

৩৫ মোহাম্মাদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪।
৩৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ নভেম্বর, ১৯৭০।
৩৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ নভেম্বর ১৯৭০।
৩৮ দৈনিক আজাদ, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০।

চড়ে নামমাত্র দুর্গত এলাকা সফর করেন। উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে এসে জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী নিরাপত্তা সংকট নিয়ে শেখ মুজিবের ভাষ্যঃ

> ''ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পরেও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কাছে এককণা রিলিফও পৌঁছেনি। উপদ্রুত জনগণ গাছের শিকড় খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপক আকারে আমাশয় দেখা দিয়েছে। এবং মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে।[৩৯] বঙ্গবন্ধু আক্ষেপ করে বলেনঃ ''বিশ্বের যে সমস্ত দেশ বিপদের দিনে দুর্গত মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার থাকা সত্ত্বেও রিলিফ কাজের জন্য আমাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।''[৪০]

প্রদেশে মাত্র একটা হেলিকপ্টার ছিল। এই হেলিকপ্টার উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকার্তাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সে সময় ৫৯ টি হেলিকপ্টার বসে ছিল।[৪১]দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে এসে অনিরাপত্তার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু আরও কঠিনভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যেমনটা বলেছিলেনঃ

> ''বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যক্তি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান দুর্গত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করলেও এ অঞ্চলের জনগণের রক্ত শোষণ করে ধনী হওয়া ২২ পরিবারের কেউ উল্লেখযোগ্য সাহায্য দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের বস্ত্র মিলগুলো বাংলাদেশকে তাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলেও নিহতদের জন্য এক গজ কাফনের কাপড়ও তারা দেয়নি।''[৪২]

নিরাপত্তা বা সামান্য সহানুভূতিও যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার দিতে দ্বিধা করছে বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নবিদ্ধ তর্জনী তখন একে একে জিজ্ঞাসা করে ফিরেছেঃ

> ''এ জন্যই কি গত দু'দশক ধরে আমাদের সম্পদের ৭২ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করেছি? এজন্যই কি আমাদের বাজেটের শতকরা ৬০ শতাংশ আমরা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করেছি। আর এ জন্যই কি বাংলাদেশের পাট চাষীদের অনাহারের বিনিময়ে করাচী ও লায়লপুরে পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধি অর্জন হয়েছে? স্বাধীনতার পর থেকেই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সাথে সংগ্রাম করে

---

৩৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

৪০ মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, *বাংলা* একাডেমী, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩৯১।

৪১ Karim, S.A, Ibid, p.38.

৪২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। স্বাধীনতার ২৩ বছর হয়ে গেলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রণীত হয়নি।"[৪৩]

ন্যাপের ওয়ালীখান ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কে বলেন-

'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনি একাই পূর্ব বাংলার দুর্গত এলাকা সফর করছেন। সেখানকার অন্য কোন রাজনৈতিক নেতা এখানে আসেনি। তবে তাদের আসা উচিত ছিল।' তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন- 'উপকূলীয় এলাকায় কোথাও কোথাও তিনি মানুষ, গাছ ও ঘরবাড়ি পর্যন্ত দেখেননি।' রিলিফ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- 'বিদেশীদের দেওয়া রিলিফ চুরি হচ্ছে বলে তিনি শুনেছেন। যেটা মানুষের জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয়।' সরকার যোগ্যতার পরিচয় দেয়নি বলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- 'হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে সরকার যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের কপ্টারের কোন কাজ আছে? এহেন দূর্যোগে এসব হেলিকপ্টার না পাঠিয়ে কি জন্য এসব রাখা হয়েছে। এরকম দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য যা করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- পাকা বাড়ি নির্মাণ করা, কারণ পাকা বাড়িগুলো ভাল ছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট নির্মান হয়নি। তাহলে তথা কথিত 'উন্নয়ন দশক' এ কি কাজ হয়েছে তা তিনি জানতে চান।[৪৪]

১৯৭০ সালে ঘটে যাওয়া শতাব্দীর সেরা প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংকট পরিলক্ষিত হয়। ঝড়ের আগেও যেমন সতর্ক সংকেত থেকে শুরু করে কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি; তেমনি ঝড়ের পরেও উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে শুরু করে উল্লেখ করার মত কোনো ধরনের উদ্যোগই পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করেনি।

৪.৭। জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা

১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানলেও দেশবাসী অনেক পরে জানতে পারে। ঝড়ের ২ দিন পরে বিবিসির খবরে বলা হয় যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত হয়েছে ৫০ হাজার মানুষ। পরবর্তীতে জানা যায় যে, এই নিহতের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। ভাসানী এ সময় জ্বর-কাশি ও সর্দিতে আক্রান্ত হয়ে ধানমন্ডির একটি নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলেন। বিবিসিতে ঝড়ে ৫০ হাজার মানুষের নিহত

৪৩ মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১।
৪৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭০।

হওয়ার খবর শুনে তিনি শয্যা থেকে দ্রুত উঠে চট্টগ্রামের ঘূর্ণিঝড় কবলিত অঞ্চলে যেতে চাইলেন। উনার চিকিৎসক ডাঃ ফজলে রাব্বী সহ অন্যান্যরা নিষেধ করলে তিনি বললেনঃ আমার জীবনের গ্যারান্টি দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তোমাদের কথা আমি শুনব না। আমাকে যেতেই হবে ভোলা-সন্দীপ।[৪৫]

ঢাকা থেকে ভাসানী চট্টগ্রামে পৌঁছান ১৬ নভেম্বর। এপিপির সংবাদে বলা হয়- নির্দিষ্ট সময়ে ভাসানী ঢাকা থেকে হাতিয়া রওনা হতে পারেন নি। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের শিপিং কর্পোরেশনের একটি জাহাজে আটকা পড়েন। যে কারণে ভাসানী খুব বিরক্ত বোধ করেন। জাহাজ আটকা রাখার বিরুদ্ধে তিনি প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক গভর্নর ও সামরিক শাসনকর্তার কাছে তারবার্তা পাঠান। তাদের কাছ থেকে উত্তর না এলে আমরণ অনশনের হুমকি দেন। তিন ঘন্টা পর জাহাজ ছাড়ে। কিন্তু ১৪ মাইল যাওয়ার পরে যান্ত্রিক গোলযোগের অযুহাতে পতেঙ্গার নিকট জাহাজ নোঙ্গর করে। ভাসানী ছাড়াও জাহাজে ফ্রান্সের টেলিভিশনের ৩ জন সাংবাদিক, জাপানি ও এশীয় টেলিভিশনের একটি প্রতিনিধি দল ছিল।[৪৬] রোযা রেখে তিনি চট্টগ্রাম থেকে জলযানযোগে হাতিয়াতে পৌঁছান ১৬ নভেম্বর, রামগতিতে ১৯ নভেম্বর, ভোলাতে ২০ নভেম্বর এবং বরিশালে ২১ নভেম্বর। দুর্গত স্থানে পৌঁছানোর পরে তিনি ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্থ অঞ্চলগুলো পরিদর্শনে বের হন। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায় চড়ে তিনি উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেন। মানুষ, গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণির মৃতদেহ দেখে ভাসানী অশ্রু সংরবণ করতে পারেননি। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ভাসানী বলেন, ''বাঙালির জীবনে আজ মহা দুঃখের দিন। আমাদের জীবনে নেমে এসেছে মহাদুর্যোগ। বিধ্বস্ত বিরান উন্মুক্ত আকাশের নিচে আমাদের অগণিত মা বোন উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। বিরান জনপদে কোথাও কোনো ঠাঁই নেই। এই শীতের দিনে ধনী-গরীব কারও মাথা গোজার ঘর নেই।''[৪৭]

তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে মওলানা ভাসানী বলেন, ''হযরত নুহের জামানার পর এতোবড় প্রলয়কান্ড মানুষের ইতিহাসে ঘটে নাই। পূর্ব বাংলার উপকূলের ১০ থেকে ১২ লক্ষ নরনারী ও শিশু এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের ১০ দিন পরেও প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের লাশ পড়ে আছে। এদের দাফনের

৪৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫।
৪৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
৪৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।

কোনো ব্যবস্থা নাই। গলিত লাশ ও মরা পশুর দুর্গন্ধের মধ্যে যারা এখনো আর্তনাদ করছে আল্লাহর কুদরতেই তারা বেঁচে আছে বলে ভাসানি মত দেন।''[৪৮]

বিভীষিকাময় সেই পরিস্থিতির বর্ণনায় ভাসানি বলেন, ''বিরান এলাকায় শুধু লাশ আর গলিত গলিত গবাদি পশুর অসহনীয় দুর্গন্ধ। কোথাও শুধু মানুষ নয়, কাক, চিল, ঘুঘুও দেখা যায় নাই। একটি গ্রামের ছয় হাজার মানুষ ও ধান কাটার গোলযোগে শান্তি রক্ষার জন্য প্রেরিত ৬ জন পুলিশের মধ্যে মাত্র একজন পুলিশ কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।''[৪৯]

সরকারের উদাসীনতা ও অনীহার তীব্র কটাক্ষ করে ভাসানী বলেন, "আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোনদের মৃত্যু সংবাদ রেডিও পাকিস্তান ও সরকার আমাদের জানায়নি। আট হাজার মাইল দূর থেকে বিবিসি মারফত আমরা এই দুঃসহ সংবাদ জানতে পেরেছি। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী শিল্পীরা এগিয়ে আসলেও আমাদের ইসলামাবাদের সরকার দুর্গত বাঙালির সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ''বাঙালির দুঃখের দিনে সরকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। অথচ কথায় কথায় জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। এই সব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোগাস।''[৫০]

বক্তব্যের এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী (স্বাধীন) 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিলে উপস্থিত জনসভা থেকে তাঁর তুমুল প্রতিধ্বনি ওঠে। মওলানা ভাসানী বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবী করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথেই জনগণ হাত উঠিয়ে প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নির্মমতার বিষয়টি উল্লেখ করে ভাসানী বলেন যে, ''বাঙালি মন্ত্রীরা এমন হতে পারে তা আমরা কোনোদিনও কল্পনাও করিনি। তিনি তাদেরকে ইসলামাবাদে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং পূর্ব বাংলায় আসলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে জানিয়ে দেন। কেননা বাঙালি দুঃখের দিনে তারা কেউ এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে মওলানা ভাসানী মন্তব্য করেন।'' রিলিফ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে ভাসানী বলেন যে, ''আইয়ুবী আমলের মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা রিলিফ বণ্টন করা হচ্ছে। কালো দশকে এরাই দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এরা রিলিফদ্রব্য দুর্গত জনসাধরণের কাছে পৌঁছাবেনা বলে মওলানা ভাসানী মন্তব্য করেন।''

---

৪৮ *ঐ*, পৃ. ৩৫৭
৪৯ *ঐ*. পৃ. ৩৫৭
৫০ *ঐ*, পৃ. ৩৫৭

আন্দোলনের ডাক দিয়ে ভাসানী বলেন, ''দুর্গত মানুষের বাঁচার দাবী নিয়ে আমরা সংগ্রাম করবো, ঘেরাও আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আপনারা কি এই আন্দোলন সমর্থন করবেন?'' সমবেত জনতা সমস্বরে হাত তুলে তাঁর প্রতি সমর্থন জানায়।[৫১]

এই পর্যায়ে জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো শ্লোগান উঠলে মওলানা ভাসানী বলেন, ''আমরা গভর্নর হাউস জ্বালাবো না। আদমজী ইস্পাহানির মিল কারখানা পোড়াবো না। কারণ, এগুলো জনগণের সম্পদ। আমরা আল্লাহর নামে এই সব সম্পদ জাতীয়করণ করবো।'' ... পূর্ব বাংলার ১২ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে সেখানে আমরা গোলাগুলি বেয়নেটকে ভয় করবনা। পাকিস্তানের জন্য, দেশের সংহতির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করেছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা সরকারের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েছি। আমাদের দুঃখের দিনে একমাত্র ওয়ালী খান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নেতা এখানে আনেন নি।[৫২]সভা শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা গভর্নর হাউস, জিন্নাহ এভিনিউ সহ কতিপয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৫৩] ১৯৭০ সালের এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ভাসানীর জীবনে যে কত গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল সেটি স্পষ্ট হয় নিচের ঘটনা থেকে। রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা নিয়ে ভাসানীকে বিভিন্ন সময়ে দেশি-বিদেশী সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করতেন। ভাসানী সে সময় এসব প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারলেও ১২ নভেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞের পরে তার উত্তর দিয়েছেন।

ভাসানীর জবানীতে:

> আজ আমার কত দুর্ভাগ্য– ''পনেরো লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমি অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের একটি প্রশ্নে জবাব পাইয়াছি।'' সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে ভাসানী বলেন যে, '' নোট করিয়া নাও, পনেরো লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমার শুধু রাজনৈতিক জীবনের নয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত সকল প্রশ্নের সমাধান মিলিয়াছে। খুব সংক্ষেপে যদি এই সমাধানের স্বরূপ পেশ করি তবে যাহা দাঁড়াইবে তাহা হইল– আদর্শের চেয়ে মানুষ বড়।''[৫৪]

জ্ঞান সাধক ও প্রাচ্যের বিদগ্ধ তাপস মওলানা রুমী ও রুশ সাহিত্যিক টলস্টয় প্রমুখের মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে উল্লেখ পূর্বক নিজের আত্মসমালোচনা করে ভাসানী বলেন,

---

৫১ ঐ, পৃ ৩৫৮।
৫২ ঐ, পৃ. ৩৫৮।
৫৩ দৈনিক বাংলা, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০।
৫৪ আহমেদ সিরাজ উদদীন, *মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, ভাস্কর প্রকাশনী, পৃ. ২৮০

''আমি কতই দুর্বল যে, তাহাদের মতই এই কথা আমার মনে পড়ে মহা এক প্রলয়ের পর। এই জীবনে আমি কত বন্যা দেখিয়াছি, দুই দুইটি মহাযুদ্ধ ও দেখিয়াছি– কিন্তু পাকিস্তানের ১৫ লক্ষ প্রাণ বিধ্বংসী মহা জলোচ্ছ্বাসের মত আর কোনোটিকেই এত আপন করিয়া নিতে পারি নাই। ইহার কারণ শুধু মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য নহে, প্রলয়ো- বেশে সরকার ও দেশবাসীর নির্লজ্জ ভূমিকা প্রধান বিষয়''। ভাসানীর জীবনের যত দুঃখের ঘটনা আছে তাঁর মধ্যে এ জলোচ্ছ্বাস বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। ভাসানী যেমনটা বলেছিলেন: ''আমি আজ দেখিতে পাই মনপুরা-রামগতি, গলাচিপার দৃশ্য। আমার জীবনে কেন, ইতিহাসের সকল পরিচ্ছদকে উপচাইয়া একটি বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার প্রত্যশা এসব যেন আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।''[৫৫]

জলোচ্ছ্বাস ও শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় চলাকালে নির্বাচনী প্রচারে খুলনাতে ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি সকল নির্বাচনী কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সরকার, রেডক্রসের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সচ্ছল মানুষের এগিয়ে আসার আহবান জানান। ১৮ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় দুর্গত অঞ্চলের মানুষের দুঃসহ অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি হাতিয়া যান। দুর্গত এলাকায় সফরের অভিজ্ঞতা তিনি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা মারফতে বঙ্গবন্ধু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা জানা যায়। দুর্যোগের পরে প্রথম ৮ দিন যেসব এলাকায় রিলিভ, খাদ্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয় নাই তার মধ্যে ছিল ভোলা মহকুমার, তজমুদ্দীন, বোরহান উদ্দীন, লালমোহন থানার হাজীপুর, মহাপুরা, ছোট মালনচর, বড় মালনচর প্রভৃতি। বঙ্গবন্ধু এসময় সেসময় এসব এলাকায় দেখতে পান হাজার হাজার মরা মানুষ, পশু পাখির মৃতদেহ, গলিত লাশ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দুর্গত এলাকার দুস্থ ও বিপন্ন মানুষের কষ্টের কথা বঙ্গবন্ধু ধৈর্যের সাথে শোনেন। ৯ দিন একটানা ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্থ পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও ভোলায় সফর শেসে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফেরেন।[৫৬]

---

৫৫ ঐ, পৃ: ২৮০।

৫৬ Blood, Archer k (2006), *the crucl Birth of Bangladesh, Memories of an American Diplomat.* UPL, Dhaka, p.116

ঢাকায় ফিরে ২৬ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বিবৃতি দেন যেখানে ৭০ জন দেশী ও অসংখ্য বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। [৫৭] সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করে শেখ মুজিব বলেন,

> ''পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্দিনে ওরা কেউ দেখতেও আসেনি। এটা প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা মাথায় খুন। তাদের চরম শাস্তি হওয়া দরকার। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তাদের বিচার করতাম। কোটিপতি বস্ত্র মালিকেরা এক গজ কাপড় দিয়েও সাহায্য করেনি। ওদের এত বড় সেনাবাহিনী থাকতেও লাশ দাফন করতে ব্রিটিশ মেরিনদের সাহায্য নিতে হয়েছে।'' শেখ মুজিব আরও বলেন যে, ''এই ছুতোই নির্বাচন পিছানোর চেষ্টা হলে গৃহযুদ্ধ বাধবে। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। ১০ লাখ মানুষ ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। প্রয়োজনে আরও ১০ লাখ মানুষ জীবন দেবে।''[৫৮]

২৬ নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> বিপর্যয়ের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে উদ্ধার ও রিলিফ কার্য শুরু হত, তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব থেকে রক্ষা পেয়েও অনাহার, শীত ও চিকিৎসার অভাবে যে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হত। নৌবাহিনী যদি অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় যেত তাহলে তারা সাগরে ভেসে যাওয়া হাজার হাজার লোককে বাঁচাতে পারত। এ ধরনের রিলিফ ও উদ্ধার কার্য শুরু হওয়া ক্ষমাহীন অপরাধ। এ নিষ্ঠুর অবহেলার কাহিনী এখানেই শেষ নয়.....ঘূর্ণিঝড়ের দশদিন পরেও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছে এক কণা রিলিফও পৌঁছায়নি। উপদ্রুত জনগণ গাছের শিকড় খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপক আকারে আমাশয় দেখা দিয়েছে এবং মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে।[৫৯]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোনা করে শেখ মুজিব বলেন,

> বাংলাদেশের উপদ্রুত জনগণের প্রাণ রক্ষার বিষয়টি কেবল বিশ্ববাসীর দয়ার উপর নির্ভর করছে। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত জনগণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ দিন সময় লেগেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে দায়ী করছি। আমাদের ১০ লাখ লোক মারা গেছে আর উপদ্রুত এলাকায় ৩০ লাখ লোক মৃত্যুর সাথে লড়ছে।[৬০]

---

৫৭ এ. কে. আব্দুল মোমেন (সম্পাদিত), *শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা ২০২০, পৃ. ২০৫
৫৮ ঐ।
৫৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
৬০ মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১।

ঘূর্ণিঝড় দূর্গত এলাকায় ৯ দিন অতিবাহিত করার পরে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফেরেন। ঢাকায় ফিরে তিনি যে বক্তব্য দেন সেটি মূলত ইংরেজিতে ছিল। যাতে বিদেশি সাংবাদিকরা তার ভাষণ বুঝতে পারে।[৬১] Archer Blood তার স্মৃতিকথায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

> He dwelt at length on what he termed the 'criminal negligence of the government in failing to respond effectively to the disaster, citing 'failures and bottlenecks' which prevented relief from reaching the people. He declared that 'the people of Bangladesh (not East Pakistan) will be eternally indebted to those countries who have so generously come to their rescue in their hour of need.' He said that the generous assistance received from abroad only underlines the tardiness and callousness of our own rulers.' He castigated West Pakistani politicians who preached the integration of the two wings but failed to visit East Pakistan to 'extend sympathy and succor to the survivors. He also warned that "if the elections were postponed once more, there would be civil war." The Chief Election Commissioner "decided to postpone elections only in nine or ten of the most seriously affected constituencies in the disaster area".[৬২]

৪.৮ জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা

জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু ও ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনা করলে এটা যে শতাব্দীর সবথেকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তা বুঝতে কষ্ট হয়না। আমেরিকার আবহাওয়া অধিদপ্তর মারফত ৫ নভেম্বর ঝড়ের পূর্বাভাস

---

৬১ Cornelia Rohde, *CATALYST, In the Wake of Great Bhola Cyclone,* Shahitya Prakash, Dhaka, 2015, p.148.

৬২ Archer K. Blood. *The Cruel Birth of Bangladesh*, The University Press Limited, 2002, p. 116-117.

জানালেও পাকিস্তান সরকার তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুর্যোগের একদিন পরেই পিকিংয়ে সরকারি সফর শেষ করে ঢাকাতে প্রথম যাত্রাবিরতি করেন।[৬৩] তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মনে করেছিল যে, প্রেসিডেন্ট হয়ত দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সে আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ইয়াহিয়া খান দুর্গত এলাকা হেলিকপ্টারে ঘুরে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য কিছু ত্রাণ ও অনুদান দিয়ে রাওয়ালপিন্ডি চলে যান। [৬৪]

দুর্গত এলাকা ঘরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বক্তব্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

> ''বিপর্যয়ের দুদিন পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা সত্তেও উপদ্রুত জনগণকে আংশিক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সুষ্ঠুভাবে তাদের কোনো হুঁশিয়ারি সংকেতও দেয়া হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে যখন খুব ভাল শস্য ফলছে, তখন আমাদের কাছে খাদ্যশস্যের চালান এসেছে বিদেশ থেকে। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে তখন পটুয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের লাশ কবর দিতে হচ্ছে বৃটিশ মেরিনদের। ...এটা আমাদের জন্য লজ্জাকর। আমরা আজ এই সংকল্প করছি যে, উপকূলীয় এলাকায় আমাদের ভাইদের উপর যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে তা আর ঘটতে দেওয়া হবেনা। এ ঐতিহাসিক বিপর্যয় বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরছে।[৬৫]

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির আরেকটি বড় কারণ হল, দুর্যোগের পূর্বে কোনো সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়নি। যদিও ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জাতিক হাওয়া উপগ্রহের ডিরেক্টর ডেভিড জনসন দাবি করছেন যে, ৫ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটা পর্যন্ত ঘূণিঝড়ের তীব্রতা ও গতিবেগ সম্পর্কে বারবার অবহিত করেছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারের আবহাওয়া অফিসের পরিচালকও অনুরূপ দাবী করে বলেছেন যে, দুর্যোগের খবর পেয়ে তারা যথাসময়ে দুর্গত এলাকায় তা পৌঁছে দিয়েছেন। ক্ষয়-ক্ষতির তীব্রতা ও মৃত্যুর সংখ্যা পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, আসলেই পূর্ব বাংলার মানুষ আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে কোনো সংকেত পাননি। সতর্ক সংকেত পেলে উপকূলের মানুষ সতর্ক হলে ক্ষয়ক্ষতি একটু কম হতে পারত।[৬৬] আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক এক তরফা ভাবে ঝড়ের

---

৬৩ এন্থনি মাসকারেনহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৬৪ মোশারফ হোসেন,'বিদেশী গণমাধ্যমের আলোকে ১৯৭০ সালের পূর্ব বাংলার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: একটি পর্যালোচনা', আশা ইসলাম নাঈম (সম্পাদিত), ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, পৃ. ২৬৬।

৬৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

৬৬ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

সতর্ক সংকেত ঘোষণার প্রচলিত নীতি বাদ দিলে উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। পিপিআই এর খবরে জানা যায় বেতার থেকে কোন ধরনের সতর্ক সংকেত না দেওয়ায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাবাসী বিশ্বাস করেন সেখানকার বাসিন্দারা যদি আসন্ন বিপদের ভয়বহতা উপলব্ধি করতে পারত তাহলে মৃতের সংখ্যা এত হতনা। বিপদ সংকেতের হুঁশিয়ারী নম্বর উল্লেখ না করায় জনসাধারণ এটাকে স্বাভাবিক হুঁশিয়ারি বলেই ধরে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।[৬৭]

অন্যদিকে দুর্যোগ সংঘঠিত হবার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত দুর্গত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। সরকারের আগেই বেসরকারি সংস্থা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্গত মানুষের দাঁড়ায়। গভর্নর আহসান অভিযোগ করেছেন যে, পূর্ব বাংলায় সরকারের একটা হেলিকপ্টার নাই। সরকারে কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েও কোনও হেলিকপ্টার পান নাই। অন্যদিকে হাতেগোনা দু'একজন পাকিস্তানী নেতা ছাড়া আর কেউ দুর্গত মানুষের এই বিপদের দিনে দেখতে আসেনি।[৬৮] ত্রাণ কার্যক্রমে সরকারের উদাসীনতা সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক রিলিফ কমিশনারকে প্রশ্ন করেন- পাকিস্তানে এত হেলিকপ্টার থাকা স্বত্ত্বেও কেন তা কাজে না লাগিয়ে সুদূর মার্কিন মুল্লুক থেকে আগত হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিলিফ কমিশনার বলেন- আমি জানিনা পাকিস্তানের কয়টি হেলিকপ্টার আছে। উক্ত সাংবাদিক বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানীর আশে পাশে আমি এক ডজন হেলিকপ্টার উড়তে দেখেছি। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে সংঘর্ষের সময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার বিমান, হেলিকপ্টার সহ সকল সম্পদের সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় বিপর্যয়ের সময় সেরূপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত সকল সম্পদের সমাবেশ করা হচ্ছে না কেন? এটা কী অবাক কান্ড নয়? কমিশনার বলেন- আমি এর কি উত্তর দিতে পারি।[৬৯]

লন্ডনের দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়- সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানে মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও পরিবহণে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা ও অযোগ্যতা উৎকণ্ঠার কারণ। পত্রিকার খবরে ৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ মৃত্যু বলে অনুমান করা হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, অনাহার, কলেরা ও টাইফয়েডে আরও ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্গত মানুষের জন্য যে ত্রাণ সাহায্য পাঠানো হচ্ছে তা ঢাকাতে

---

৬৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
৬৮ আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।
৬৯ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০।

এসে জমা হচ্ছে। স্থল, নৌ বা বিমান- কোনোভাবেই তা দুর্গত এলাকায় পাঠানো যাচ্ছেনা। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটিমাত্র হেলিকপ্টার অবশিষ্ট থাকায় আকাশ পথেও ত্রাণ সামগ্রী দুর্গত অঞ্চলে পাঠানো যাচ্ছেনা। এছাড়া সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল- পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে এখনো দুর্গত এলাকা ঘোষণা করেনি।[৭০]

ফরাসী পত্রিকা লা ফিগারোতে পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের উদাসীনতাকে ব্যঙ্গ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। পত্রিকায় প্রতিবেদন: রমজানে রোযা রাখার কারণে সম্ভবত দূতাবাসের কর্মচারীরা অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তারা তাদের দেশের পূর্বঞ্চলের দুর্যোগের বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়।[৭১] জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পরে উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার কার্যে পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা ক্ষমা করা গেলেও, (যদিও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের এই অবহেলার জন্য বিচার করতে চেয়েছিলেন) এই এত বড় দুর্যোগ আসার আগে আবহাওয়া অধিদপ্তরের অবহেলা ক্ষমা করা যায় না।

কানাডার অটোয়া সিটিজেন পত্রিকার রিপোর্ট থেকে এ বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কে আবহাওয়া বিজ্ঞান পাকিস্তানকে এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে সতর্ক করে দিলেও দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর জন্য সরকার কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পত্রিকার মাধ্যমে আরও জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রাকৃতিক উপগ্রহ কেন্দ্রের পরিচালক ডেভিড জনসন ৫ নভেম্বর পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকাকে ক্রমবর্ধমান নিম্নচাপ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। ঘূর্ণিঝড়টির অবস্থান গতিপথ ও মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে ৭ থেকে ১২ নভেম্বর প্রতিদিন নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করতেন তিনি। ডেভিড জনসনের ভাষ্যমতে, বিপদ সংকেত অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এমন কোনো তথ্য তাদের কাছে পৌঁছায়নি।[৭২] দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে ভাসানী যেমনটা বলেছিলেন- 'এই দুর্দিনেও ওরা কেউ আসেনি।' তিনি বিশ্ববাসীর কাছে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবার আকুল আবেদন জানান। যদিও ইতোমধ্যে ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ত্রাণ সাহায্য পাবার আশ্বাস পাওয়া যায়। ভাসানী আক্ষেপ করে বলেন, 'বাঙ্গালির এই মহাবিপদে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা, সেখানকার শাসকগোষ্ঠি সবাই নিশ্চুপ।'[৭৩]

---

৭০ দৈনিক সংবাদ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
৭১ দৈনিক পূর্বদেশ, ২৩ নভেম্বর, ১৯৭০।
৭২ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৭৩ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬।

পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্যোগকে ইরান নিজেদের দুর্যোগ মনে করে বিমান দিয়ে সহায়তা করে।[৭৪] পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অনীহা বোঝা যায় ভাসানীর এক বক্তব্য থেকে:

> ''একটি বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজাগ যে, একান্তই আমাদের দুর্ভাগ্য-এক মহাবিপর্যয় ঘটা সত্ত্বেও ঢাকার অনেক মহলে যেমন মাতমের লেশমাত্র পাওয়া যায় নাই, ঠিক তেমনি ইহা হইতে পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রই এমনি কোনো মহাশিক্ষার আস্বাদন লাভ করিবেন ইহা আশা করা যায়না। ইহা প্রমাণ করিতে একটি ঘটনাই যথেষ্ঠ মনে করি। ১২ নভেম্বর দিবাগত রাত্রিতে সেই মহা প্রলয় ঘটিয়া গেলেও ১৫ নভেম্বর রাত্রে ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে এশিয়ান কার র‍্যালির সমাপ্ত ঘোষণা উপলক্ষে এক বল নৃত্যের আয়োজন করা হইয়াছিল। পরিহাস টুকু এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। নৃত্য শেষে দুর্গতদের জন্য দান খয়রাতের আহবান জানানো হয়। উহাতে ভারতীয় দল চারশত টাকা, ইরানি দল আটশত টাকা, করাচির এক প্রতিযোগী দুইশত টাকা এবং অবশিষ্ঠ উপস্থিত সকলে মিলিয়া একশত চৌদ্দ টাকা দান করেন। এই প্রসেঙ্গে পরবর্তী মন্তব্য নিস্প্রয়োজন মনে করি।[৭৫]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ১১ জন নেতা 'সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা ও উদাসীনতা দেশবাসীর বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে'- শিরোনামে একটি তারবার্তা পাঠায়। যাদের মধ্যে ছিলেন: পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পিডিপি প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান, ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তন মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিন, প্রাদেশিক জামাত সভাপতি জনাব গোলাম আজম, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক খান সবুর, কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি জনাব এ এস এম সোলায়মান, নেজাম ইসলামের মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, জমিয়তে উলেমা পার্টির পীর মোহসেন উদ্দীন এবং পিপলস পার্টির গরীব নেওয়াজ। তারবার্তায় তারা বলেন যে: সরকার কিভাবে এমন এক প্রলয় বিধ্বস্থ ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাচ্ছেন যেটার জন্য কোনো মানুষ অথবা সরকারও দায়ী না। তারা আরও বলেন, এটা খুব রহস্যজনক ব্যাপার যে আমাদের সরকারের থেকেও খুব দ্রুত বিবিসি, মার্কিন সিনেট ও ভারতীয় পার্লামেন্ট বিপদের দিনে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের এখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত এলাকা ভ্রমণ

---

৭৪ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৮।

৭৫ আহমেদ সিরাজ উদদীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২।

করেননি। প্রেসিডেন্ট নিজেও খবর পাবার পরে কোনো রকম নামকাওয়াস্তে দায়িত্ব পালন করে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন।[৭৬]

বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, ''যখন কর্তৃপক্ষ ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয়কে নাগালের মধ্যে নয় -বলে নাকচ করে দেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বিপুল এলাকার ব্যাপক ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা ও দায়িত্বহীনতার প্রমাণ দেন তখন তা মানুষের বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এখনো পর্যন্ত মানুষ ও পশুর লাশ ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। নিদারুণ অবহেলার জন্য বহু সংখ্যক জীবিত লোক মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। ব্যাপক মহামারীতে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। যদি অবিলম্বে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে আরও লাখো মানুষের ভাগ্যও অনুরূপ হবে। বিদেশী সাহায্য সামগ্রী সমূহ দুঃখজনক অদক্ষতার সাথে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। দুদিন ধরে সেসব ঢাকায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে। দুঃখের সাথে আরও এসেছে পুঞ্জীভূত অসম্মান, লজ্জা, অবহেলা। আপনার সদর দফতর এখানে স্থানান্তরিত করা অত্যাবশ্যক। সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ কাজে লাগান। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত বিবেচনা করুন।[৭৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার টেলিভিশন জলোচ্ছ্বাসের সংবাদ প্রচার করতে কার্পন্য করে। অথচ বৈশ্বিক নামকরা মিডিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের খবর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২১ জন সাংবাদিক, টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান, ফটোগ্রাফার এসময় পূর্ব বাংলায় আসে। বিশ্বের সকল নামকরা সংবাদপত্র, দৈনিক পত্রিকা, মাসিক ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের প্রতিনিধিরা এসময় দুর্গত এলাকায় আসে। পূর্ব বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে আসে লন্ডন টাইমস, ডেইলি টেলিগ্রাফ, টাইমস, নিউজ উইক, গার্ডিয়ান, লা ফিগার প্রভৃতি পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ। এছাড়া বিবিসি টেলিভিশন টিম কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, ফরাসী টেলিভিশন টিম, নরওয়ে টেলিভিশন টিম, পশ্চিম জার্মানী টেলিভিশন টিম, ইউপি আই, রয়টার্স এসসিয়েটেড এর মত বিশ্বখ্যাত নিউজ এজেন্সি।[৭৮]

পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো মিডিয়াতে ঘূর্ণিঝড়ের কথা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ হয়নি। অথচ এর থেকেও সামান্য বিষয়ও সেখানকার মিডিয়াতে সাড়ম্বরের সহিত প্রচার হয়। ভাসানী তাই আফসোস করে বলেন, ''একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু

৭৬ দৈনিক পূর্বাদেশ, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০। সংগৃহীত, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৭।
৭৭ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৭।
৭৮ দৈনিক আজাদ, ২৩ নভেম্বর, ১৯৭০।

করে তাহা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরুপ বিশ্বাসঘাতকতা ও সীমাহীন ধৃষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে তাহা আজ সাত কোটি বাঙ্গালিকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, জর্ডান, সিডনী, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্য ও সামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে, তখনও পাকিস্তানের বেতার, টিভি, বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে, তখন তাহাদের আহ্লাদ মাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বার লক্ষাধিক রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন-কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে।''[৭৯]

সুতরাং, দুর্যোগ পূর্ব সতর্ক সংকেত, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, দুর্যোগ পরবর্তী পূনর্বাসন পর্যায়ে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতার গতি প্রকৃতি সবকিছুতেই সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি চরম মাত্রায় উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

৪.৯ জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতায় ভাসানীর উদ্বেগঃ শামসুর রাহমানের কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবী'

দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে মওলানা ভাসানী ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে আহুত জনসভায় পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেন ও ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা দেন। সেই সভায় এক পর্যায়ে তিনি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দেন। ভাসানীর সেদিনের বাগ্মীতা, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের এই ঘোষণাকে কবিতার মাধ্যমে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি শামসুর রাহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে এটিই প্রথম কবিতা।[৮০]

---

৭৯ মওলানা ভাসানী প্রচারপত্রঃ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭০।

৮০ সফেদ পাঞ্জাবী, *দুঃসময়ের মুখোমুখি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৩৮০।

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুন ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলনা ভাসানী
কি বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পরে নুহের গভীর মুখ।
সহযাত্রিদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর দক্ষিণ বাংলার
শাবাকীর্ণ হু-হু উপকুল, চক্ষুদ্বয় সংহারের।
দৃশ্যাবলীময়; শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখল চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ
আমরা সবাই লাশ, বুঝিবা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

ঝাঁকা-মুটে ভিখিরি, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী, কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুন ক্যামেরাম্যান, ফেরিওয়ালা, গোয়েন্দা, কেরানি;
সমস্ত দোকানপাঠ, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিক্সা ট্যাকসি, অতিকায় ডাবল ডেকার,
কোমলা ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরা, ফুটপাত,

যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!

বল্লমের মত ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবী,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কি ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

'সফেদ পাঞ্জাবী' কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমান মওলানা ভাসানীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে ভাসানী যেন বারুদ নিয়ে ফিরছেন। সে বারুদ তাঁর কণ্ঠে বিস্ফোরিত হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে পল্টনের চারদিকে। ভাসানীর কণ্ঠের ঝাঝালো সে বক্তব্য বিস্ময় মুগ্ধ কণ্ঠে শুনে চলেছে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। যেন অসহায় বানভাসী শোকার্ত মানুষের প্রতিমূর্তি হয়ে ভাসানী তাদের হৃদয়ের অব্যক্ত কথা বলেছেন।

৪.১০ ১৯৭০ এর সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস: সাধারণ নির্বাচনে এর প্রভাব

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর। সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হওয়ায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু, ১৯৭০ সারের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হলে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন পেছানোর দাবি করা হয়। ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পেছানোর সে দাবীতে কর্ণপাত করেন নি। ১৭ নভেম্বর ১৯৭০ তারিখে পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ বিলম্বিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। দিন দুয়েকের মধ্যে তিনি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। এরপর ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় নির্ধারিত নির্বাচনী কর্মসূচী পরিবর্তন করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।[৮১] পরবর্তীতে

৮১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

শুধুমাত্র দুর্গত এলাকার জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি আসনের নির্বাচন পিছিয়ে পরের বছরের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে ঠিক করা হয়।[৮২]

সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি মোজাফফর আহমদ। ২৯ নভেম্বর এ সংক্রান্ত এক বক্তব্যে তিনি বলেন, 'কোন যুক্তিতে ও কি উদ্দেশ্যে সরকার ৭ ডিসেম্বর তারিখে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। যে সকল দল নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী তুলিয়া গণবিরোধী সরকারের ঐ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করিয়াছে তাহারও যে পূর্ব বাংলার লাখ লাখ দুর্গত মানুষকে রক্ষা করার চাইতে মন্ত্রীত্বের গদিকে বড় মনে করে, তাহাও তাহাদেরই দাবী হইতে জনগণের নিকট পরিস্কার হইয়াছে।'[৮৩]

ইয়াহিয়ার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় শুরুতে মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু, ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষের মৃত্যু ভাসানীর আন্তর্জগতকে রাতারাতি পাল্টে দেয়। 'ভোটের আগে ভাত চাই'- স্লোগান দিয়ে মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা করেন। ভাসানীর নির্বাচন বয়কটের ঘোষণায় তাঁর দলসহ অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, ভাসানী শেখ মুজিবের সাথে আঁতাত করে ভোটে শেখ মুজিবকে জিতিয়ে দিতে এমনটা করছেন।[৮৪] নির্বাচনের অতীত ইতিহাস পর্যালোনা করে ভাসানী বলেন, ''অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণ বারবার দেখিয়াছে, নির্বাচনের নামে দেশময় তোলপাড় করিয়া উৎসব তুলিয়া যাহারা উপরের তলায় আরোহন করে, তাহাদের নির্বাচন চাতুরী ও অপকৌশল জনজীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে।''[৮৫]

অন্যদিকে উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে শেখ মুজিব বলেন,

> ''বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এখন এক ষড়যন্ত্র চলছে। আমলাতন্ত্রী, কায়েমী, স্বার্থবাদী, ক্ষমতাসীন মহল আর সেই পুরানো চক্রই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু তারা জানেনা নির্বাচন নিয়ে যদি কোনো খেলা শুরু হয় তাহলে তা আগুন নিয়ে খেলারই শামিল হবে। বাঙালি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের লাখো লাখো ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য আমরা আরও ১০ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারব। প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে ছয় দফা আর এগার দফার ভিত্তিতে আমাদেরকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে।

৮২ মহিউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।
৮৩ দৈনিক সংবাদ, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭০।
৮৪ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০।
৮৫ সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩।

নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক, কিংবা নির্বাচন ব্যর্থ হলে জাগ্রত জনতার শক্তির মাধ্যমেই হোক-ক্ষমতা জনগণকে জয় করতেই হবে। বাংলাদেশের জনগণের দাবীকে আর অস্বীকার করা যাবেনা।'' ঘূর্ণিঝড়ের অযুহাতে নির্বাচন যাতে বন্ধ না করা হয় তার হুঁশিয়ারি দিয়ে শেখ মুজিব বলেন, ''নির্বাচন বাজেয়াপ্ত করা না হলে, নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংরাদেশের জনগণ তাদের রায় জানিয়ে দেবে। আর নির্বাচন বানচাল হলে, ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ১০ লক্ষ মানুষের কাছে ঋণী বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে প্রয়োজনে আরও ১০ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করবে।''[৮৬]

ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা বাদে বাকী এলাকাগুলোতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর। আর ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকাতে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি। শতাব্দীর সব থেকে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের নির্বাচনকে বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দুর্যোগ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে যে পরিমাণ সহযোগিতা ও নিরাপত্তা আশা করেছিল তা তারা পায়নি। এজন্য ব্যালটের মাধ্যমে তার প্রতিবাদের যে সুযোগ তারা পায় তা হাতছাড়া করেনি। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মহিলা আসন সহ আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭ টি আসন। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ৮৮ আসন। সাইক্লোন দুর্গত অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯ টি আসনের সবগুলোতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।[৮৭] দুর্গত অঞ্চলে প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্ধারিত ১৮ টি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।[৮৮] আর ১৭ ডিম্বের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ২৯৮ টি আসন পায়।[৮৯]

সারণি- ১৩

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন	
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	*	২

৮৬ দৈনিক ইত্তেফক, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
৮৭ মহিউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২২১।
৮৮ মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, সময়, ঢাকা, ২০২১, পৃ: ৯৩।
৮৯ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ: ৫৮৫।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি			
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)			
মুসলিম লীগ			
(কনভেনশন)			
মুসলিম লীগ (কাউয়ুম)			
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	*	১
জামায়াতে ইসলামী	১	*	১
নেজামে ইসলামী	১	*	১
জামায়ত-উল-উলামায়ে ইসলাম	*	*	*
মারকাজে আহলে হাদীস			
জামায়াত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)			
জামায়ত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)			
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	*	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

উৎস: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২য় খন্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ: ৫৮৬

সারণি- ১৪

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের প্রদেশ অনুসারে ফলাফল[৯০]

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	সংরক্ষিত আসন	মোট
আওয়ামীলীগ	১৬০	৬৪					০৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি		০১	১৮				০৫	৮৮
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম		০৭	০১					০৯

৯০ মোশারফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

লীগ								
কাউন্সিল মুসলিম লীগ								০৭
জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম (হাজারী গ্রুপ)				০৬	০১			০৭
মারকাযী জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম		০৪	০৩					০৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)				০৩	০৩		০১	০৭
জামায়াতে ইসলামী		০১	০২	০১				০৪
কনভেনশন মুসলিম লীগ		০২						০২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	০১							০১
স্বতন্ত্র	০১	০৩	০৩			০৭		১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	০৪	০৭	১৩	৩১৩

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর পুরো সময়টা জুড়ে পূর্ব বাংলা ছিল বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যে বা যারা এসেছে প্রত্যেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য করেছে। এ অঞ্চলের মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়ে শুরু থেকেই সোচ্চার ছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষা নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আস্ফালনের কারণে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে বাঙালিদের উৎকণ্ঠা কম ছিল। কিন্তু বাঙালিদের এ ভুল ভাঙতে খুব বেশী দেরী হয়নি। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাতেও নিরাপত্তা নিয়ে বাঙালি নেতৃবৃন্দ জোরালো দাবী তুলে ধরে। তখনও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সেটা আমলে নেয় নি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে বাঙালি জনগোষ্ঠী কত অনিরাপদ তা তারা বুঝতে পারে। এরপর থেকে বাঙালির বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবী প্রাধান্য পায়; যার প্রমাণ ৬ দফা। এরপর ১১ দফাতেও নিরাপত্তা বিষয়টিকে বড় করে দেখা হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে যে মানবিক নিরাপত্তার সংকট তৈরী হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা সেখানেও পরিলক্ষিত হয়। নিজের দেশের একটা অংশ, যেখানে কিনা সব থেকে বেশী লোকসংখ্যার বসবাস, স্মরণকালের মধ্যে সব থেকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের প্রতি কর্ণপাত না করা কোনও যুক্তিতেই

ধোপে টেকেনা। এমন প্রলয়ংকারী সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের আগে সতর্ক করার জন্য যে ব্যবস্থা সেটি না করা বড় ধরনের হঠকারিত সিদ্ধান্ত। মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে যেমনটা বলেছিলেন: ''বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটা রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক- এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। উহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবেনা?''[৯১] ভাসানী যেমন দ্যার্থহীন কণ্ঠে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলেছিলেন, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমের বরাবর উপেক্ষা, বঞ্চনা আর বিমাতাসুলভ মনোভাবের সঠিক জবাব দিয়েছিল তারা ১৯৭০ সালের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে। এ যেন ভাসানীর আচ্ছালামু আলায়কুম এর সঠিক অনুকরণ। বাত্যবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে নির্ধারিত সময় ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলেও পরবর্তীতে যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন পশ্চিম পাকিস্তানের দল ও শাসক গোষ্ঠী চরমভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ইয়াহিয়া সরকারের গড়িমসিতা ও পরবর্তীতে 'অস্ত্রের ভাষায়' পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ৯ মাসের গনহত্যার ন্যাক্কারজনক সূত্রপাত হয়। যুদ্ধ চলাকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ইয়াহিয়া সরকার নিজেরা যুদ্ধ শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা 'স্বাভাবিক' বলে যে পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চায়-সেটা ছিল হাস্যকর।

৯১ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩৫৯।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান সব থেকে বেশি নিরাপত্তা সংকটে পড়ে। দেশভাগের পর থেকে এ অঞ্চল নানা রকম বঞ্চনা, রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেও এসব কিছু ছাপিয়ে যায় ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বর্বর নির্যাতন। রাজাকার ও পাকিস্তানি বিভীষিকাময় কর্মকান্ডের দোসররা ব্যতীত পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ সময় এক ভীতিপ্রদ ও আতঙ্কগ্রস্থ সময় পার করে। জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের রক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে ঝুকিতে ছিল ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ধর্ম অনুসারীরা। আর মতাদর্শ হিসাবে ঝুঁকিতে ছিল স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের চেতনায় বিশ্বাসী ও দল হিসাবে আওয়ামী লীগ। শরনার্থী হয়ে যারা দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা দেশ ছেড়ে যাবার পথে অবর্ণনীয় কষ্ট ও লুটতরাজের শিকার হয়। অন্যদিকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করলেও খাদ্য সংকট ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাসের কারণে শরনার্থীরা নিদারুন কষ্টে দুর্বিসহ জীবন-যাপন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি একবারে ভেঙে পড়ে। এ অঞ্চলের অনেক জেলাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধ শুধু প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, শিশু, গৃহবধু সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটির সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খাবার পৌছানো, শত্রুর গতিবিধির সংবাদ গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সরবরাহ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও পশ্চাৎপসরনে সাহায্য করা, পথ চিনিয়ে দেওয়া, ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাস্তার ধারে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করার মত কাজে সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষ।

৫.১ মুক্তিযুদ্ধকালীন অপ্রচলিত নিরাপত্তা ইস্যুসমূহ

ক) যুদ্ধকালীন অর্থনীতি:

বরাবরের মত উপেক্ষিত পূর্ব বাংলার অর্থনীতি যুদ্ধের সময় তলানীতে গিয়ে ঠেকে। ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে নিউইয়র্ক টাইমসে সিডনি শেনবার্গের প্রতিবেদনে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক দুর্যোগের বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও বাঙালি স্বাধীনতাকামী জনতার মধ্যে গোলাগুলির কারণে ভয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা মাঠে ফসল রোপন করতে যাচ্ছেনা। এছাড়া

ধারণা করা হচ্ছে যে, ঘূর্ণিঝড়ের শিকার ১ লক্ষ মানুষ এখনও গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে। এই মৌসুমে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। লবণ, ডাল, রান্নার তেল, কেরোসিন ও জ্বালানী তেলের ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে ভাত প্রধান খাদ্য হলেও যোগান শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে কাঁঠাল তাদের প্রধান খাদ্যে পরিণত হচ্ছে।"[১]

অনেক কৃষক পাকিস্তান সরকারের সাথে অসহযোগিতার উদ্দেশ্যে রপ্তানিযোগ্য ফসল না বুনে ধান বোনে। অন্যদিকে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক কৃষক ঘরবাড়ি ফেলে চলে যাওয়ায় ক্ষেতের পাট তোলা না হওয়ায় তা ক্ষেতে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে পাট উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আবার যেসব কৃষক পাট বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন তারাও ভাল সুবিধা করতে পারছিলেন না। ভাল পাটের বাজার হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা পুড়িয়ে দিলে কৃষকরা বেকায়দায় পড়ে যায়। আবার হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের ভয়ে বাড়িতে পাট মজুদ করাকে অনেক কৃষক শ্রেয় মনে করেন নি। কৃষকের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা একেবারে অল্প দামে পাট ক্রয় করে। সুতি পাট মন প্রতি ২০-৩০ টাকা এবং বগী ৩৫-৪০ টাকা দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নৌকা করে দূরবর্তী বাজারে যে চাষীরা পাট বিক্রয় করতে যাবে তার উপায় ছিল না। কারণ, পাটের নৌকায় মুক্তিবাহিনী আছে কিনা- এই সন্দেহে চাষীদের রাজাকার ও পাক সেনারা পর্যদস্ত করত। কারণে, চাষীরা গ্রামে অল্প দামে পাট বিক্রয় করতে বাধ্য হতেন।[২]

চাউলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। লুটেরা রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে কৃষকরা বাড়িতে চাউল রাখা নিরাপদ মনে করেন নি। কৃষক তাই নামমাত্র মূল্যে চাউল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আমন ধানের ফলন যেমন ভাল হয়নি, তেমনি সার ও কীটনাশকের ঘাটতির কারণে ইরি ধানের চাষেও কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবার নিরাপত্তাজনিত শংকার কারণে আউশ ধানও সময়মত বোনা ও কাঁটা সম্ভব না হওয়ায় কৃষকরা চরম খাদ্য সংকটে পড়ে যায়।[৩] তখন পূর্ব বাংলার মানুষের খাবারের কষ্ট ছিল। অভাব এতই তীব্র ছিল যে, চায়না ও বার্মা থেকে পাকিস্তান সরকার এক ধরনের ক্ষুদ চাউল (এক ধরনের ভাঙ্গা চাউল) আমদানি করত, যেটা ছিল গন্ধযুক্ত। খাবারের সংকট থাকায় মানুষ সেই চাউল খেত। একটা গ্রামে ২/৩ টা পরিবার ছিল ধনী। বাকীদের 'দিন আনা দিন খাওয়া' ধরনের অবস্থা ছিল।[৪]

---

১ নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১। সংগৃহীত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫৮-৫৯।

২ মুক্তিযুদ্ধ (পত্রিকা), ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১। সংগৃহীত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬২।

৩ ঐ।

৪ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: সাক্ষাৎকার দাতা: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ (৭২), সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখঃ ০৫/০৭/২০২১, স্থান: আমতোলা, সাতক্ষীরা

যুদ্ধকালে তাঁতশিল্পও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। ধ্বংসের কারণ গুলোর মধ্যে ছিলঃ সুতার অভাব, পশ্চিম পাকিস্তানের কারখানাগুলোর কাপড় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে চালু করার উদ্দেশ্যে পাক সেনা কর্তৃক অনেক গ্রামের তাঁত পুড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরুপ, বাজিতপুর, বসন্তপুর, নিতাইকান্দি, কাপাসাটিয়া ও নরসিংদী এলাকার তাত শিল্পের কথা উল্লেখযোগ্য।[৫] সেপ্টেম্বরের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের শত্রু কবলিত কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। বিশেষ করে ১২ টা জেলায় দুর্ভিক্ষে এ মাসে না খেয়ে ১৯১ জন মানুষের মারা যাবার খবর পাওয়া যায়। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী* পত্রিকার খবরে এ দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

> "যে ১২ টা জেলায় সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ সমস্ত হিংস্রতা লইয়া মারণ নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে সেই জেলাগুলি হইতেছে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা সমূহে প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ অনাহারে তিলে তিলে ধুকে মরিতেছে। অধিকৃত এলাকা সফর শেষ হাভার্ড মেডিকেল স্কুলের ডাক্তার জন রোড বলিয়াছেনঃ বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর বর্তমানে যে ধরনের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা আর কখনও দেখা যায় নাই। কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে।[৬]

অন্য সময়ের থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক বেশি খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৯৭০ সাল অবধি বার্ষিক ১২ লক্ষ টন। কিন্তু যুদ্ধকালীন বছরে সেই ঘাটতির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ২৩ লক্ষ টন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছে যে, জরুরী ভিত্তিতে ২৯ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানি করে দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে না পারলে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার কোনো উপায় নেই।[৭] যুদ্ধ শুরু থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত খাদ্য মজুদ এবং বিতরনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমেরিকা ও বহিঃবিশ্বের কিছু বিশেষজ্ঞ ধারণা করছিলেন যে, আসন্ন শীতকালে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু অংশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের মতে, দুর্ভিক্ষ নির্ভর করছে মূলত

---

৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬২।

৬ বাংলার বাণী, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। সংগৃহীত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৩৫-২৩৬।

৭ ঐ, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। সংগৃহীত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৩০-২৩১।

বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতার উপর। কারণ, জাতিসংঘের অধীনে বিদেশি যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খাদ্য সামগ্রী বন্টনের কাজ করছে জেনারেল টিক্কা খানের কারণে তা দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।[৮]

শ্রমিকদের অসহযোগিতা ও মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমনের ফলে চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দর (বর্তমানে মংলা) স্থবির হয়ে পড়ে। পত্রিকা মারফত জানা যায় যে, কৃষকরা যা উৎপাদন করত, তা খুব অল্প দামে বিক্রি করত। অন্যদিকে বাইরে থেকে শিল্পজাত যেসব পণ্য আসত তাঁর মূল্য ছিল অতি চড়া। যুদ্ধকালীন পত্রিকা 'মুক্তিযুদ্ধ' এর ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রতিনিধির পাঠানো সংবাদে জানা যায় যে, ভৈরব বাজার, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ এই তিনটি ব্যবসা কেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পারার কারণে আমদানি ঠিকমত না হওযায় দ্রব্যমূল্যের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, লবণ, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তেল, চা, সিগারেট, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ হতে তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। চাউলের দাম ৫০ টাকা মন ও আটার দাম ছিল ৪২ টাকা মন।[৯]

সারণি- ১৫

১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন বিভিন্ন পণ্যের মূল্যমান

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	পূর্বের দাম	যুদ্ধকালীন দাম
মাংস (খাসি)	প্রতি সের	১.৫০	
মাংস (গরু)	প্রতি সের	৬ আনা	৮ আনা
চিনি	প্রতি সের	৮ আনা	১-২ টাকা
সরিষার তেল	প্রতি সের	২ টাকা ৪ আনা	৫-৬ টাকা
ঘি	প্রতি সের	১২ টাকা	
হাস-মুরগি	প্রতিটি	১.৫ টাকা	
গরু	একটা	৬০-৭০ টাকা	
সুতার শাড়ি	একটা	১২-১৫ টাকা	অপরিবর্তিত
শার্টের কাপড়	প্রতি গজ	২ টাকা ৪ আনা	
ইলিশ মাছ	১ সের	২ টাকা	

৮ বাংলার বাণী, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। সংগৃহীত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১১।
৯ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৩।

ডিম	৮-১০ টা	২ টাকা	
লবণ	সের	২ টাকা	২০-৮০ টাকা
চাদর (সাধারণ)	একটা	৪-৫ টাকা	
কাপড় (সাধারণ)	একটা	৬-৭ টাকা	
তেল (নারকেল)	সের	১ টাকা	৩-৪ টাকা
পেয়াজ	এন	১২ টাকা	
মরিচ	এন	১২ টাকা	
রসুন	সের	৪ টাকা	
দুধ	সের	৪ আনা	
সন্দেশ (পেটানো)	সের	২ টাকা	
সন্দেশ (দানার)	সের	২ টাকা	১-২ টাকা
স্বর্ণ (গিনি)	তোলা	৯৫ টাকা	
স্বর্ণ (পাকা)	তোলা	১১০ টাকা	
কেরোসিন তেল	দের	৩ আনা	১-২০ টাকা
লুঙ্গি	১টা	১ টাকা	৪-৫ টাকা
পাট	প্রতি মন		২০-৩০ টাকা

উৎস: আফসান চৌধুরী, *গ্রামের একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৩৬-৩৭

গ্রামীণ অর্থনীতি: গ্রামের অর্থনীতির উপর যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। ফসল কেনা, ফসল সংগ্রহ, বাজারে চাহিদা হ্রাস, আবার চাহিদা থাকলেও যোগান ঘাটতি, নিরাপত্তা সংকট প্রভৃতি কারণে জিনিসপত্রের দাম ওঠা নামা করত। মানুষের আয় সীমিত ছিল। অন্যদিকে সরবরাহ ছিল খুবই কম। বাইরে থেকে যেসব পন্য গ্রামের অর্থনীতিতে বেশি প্রভাব ফেলেছিল তা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যেত। এতে কোনও কোনো পন্যের দাম বহুগুণে বেড়ে যেত। এরকমই একটা পন্য ছিল লবণ। লবণের যোগান ঘাটতি হওয়ায় আর লবণ ছাড়া রান্না না হওয়ায় বিকল্প হিসাবে মানুষ নদীর লোনা পানি জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করত।[১০]

১০ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: সাক্ষাৎকার দাতা মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক (৭৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/০৫/২১, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: সাতক্ষীরা।

কোথাও খেজুর গাছের ডালপালা, লবণাক্ত এটেল মাটি পর্যন্ত লবণ হিসাবে ব্যবহার করত। আবার লবণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো কোনো পরিবার লবণ ছাড়াই রান্না -বান্না করত। আফসান চৌধুরী তাঁর গ্রামের একাত্তর গ্রন্থে কুষ্টিয়ার নুরুজ্জামান নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিলে তিনি বলেন, (যুদ্ধকালে) লবণ ছিল ৩০ টাকা কেজি। চিনি চার আনা, পাঁচ আনা কেজি। ভারত সীমান্তবর্তী পোড়াদহের নিকট যারা থাকত তারা লবণ এখানে (কুষ্টিয়া) এনে বিক্রি করত। নোয়াখালী অঞ্চলে লবণের পরিবর্তে মানুষ নুন মাটি খেয়েছে। আবার কেউ কেউ চরের মাটি কেটে তা পানি ঝরিয়ে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরী করে নিয়েছে। [১১] আফসান চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধকালীন গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের কষ্ট তুলে ধরেছেন। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান বর্ণনা করেন, ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের খাবার কষ্ট শুরু হয়। হাট-বাজার এ সময় চলত না বলা যায়। কিছু কিছু এলাকার মানুষ শাপলা ও কচুর লতি খেয়েছে। কোথাও মোথা দিয়ে জাউ রান্না করে মানুষ খেয়েছে। গরুর মাংস তখন সস্তা দরে পাওয়া যেত। কোথাও কোথাও চার আনা কেজি দরে গরুর মাংস পাওয়া যেত।[১২] সাতক্ষীরা অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক জানান যে, যুদ্ধকালে বাজার ঘাট ফাঁকা থাকত। লোকজন কম যেত। গেলেও দ্রুত প্রয়োজন মিটিয়ে চলে আসত। কখনও খান সেনারা বাজারে আসলে লোকজন দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে পড়ত। বাজারে গিয়ে খান সেনারা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের খোঁজ করত।[১৩] অনেক সময় হিন্দুদের গরু ধরে এনে জবাই করে অল্প দামে বিক্রি করত।[১৪]

তবে ফজলুল হক বলেন যে, যুদ্ধের সময় মানুষের অভাব কম থাকলেও যুদ্ধের পরের বছর মানুষ খুব খাবার কষ্টে ছিল। কারণ যুদ্ধের বছর ফসল ফলানো থেকে শুরু করে উৎপাদনধর্মী অন্যান্য কাজ বন্ধ ছিল। বাংলাদেশের মধ্যে বহু এলাকায় দীর্ঘদিন চাষাবাদ বন্ধ থাকায় এবং উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খাদ্য ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ না আসায় অনেক স্থানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উন্নয়নধর্মী কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব থাকায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী ও দিনমজুররা কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ক্ষুধার জন্য দেশ ছেড়ে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১৫]

---

১১ আফসান চৌধুরী, *গ্রামের একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৯।

১২ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: সাক্ষাৎকার দাতা: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মাজেদ ফকির (৮০), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৭/০৫/২০২১, স্থান: প্রতাপনগর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ।

১৩ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক(৮২), *প্রাগুক্ত*,

১৪ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মাজেদ ফকির(৭৯), সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫/০৫/২১, স্থান: প্রতাপনগর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ।

১৫ দেশ বাংলা পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১, সংগৃহীতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা. ৪০৭

যুদ্ধকালে শিক্ষা কার্যক্রম: পাক বাহিনী অধিকৃত এলাকায় স্কুল-কলেজ গুলোর এক প্রকার বন্ধ ছিল। স্কুলগুলোতে ৫০০-৬০০ জন শিক্ষার্থীর মাত্র ২/১ জন মাঝে মধ্যে ঘুরতে আসত। বোর্ড পরীক্ষার সময় ছাত্ররা যাতে অংশ গ্রহণ করে এজন্য ভীতি প্রদর্শন করা হলেও খুব অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল। যারা পরীক্ষায় অংশ নেয়নি সরকার তাদের পিতা মাতার কাছে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করে। কলেজগুলোতে কিছু কিছু ছাত্র মাঝে মধ্যে এসে সময় কাটাত যাদের বেশিভাগই অবাঙালি। তবে তারা ক্যান্টিন ও কমনরুমের দিকেই বেশিরভাগ সময় কাটাত।[১৬] কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি বলেছেন যে, স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। একাত্তর সালের নির্ধারিত পরীক্ষা হয়েছিল বাহাত্তর সালে। [১৭] কোনও কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে জানা যায় যে, স্কুল কলেজ বন্ধ না থাকলেও কেউ যেতনা। তবে গ্রামের থেকেও শহরের স্কুলগুলো বন্ধ ছিল। গ্রামে সে সময় পর্যাপ্ত স্কুল না থাকায় শহরের স্কুলেই গ্রাম থেকে আগত শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। ২৫ মার্চের পর শহর খালি হয়ে গেলে তারা গ্রামে চলে যায়। তবে পাকিস্তান সরকার চাইত স্কুল কলেজ খোলা থাকুক। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক আছে এটা বিশ্ববাসীকে দেখানো যায়। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দুইবার হয়। প্রথম বার হয় যুদ্ধের মধ্যে আর দ্বিতীয় বার হয় যুদ্ধ সমাপ্তিতে।[১৮]

৫.২ মুক্তিযুদ্ধকালীন নিরাপত্তা সংকটে দেশবাসী

মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুরো বাংলাদেশ ছিল কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করলে, বাঙালির সচেতন অংশ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ- "যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ো"- মূলমন্ত্রে উদ্বেলিত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতা বিরোধীরা ছাড়া দেশের সর্বস্তরের মানুষ নিরাপত্তা সংকটে সময় পার করেছিল। যেকোন সময় জীবন চলে যাবে এমন আতঙ্ক বিরাজ করত। রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পেলে সেই বাড়ি সহ আশে-পাশের বাড়ি জ্বালিয়ে দেত। রাজাকাররা দিনের বেলা বেশি চলাফেরা করত। রাতে তারা বের হত না। মুক্তিযোদ্ধাদের চলাফেরা রাতেই বেশি ছিল।[১৯]

---

১৬ বাংলার বাণী, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, মুজিবনগর, ৪র্থ সংখ্যা। সংগৃহীত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা. ২৪১।

১৭ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান ফকির(৮০), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৮/০৬/২০২১, স্থান: আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

১৮ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ (৭২), *প্রাগুক্ত*।

১৯ ঐ।

অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, আতঙ্কে মানুষ রাতে বাতি জ্বালাত না। বাতি জ্বালানো টের পেলে পাক সেনারা রাজাকারদের মাধ্যমে সে বাড়িতে আসত। সুন্দরী কন্যা পেলে তুলে নিয়ে গিয়ে লালসা পূর্ণ করত। মানুষ আতঙ্কে বাজার ঘাটে কম যেত। পাক সেনারা বাজারে আসলে মানুষ চোখের পলকেই সরে পড়ত। পাক সোনরা ঝোপ ঝাড়, জঙ্গল খুব ভয় পেত। তারা আশঙ্কা করত যে, এগুলোর মধ্যে মুক্তিফৌজ লুকিয়ে থেকে তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে। এজন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্দেশে জঙ্গল ও খালে-বিলে হওয়া কচুরিপানা পরিষ্কার করতে হত। পাক সেনাদের ভয়ে তরুণ-যুবকরা খেলাধুলা করত না। যাদের ছেলে যুদ্ধে গেছে তারা বেশি আতঙ্কে থাকত। কারণ, রাজাকার বা পাক সেনারা এই খবর জানতে পারলে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের উপর ভয়ঙ্কর শাস্তি নেমে আসত। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়দেরও আতঙ্কে কাটাতে হত।[২০]

এর বাইরে আতঙ্কে থাকত দল হিসাবে আওয়ামী লীগের অনুসারীরা। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকত। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা ভারতে যাবার সময়ে আতঙ্কে থাকত। পথে কেউ তাদের গন্তব্য জিজ্ঞেস করলে আত্মীয়ের বাড়ী যাবেন -বলে জানাতেন। কৃষকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছিল। হিন্দুর জমি চাষ করলে রাজাকাররা সন্দেহ করবে এমন সব ভয় ছিল।[২১]

যুদ্ধকালে নিরাপত্তা এমন ছিল যে, ঘড়ি বা দূর থেকে দৃষ্টি পড়ে এমন কিছু পরে মানুষ সাধারণত রাতে বাইরে বের হত না। কারণ সেটা দূর থেকে আসা আলোয় পড়লে রাজাকার বা পাক সেনারা বাঙালিদের উপস্থিতি জানতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধরা রাতে ছদ্মবেশে চলাফেরা করত। কখনো গাছের ডাল-পালা গায়ের উপর দিয়ে এমনভাবে চলত যেন মানুষের উপস্থিতি টের না পাওয়া যায়। ছদ্মবেশে চলার বিভিন্ন স্থানীয় বা আঞ্চলিক নাম ছিল। যেমন, বান্দর চাল (বানরের মত সাজা), ভুত চাল (ভুতের আকৃতি ধারণ) ইত্যাদি।[২২] সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ত্রিমোহনা নদীতে পাক বাহিনীর গানবোট তিন নদীর তিন দিকে তাক করা থাকত। যার কারণে মানুষ আতংকে থাকত।[২৩] ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা নিরাপত্তা সংকটে ঠিকমত ব্যবসা করতে পারত না। যুদ্ধের শুরুর দিকে বাঙালি মালিকানাধীন আড়ত গুলোতে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা হয় লুটপাট করেছে নতুবা আগুন

---

২০ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*।

২১ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর করিম (৭৩), তারিখ: ২৭/০৫/২০২১, স্থান: মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

২২ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ কচি (৭০), তারিখ: ১৮/০৬/২০২১, স্থান: সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ।

২৩ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন : মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান (৭২), তারিখ: ১৮/০৬/২০২১, স্থান: সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ।

ধরিয়ে দিয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীরা রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। কোথাও কোথাও আবার রাজাকার ও পাক বাহিনীর সদস্যরা দোকানদারের কাছে এসে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ দাবী করে ও তা না দিলে অথবা দিতে বিলম্ব হলে মারধর এমনকি হত্যা করতেও পরোয়া করত না। নিরাপত্তাহীনতা আশঙ্কায় বেশিরভাগ দোকানদার দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[২৪]

৫.৩ শরনার্থীদের নিরাপত্তা

"ইছামতীর তীরে সারি সারি নৌকা নোঙর করেছে অনেক দিন হল। কিন্তু ঐসব নৌকোর মধ্যে যারা রয়েছে, তারা যে এরপর কোথায় পাড়ি দেবে তা তারা জানে না। অন্য কেউ কি জানে?'[২৫] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশের মধ্যে যেসব মানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় শরনার্থী সমস্যা তাঁর মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে সীমান্তবর্তী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুপ্রবেশ শুরু হয়। শরনার্থীরা মুলত মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে সীমান্তবর্তী ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করে। শরনার্থীদের বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। কেউবা আবার গরুর গাড়ি, সাইকেল, রিক্সা, মোটরগাড়ি ও নৌকাযোগে সীমান্ত অবধি পৌঁছায়। উত্তরবঙ্গ ও পদ্মাপাড়ের পশ্চিমাংশ থেকে আগত শরনার্থীরা আশ্রয় গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী থেকে আগত শরনার্থীরা ত্রিপুরায়, সিলেট থেকে আগত শরনার্থী ঢল আসামে, বৃহত্তর ময়মনসিং থেকে আগতলার মেঘালয়ে আশ্রয় নেয়।[২৬]

এ সময় ভারতীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য সমূহে একটা নির্দেশনা প্রদান করে। নির্দেশনানুযায়ী Foreigners Act 1946 এর সেকশন ৩ অনুসারে শরনার্থীদের যাচাই বাছাই পূর্বক নিবন্ধন করতে বলা হয়। এর পাশাপাশি শরনার্থীদের তিন মাসের জন্য ভারতে বসবাসের অনুমতি ও ত্রান সাহায্য প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়। [২৭]

---

২৪ বাংলার বাণী, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, সংগৃহীতঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা.২৩৯।

২৫ যুগান্তর, ৩ এপ্রিল, ১৯৭১, সংগৃহীতঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠা. ৫৪২।

২৬ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, 'মুক্তিযুদ্ধে শরনার্থী সমস্যা মোকাবিলায় ভারত সরকারের ভুমিকা', অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, তৃতীয় পর্ব- পৃ. ৩২৬।

২৭ K C Shaha, `The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East', in Ranabir Samaddar (ed.) *Refugee and the State: Practices of Asylum and care in India 1947-2000*, New Delhi, Sage Publication, India, 2003, p.112.

সারণি- ১৬

বিভিন্ন প্রদেশে শরনার্থী অনুপ্রবেশ

প্রদেশ/রাজ্য	মোট শরনার্থী
পশ্চিমবঙ্গ	৭৪৯৩৪৭৪ জন
ত্রিপুরা	১৪১৬৪৯১ জন
মেঘালয়	৬৬৭৯৮৬ জন
আসাম	৩১২৭১৩ জন
বিহার	৮৬৪১ জন

উৎস: Bangladesh Documents, vol.2 (New Delhi: Ministry of External Affairs, India, 1972), p.81

সারণি- ১৭

শরনার্থী প্রতিস্থাপনের পর বিভিন্ন রাজ্য/ প্রদেশে শরনার্থীদের সংখ্যা

প্রদেশ/রাজ্য	ক্যাম্পের সংখ্যা	ক্যাম্পে থাকা শরনার্থী	ক্যাম্পের বাইরে থাকা শরনার্থী	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৪৮,৪৯,৭৮৬ জন	২৩,৮৬,১৩০ জন	৭২,৩৫,৯১৬ জন
ত্রিপুরা	২৭৬	৮,৩৪,০৯৮ জন	৫,৪৭,৫৫১ জন	১৩,৮১,৬৪৯ জন
মেঘালয়	১৭	৫,৯১,৫২০ জন	৭৬,৪৬৬ জন	৬,৬৭,৯৮৬ জন
আসাম	২৮	২,৫৫,৬৪২ জন	৯১,৯১৩ জন	৩,৪৭,৫৫৫ জন
বিহার	৮	৩৬,৭৩২ জন	-	৩৬,৭৩২ জন
মধ্যপ্রদেশ	৩	২,১৩,২৯৮ জন	-	২,১৯,২৯৮ জন
উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯ জন	-	১০,১৬৯ জন
সর্বমোট	৮২৫	৬৭,৯৭,২৪৫ জন	৩১,০২,০৬০ জন	৯৮,৯৯,৩০৫ জন

উৎস: Bangladesh Documents, vol.2 (New Delhi: Ministry of External Affairs, India, 1972), p.81.

ক) শরনার্থীদের নিরাপত্তা সংকট: দেশের বাইরে

দৈনিক আনন্দ বাজার, ৮ জুন তারিখে 'অনাহারে পথশ্রমে, অবসন্ন মৃতপ্রায় শরনার্থীদল' শিরোনামে যে প্রতিবেদন করে সেখানে শরনার্থীদের অবর্ণনীয় চিত্র ফুটে ওঠে।

> "স্যার, একবার বলে দিন, এই স্লিপ দিয়ে কোথায় গেলে রেশন পাব? কলকাতা থেকে টাকি, টাকি থেকে হাসনাবাদ, হাসনাবাদ থেকে বশিরহাট, বশিরহাট থেকে বারাসাত, বারাসাত থেকে দমদম, তারপর লবণহ্রদ, তারপর? শত শত লোক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এবং শিশু এই একটি প্রশ্ন মুখে নিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন শিবিরে এরা যাচ্ছে। প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আর হাটছে, হাটছে মাইলের পর মাইল। হাটছে দিনরাত। তারপর অনাহারে পথশ্রম, যারা অপেক্ষাকৃত দূর্বল, অবসন্ন তারা বসে পড়েছে পথের ধারে, মরছে। বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সমস্যা প্রকট হয়েছে। যথাঃ ১। জ্বালানী, ২। শৌচাগার এবং ৩। পানীয় জল। গত সপ্তাহ থেকে মহামারী আকারে যে উদরাময়, চোখের রোগ, ব্রঙ্কাইটিস, হাম, বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে।[২৮]

শরনার্থী সমস্যাটি উদ্ভুত হওয়ায় ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে সেভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। এরকমই দুটি রাজ্য ছিল ভারতের আসাম ও মেঘালয়। ব্যাপক সংখ্যায় শরনার্থী প্রবেশের ফলে এই রাজ্য দুটিতে সামাজিক নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি ছিল।[২৯] ভারতের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে আশংকা করা হচ্ছিল যে, শরনার্থীদের অনুপ্রবেশের সাথে পাকিস্তানী চর ভারতে ঢুকে পড়ে ভারতে নাশকতার চেষ্টা করতে পারে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান ও পূনর্বাসন মন্ত্রী আর. আর. খালিদকারের দেওয়া বক্তব্যে সেরকম আশঙ্কার পুনরাবৃত্তি মেলে- 'শরনার্থীদের সাথে পাকিস্তানী চরের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের যাচাই করা হচ্ছিল।'[৩০]

মে মাসের পর থেকে আসামে পাকিস্তানি সমর্থকদের নাশকতা ও দুস্কৃতির কিছু নমুনা পাওয়া যায়। মে মাসের ৮ তারিখে ত্রিপুরার লে. গভর্নর এল ডায়াস নাশকতার ব্যাপারে শরনার্থীসহ রাজ্যবাসীকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান। ১৯৭১ সালের ১৫ মে আসামের অর্থমন্ত্রী কে পি ত্রিপাঠী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, অনুপ্রবেশকারী শরনার্থীদের সাথে পাকিস্তান গোয়েন্দা ও নাশকতা সৃষ্টিকারীদের প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কাছাড় জেলায় এই

---

২৮ দৈনিক আনন্দ বাজার, ৮ জুন, ১৯৭১।

২৯ দিব্যদ্যুতি সরকার, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরনার্থীঃ আসাম ও মেঘালয়ের ভুমিকা,' অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, তৃতীয় পর্ব, পৃ. ৩৮৪।

৩০ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১২ খন্ড, পৃ. ২২৪।

নাশকতাকারীরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আসাম ও বিহারে আবার তারা বাঙালি বিরোধী দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। এজন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তিনি বলেন, দুষ্কৃতকারীরা শিল্প-স্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করতে পারে।[৩১]

১৯৭১ সালের ১৮ জুন তারিখে তিনি বলেন, শরনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আসামে বাঙালি বিরোধী মনোভাব দানা বাধে। বিক্ষুব্ধ জনতা বাঙালি বিরোধী মিছিল 'ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ' শ্লোগানও সেখানে শোনা যায়। যে কারণে এটাকে বাংলাদেশ বিরোধী কাজ বলে গণ্য করা হয়।[৩২]

আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহর চৌধুরী ২ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপকালে জানান যে, আসামের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য সন্দেহভাজন পাকিস্তানিরা বিধ্বংসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, কাছাড় জেলায় দুষ্কৃতকারীরা একটি ট্রেন পুড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। যে অভিযোগের ভিত্তিতে আসাম সরকার দুষ্কৃতকারী বলে সন্দেহজনক এমন ৫০ জনের অধিক পাকিস্তানি চরকে গ্রেফতার করেছেন মর্মে তিনি অবহিত করেন।[৩৩] শরনার্থী শিবিরগুলোতে আবার পর্যাপ্ত ঔষধ, রোগ প্রতিরোধক টিকা, ইনজেকশনের ঘাটতির পাশাপাশি পর্যাপ্ত ডাক্তার ছিল না। মৃতদেহ সৎকার তেমন ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে রোগে-শোকে ভোগা মৃত শরনার্থীদের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করা ছাড়া উপায় ছিল না।[৩৪] মার্কিন কবি এলেন গিন্সবার্গ 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতায় তুলে ধরেন শরনার্থীদের শোকগাঁথা[৩৫]–

শরনার্থী শিবিরে হাসপাতালের মত পরিবেশ
সদ্যোজাত শিশু চুষে খাচ্ছে মায়ের শুকনো স্তন এবং শিশুটি উলঙ্গ
সাতদিনের শিশু, বানরের মত ছোট, বাতজ্বরগ্রস্থ চোখ,
পেট ও আন্ত্রিক পীড়া, রক্তে বিষ, হাজারে হাজারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী!
.....
খড়োঘরে কাঁদামাটির মেঝেয় কান্নার শব্দ

৩১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১২ খন্ড, পৃ. ২২৪।
৩২ ঐ. পৃ. ২২৪।
৩৩ ঐ, পৃ. ২৯৫।
৩৪ কম্পাস (পত্রিকা), ১২ জুন, ১৯৭১। সংগৃহীতঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১১ খন্ড, পৃ. ২৯০।
৩৫ আতাউল করিম, 'একাত্তরের শরনার্থী শিবির ও একটি কবিতার জন্ম,' অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

বৃষ্টিতে ভেজা নোংরা কর্দমাক্ত মাঠে মোটা পাইপের ভিতর ঘুম
জলের কলের ধারে অপেক্ষা-ডাকো, বিশ্বের চেতনাকে ডাকো!
কার শিশু এখনো মায়ের হাতের বাকে ক্ষুধায় আর্ত!

খ) দেশের ভিতরে শরনার্থীদের নিরাপত্তা সংকটঃ

শরনার্থীদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের টার্গেট ছিল। কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভারত দ্বারা উদ্ভাবিত এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভারতের প্রতি দূর্বল। তাছাড়া নির্বাচনে তারা শেখ মুজিবকে বেশি ভোট দিয়েছে। তাই তাদের উপর অত্যাচার ও তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা গেলে দেশে স্থিতিশীলতা আসবে।[৩৬] শরনার্থীদের কয়েক ধরনের শংকা ছিল। তাঁর মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ভয় ছিল পাক আর্মির ভয়। পাশাপাশি ছিল ডাকাত, লুটেরা ও পিস কমিটির লোকদের ভয়।[৩৭] রাজাকারদের সামনে পড়লে তারা মালামাল লুট করার পাশাপাশি হত্যা করত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায যে, শরনার্থীদের কাছ থেকে মালামাল লুঠ করে তবে ওপারে পার করে দিয়েছে।[৩৮] তবে যাত্রাপথে বেশি সমস্যা ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু ও গর্ভবতীদের। যাত্রাপথেও তাদের অনেক সময় নানা রকম অসুখে পড়তে হত। যেমনঃ ডায়রিয়া, সন্তান প্রসাব, কালাজ্বর প্রভৃতি। শরনার্থীরা রাতে বেশি চলাচল করত। দিনের বেলা তুলনামুলক কম চলাচল করত। সেনাবাহিনী রাতে বের হত না। কারণ, তাদের ভয় ছিল যে, মুক্তিযোদ্ধারা রাতে আক্রমণ করলে তাদের ক্ষতি হবার আশংকা বেশি হবে। হিন্দু জনগোষ্ঠী ভারতে চলে যাবার সাথে আর্থ-সামাজিক কারণ ও জড়িত ছিল বলে মনে করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্তের যারা তারা বেশি লুটতরাজের শিকার হয়েছে। আবার বাড়ি আক্রমনের পরে যেসব হিন্দু প্রাণে বেঁচে ছিল তারা নিশ্চিতভাবেই ভারত চলে যায়। তবে হিন্দুরা দেশ ছাড়ার সময় কেউ কেউ তাদের পরিবারের সবাইকে নিতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক আত্মীয়কে তাদের বাস্তুভিটায় রেখে চলে গেছে স্বজনরা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়স্কদের কোনও আত্মীয়ের বাড়ী রেখে গেছে।[৩৯]

---

৩৬ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*।
৩৭ আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।
৩৮ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ, *প্রাগুক্ত*।
৩৯ আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪৪।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় হিন্দুরা কেউ কেউ সোনা-দানা মাটির অনেক গভীরে পুতে রেখে যায়। পিতল ও কাসার আসবাবপত্র ও মাটির নীচে পুতে রেখে যেত। গৃহপালিত পশু পরিচিতজনদের কাছে রেখে যায়। হিন্দুরা যেসব ঘর রেখে যেত তার সমস্ত উপকরণ লুট করে নিয়ে যেত রাজাকার ও স্থানীয় দস্যুরা। এমনকি ঘরের আড়াও বাদ যেতনা। শরনার্থীদের মধ্যে থেকে সুন্দরী নারীদের পিস কমিটির সদস্যরা নিয়ে চলে যেত। কেউ বাঁধা দেবার সাহস পেত না। স্বর্ণালঙ্কার পাবার জন্য শরনার্থী নারীদের গোপনাঙ্গ পর্যন্ত সার্চ করত। লজ্জাস্থানও বাদ যেত না।[৪০]

৫.৪ মুক্তিযুদ্ধকালে চিকিৎসা ব্যবস্থা: শরনার্থীদের 'জয়বাংলা' রোগ

যুদ্ধ চলাকালে দেশের মধ্যে যারা ছিল তারা এক আতংকগ্রস্থ জীবন অতিবাহিত করছিল। গ্রামে সাধারণত যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলঃ জ্বর, সর্দি, কাশি, আমাশয়, কলেরা, বসন্ত, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগ। তবে এর পাশাপাশি হামও দেখা দিত। তবে এর বাইরে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত, ডাকাতি কিংবা লুট করতে গিয়ে আহত ব্যক্তিরা ডাক্তারের কাছে আসত। গ্রাম এলাকায় এসব রোগের চিকিৎসা সাধারণত পল্লী চিকিৎসকরাই করত। তুলনামুলক ছোট আঘাতের রোগীদেরকে পল্লী চিকিৎসকরা সেবা দিতেন। বড় ক্ষত বা আঘাতের রোগীদেরকে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে শহরে নেওয়া হত। অসুস্থ হলেও দোকানে ঔষধ পাওয়া যেত না। মিলিটারির ভয়ে মানুষ ঔষধ কিনতে পারত না।[৪১]

চিকিৎসা সম্পর্কে আফসান চৌধুরী তাঁর গবেষণায় গ্রামের একজন ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। ডাক্তারের নাম ছিল নৃপেন্দ্রনাথ দাস। প্যারামেডিকেল থেকে পাস করা এই ডাক্তার যুদ্ধের আগের মতই তিনি চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। তবে তিনি সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতেন। প্রয়োজন অনুসারে সবখানে তিনি পায়ে হেঁটেই যেতেন। সে সময় সর্দি, কাশি, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগে চিকিৎসা করতেন তিনি। পাশাপাশি হাতকাটা, গুল খাওয়া, পেটফাড়া, মুক্তিযোদ্ধা, ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত গৃহস্থ, লুটেরা প্রভৃতি রোগীদেরও তিনি চিকিৎসা করেছেন।[৪২]

---

৪০ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*।

৪১ আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

৪২ ঐ, পৃ. ৩২।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সেক্টরে ও সাবসেক্টরে ড্রেসিং স্টেশন নির্মান করা হয়। আহত ও অসুস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড ও বেসামরিক হাসপাতালে প্রেরণ করাই এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের রুটিন কাজ ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড ও সামরিক হাসপাতাল সমূহ এ সংক্রান্ত কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক সংগঠন ও সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঔষধপত্র পেত। বিশ্রামগঞ্জে ২৮০ শয্যাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ফোর্সেস হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতাল যখন শুরু হয় তখন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রয়োজনীয় ঔষধ, যন্ত্রপাতি, অর্থ ও ডাক্তার দিযে সাহায্য করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর মোট ১০ জন ডাক্তার বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিল। বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত যেসকল শিক্ষার্থী ভারতে অবস্থান নিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন সেক্টর ও সাবসেক্টরে মেডিকেল এসিসট্যান্ট নিয়োগ করা হয়।[৪৩] টেলিগ্রাফ পত্রিকার বরাত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হিরালাল শাহা জানান যে, কলেরা পশ্চিমবঙ্গের শরনার্থী শিবির গুলোতে মহামারি আকার ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তবর্তী ৮০০ মাইল এলাকাব্যাপী ১০-১২ হাজার কলেরা রোগী ধরা পড়েছে। শরনার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৫৫০ জন ইতোমধ্যে কলেরায় মারা গিয়েছে। [৪৪]

মুক্তিবাহিনীর মিলিটারী ক্যাম্প গুলোতে অনেক বেইজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এরকম একটি ফিল্ড হাসপাতালের নাম ছিল 'বাংলাদেশ' যেটি কুমিল্লা সেক্টরে পূর্ণ উদ্যোমে কাজ করে। ব্রিটেনের বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ৬ জন ডাক্তার ও মেডিকেল কলেজে ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ৪জন শিক্ষার্থী ও ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবী নার্স নিয়ে এই হাসপাতাল চালু ছিল। আব্দুল মোবিন চৌধুরী নামক একজন বাঙালি যুবক ডাক্তার লন্ডনে তাঁর ডাক্তারি প্রাকটিস বাদ দিয়ে এই হাসপাতাল পরিচালনায সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে। এই বেইজ হাসপাতালের অধীনে ১২ টি সাব-সেক্টর মেডিকেল সেন্টার ছিল। যেগুলো মাঠপর্যায়ে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। এগুলোতে ফার্ষ্ট এইডে দক্ষ দুজন স্ট্রেচার বাহক থাকত যাদের কাজ ছিল আহতদের দ্রুত সাবসেক্টরের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া। যাদের আঘাত সামান্য থাকত তাদেরকে তাবুর মধ্যে মেডিকেল সেন্টারে একজন ডাক্তার ও একজন সহকারীর মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হক। আর যাদের আঘাত একটু মারাত্মক হত তাদেরকে বেইজ হাসপাতালে পাঠানো হত। বেইজ হাসপাতালে ১০০ রোগীর ধারণ ক্ষমতা ছিল। যার মধ্যে শতকরা ৮০ শতাংশ ছিল যুদ্ধাহত আর বাকী

৪৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, ১২ খন্ড, পৃ. ৫২৬।
৪৪ টেলিগ্রাফ (পত্রিকা), ৫ জুন, ১৯৭১।

২০ শতাংশ ছিল মারাত্মক আহত। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এই বেইজ হাসপাতালে ১০ হাজার যোদ্ধাকে সেবা দেওয়া সক্ষম হয়।[৪৫]

পূর্ব বাংলা থেকে যারা শরনার্থী হিসাবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে তারা নানাবিধ মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের চোখ ওঠা রোগ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, এই রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হতে শুরু করে। তবে আক্রান্তদের মধ্যে শরনার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষও ছিল। বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করেছিল বলে এর নাম হয়েছিল 'জয় বাংলা' রোগ। তবে 'জয় বাংলা' বলতে তখন পশ্চিম বাংলার মানুষ পূর্ব বাংলার মানুষকে বোঝাত। পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী মানুষের কাছে এটা ছিল একটা আবেগের বিষয়। কলকাতার মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া কাউকে 'বাড়ি কোথায়?'- জিজ্ঞেস করলে তাঁর উত্তরে 'বাংলাদেশ' বললে তারা খুব আপ্যায়ন করত।[৪৬]

তবে একাত্তরে চোখ ওঠা রোগ কত মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে এ কারণে এ রোগে জনজীবন সঙ্গিন হয়ে পড়ে। যেমন, রেলওয়ে কর্মীদের এত বিপুল সংখ্যক এই রোগে আক্রান্ত হয় যে, ট্রেন বন্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। সংক্রমণের আশংকায় ফুটবল ম্যাচ বাতিল করা হয। স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৩ জুন, ১৯৭১ সংখ্যায় লিখেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে ২/১ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। বাজারে চোখ ওঠা রোগের ঔষধ রঙিন চশমার ঘাটতি দেখা দেয়।[৪৭]

'জয় বাংলা' রোগ একাত্তরে কত ভয়াবহভাবে পশ্চিমবঙ্গকে কাবু করে ফেলেছিল তাঁর প্রমাণ মেলে ১৯৭১ সালের ৪ জুন দৈনিক যুগান্তরের একটি খবরে। চোখের রোগে ট্রেন বন্ধের আশঙ্কা শিরোনামের খবরটিতে বলা হয় যে, চোখ ওঠা রোগে রেলওয়ের বহু সংখ্যক কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে কর্মরত ৪৯ জন গার্ড চোখ ওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে ছুটিতে আছে। এছাড়া বুকিং ক্লার্কদের মধ্যে অনেকেই আক্রান্ত। ছুটিতে থাকা ২৭ জন কর্মীর ছুটি বাতিল করেও ট্রেন চলাচাল স্বাভাবিক করা সম্ভব হচ্ছে না।[৪৮] জয় বাংলা রোগ, কলারোয়া, ডায়রিয়া ও অন্যান্য সংক্রমিত রোগের

৪৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, ১২ খন্ড, পৃ. ৫০৬
৪৬ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ, *প্রাগুক্ত*।
৪৭ চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০১৯, পৃ. ৫০
৪৮ *ঐ*, পৃ. ৪২

প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও কলকাতার সাধারণ মানুষ শরনার্থীদের পাশে দাঁড়ায়। ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্নভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দিয়ে তারা পাশে থাকে।[৪৯] চোখ ওঠা রোগের খবর পশ্চিম বঙ্গ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা ১৩ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখে যে খবর ছাপে তাতে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের এই রোগ হবার কথা বলা হয়।[৫০]

মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ শরনার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী শরনার্থী সংখ্যা ১৪,১৫,৬১১ জন। এই রাজ্যে শরনার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য সেবায় ভুমিকা রেখেছিল মুলত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি হাসপাতাল, স্থানীয় সিনিয়র নার্স ও স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত অন্যরা। '৭১ এ মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের শরণার্থীদের জন্য ৯১ জন ডাক্তার, ৯৫ জন কম্পাউন্ডার, ৭৫ জন প্যারামেডিকেল স্টাফ ও ২১ জন নার্স সহ ৭১৩ জন চিকিৎসা কর্মীকে নিয়োগ দেন। [৫১] এছাড়া আসামের করিমগঞ্জে ৩ লক্ষ শরনার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। শিলচর মেডিকেল কলেজ, করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল, হাইলাকান্দি জেলা হাসপাতাল সহ সরকারি অন্যান্য হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা এসময় অসুস্থ্য শরনার্থীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।[৫২]

৫.৫ প্রতিরক্ষায় সাধারণ মানুষের ভুমিকা

যুদ্ধকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর মত সাধারণ মানুষও ভুমিকা রাখে। প্রতিরক্ষায় সাধারণ মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ- দু'ভাবে ভুমিকা রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিভাবকেরা সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়ে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকত। যেকোনো সময় রাজাকার বা শান্তি কমিটির সদস্যরা তাদের বাড়ি আক্রমণ করতে পারে এই ভয় থাকত তাদের মনে। এটাও এক ধরনের ত্যাগ বলা যায়।[৫৩] ১৯ মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে পাহারারত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর (ইপিআর) একটি দলকে নিরস্ত্র করতে গেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সরকারি হিসাবে ২ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

---

৪৯ ঐ, পৃ. ৫০
৫০ ঐ, পৃ. ৫০
৫১ ঐ, পৃ. ৯১
৫২ ঐ, পৃ. ১৩১
৫৩ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহন: মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ, *প্রাগুক্ত*।

আওয়ামী লীগের হিসাবে ১২০ জন নিহত হয়।[৫৪] মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ দ্রুত অংশ গ্রহণ করে। আল্প সময়ের প্রশিক্ষণে ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, যুবক-তরুণ, নারী-পুরুষ সৈনিক হিসেবে নিজেদের পরিচিত করেছিল।[৫৫] মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহন করে সেটি এইচ টি ইমামের বক্তব্যে আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

> "১৯৭১ সালে আবাল বৃদ্ধ বণিতা মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি এগিয়ে গিয়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সকল স্তরের মানুষ যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, বহন করেছে রসদ। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলার জন্য নিজেরাও অস্ত্র তুলে নিয়েছে। বাংলাদেশের চারিদিকে গড়ে ওঠা অজস্র আশ্রয় শিবির পরিণত হয়েছে যুব শিবিরে। সেখান থেকে বের হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা। সম্মুখ সমর, গেরিলাযুদ্ধ, শত্রুর উপর আকস্মিক ঝাপিয়ে পড়া, সড়ক সেতু, বিদ্যুৎ লাইন ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন, সরবরাহ লাইন গুড়িয়ে দেওয়া, তথ্য সংগ্রহ, গোয়েন্দাগিরি, চিকিৎসা সেবা প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ইউনিটে সংযোগ স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র-ভান্ডার গড়ে তোলা, হেন কাজ নেই যা আমাদের বীর জনগণ করেনি। ছাত্র-শিক্ষক, যুবক, কৃষক শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সকলেই এই কাতারে শামিল ছিল- নির্ভয়ে এবং স্বেচ্ছায়।"[৫৬]

কৃষক ও গ্রামবাসীদের মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ বিষয়ে কাদের সিদ্দিকী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন নিজ জবানীতে। ১৯৭১ সালের ৮ মে এলাকায় প্রচার হয়েছিল যে, মুক্তিবাহিনীতে লোক নেওয়া হবে। এই প্রচারের পরে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। সেটা লেখকের বর্ণনায় ফুটে ওঠে।

> "আমি একটি চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অনুরোধ জানালাম", যারা আমাদের সাথে শরিক হতে চান, সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হতে চান, তারা মাঠের বা-পাশে আমার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়ান। এই কথা বলার পর শুরু হয়ে গেল লাইনে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা। কার আগে কে দাঁড়াবেন, এই নিয়ে কুলুচ্ছেনা। আবার তৃতীয় সারি। হিসাব করে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য সাতশ'র উপর লোক দাঁড়িয়েছেন। বাকীরা অন্যদিকে গাদাগাদি করে

---

৫৪ এন্থনি মাসকারেনহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

৫৫ মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী,' মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ভুমিকা', শামসুজ্জামান খান ও অজয় রায় (সম্পাদিত) *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, ৩য় পর্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা , পৃ. ১৭৮।

৫৬ এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৩৬।

অপেক্ষা করছেন। তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাৎক্ষণিকভাবে নয়, বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে অথবা টুকিটাকি কাজ সেরে। লাইনে দাঁড়ানো শ'সাতেক লোককে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনারা সত্যি কি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবেন? হাসিমুখে জীবন দিতে পারবেন? মুক্তিযোদ্ধা হতে অনেক কষ্ট আছে। প্রতিদিন ত্রিশ-চল্লিশ মাইল হাটতে হতে পারে। মাঝে মধ্যে দিনের পর দিন খাবার না পাবার অনিশ্চয়তাও আছে তাছাড়া আছে শত্রুর হাতে জীবন যাবার ভয়। ভাল করে ভেবে দেখুন। এগুলো যারা পারবেন তারা আর একটু এগিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ান। যাদের অসুবিধা আছে তারা একটু ভেবে দেখুন। যুদ্ধ তো কেবল শুরু। অনেক সময় পড়ে আছে। কচে শেষ হবে আল্লাহ মালুম। বাছাই শুরু হল। জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, না-খেয়ে থাকতে পারবে তো? গুলি শব্দ শুনলে ভয় পাবে না? পঁচিশ মাইল একটানা হাটতে পারবে? সব পারব। সবার এক কথা, একই জবাব! বার পিঠে কষে দু'তিন ঘা বেত মারা হল। কিন্তু মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কালিমা নেই। কেউ একটু উহ-আহ করল না। পরে তাঁর জামা উঁচু করে দেখা গেল, পিঠে প্রতিটি আগাহতের দাগ বেত্রাঘাত। এক ধরনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ফেল করলে অথবা ভয় পেয়েছে এটা প্রকাশ পেলে সে হয়ত মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবে না। অন্য সবারই একই ভয়।" [৫৭]

পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় একেবারে সাধারণ নিম্নবিত্তের মানুষও অংশ নেয়, কাদের সিদ্দিকী যেমনটা বলেছিলেন।[৫৮]

"মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগই ছিলেন কৃষক-শ্রমিক, মেহনতি, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশ প্রেমিক সারা দেশের সব প্রান্ত থেকে এক আদর্শের মোহনায় মিলিত হযেছে। তাদের কোনো পিছুটান নেই। আছে শুধু সামনে চলা, দেশ, লড়াই, স্বাধীনতা। তাদের কাছে সব চেয়ে সুখবর, হানাদাররা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। সবচেয়ে দঃখের খবর, কোনো সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছে। তাদের কাছে মূল্যবান তথ্য, শত্রু সেনাদের অবস্থান ও গতিবিধি। তাদের ধ্যান, খান সেনাদের খতম ও উচ্ছেদ করা। অন্য সব বৃত্তান্ত তাদের কাছে জলো, কোনো মূল্য নেই। গ্রামের কৃষক ও সাধারণ মানুষ সবাই সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ না করলেও তারা বিভিন্ন ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। নিজেরা না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার খাইয়েছেন, মুক্তযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, পথ চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করছেন, অস্ত্র সংরক্ষণ ও তা গোপনস্থানে

৫৭ কাদের সিদ্দিকী বীরত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৬-৯৭
৫৮ ঐ, পৃ. ১০৪

লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেবার পাশাপাশি উৎসাহ দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো কৃষক সরাসরি যুদ্ধও করেছেন।" [৫৯]

যুদ্ধের সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সাধারণ মানুষ কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কাদের সিদ্দিকীর এক বর্ণনায় তার বাস্তবতা মেলে।

"হানাদার বাহিনীর গতিরোধের লক্ষ্যে গেরিলা অপারেশনের জন্য চারান গ্রামের দিকে এগুতে থাকলে জোয়াইরবাসীরা পানি, মুড়ি ও পিঠা আলু নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, "আপনাদের ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পানি খেয়ে যান। শরীরে বল না থাকলে কি যুদ্ধ করা যায়?" তাদের অনুরোধ বা আবদার শেষ হবার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা পানি পান শুরু করে ছিল। তারা খুব পিপাসার্ত। সেই সকালে নাস্তার পরে আর কিছু খায়নি। নাগবাড়িতেও খাওয়া হয়নি। ক্ষুধার জালায় সবাই কাতর মুহ্যমান। চিড়া, মুড়ি, পোড়া, আলু, যে যা পাচ্ছে গোগ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ দুধ এনে মুক্তিযোদ্ধাদের পান করাচ্ছিলেন।" [৬০]

গ্রাম্য কৃষক, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ও মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্ব ছিল। যুদ্ধে যাবার আগে বেবি ট্যাক্সি চালাত মতিউর রহমান। যুদ্ধ শুরু হলে দেশ মাতৃকার রক্ষার্থে ভারতের মুর্শিদাবাদে তিন মাসের ট্রেনিং নেন গরীব বাবার সন্তান মতিউর। ছিলেন সুইসাইড স্কোয়াডের একজন কমান্ডো। ট্রেনিং শেষ দেশে ফিরে দুঃসাহসী কিছু অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর খাদ্য বহনকারী বড় জাহাজ ডুবাতে সাহায্য করেছিলেন। নভেম্বর মাসের শেষে হানাদার বাহিনীকে দূর্বল করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েতে ফেরি ডুবিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধ বীরত্বের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবে ভুষিত হন। প্রতিরক্ষায় কৃষক নারীদের অবদান কম নয়। কৃষক বাবার কন্যারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করে দিয়েছেন। আবার পাক সেনাদের বিষ প্রয়োগে হত্যাও করেছেন। [৬১]

---

৫৯ মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, 'মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ভুমিকা,' শামসুজ্জামান খান ও অজয় রায় (সম্পাদিত) *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, ৩য় পর্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ. ১৮১।

৬০ কাদের সিদ্দিকী বীরত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

৬১ মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, *অশ্রু সাগরে মিলিত প্রাণ: মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৯৮।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত রান্না করে দেওয়া, গোপন সংবাদ বহন করা, যোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করে তা লুকিয়ে রাখার পাশাপাশি কেউ কেউ আবার সংগঠকের ভুমিকাও পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ কিভাবে অবদান রেখেছেন আতিউর রহমান সেটা তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন। সম্মুখ যুদ্ধে অংশ না নিয়েও কেউ কেউ যেভাবে যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে ভুমিকা রেখেছে সেটা অতুলনীয়। আতিউর রহমান যেমনটা দেখিয়েছেন: 'পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমন শুরুর পরে লক্ষ্য করা যায় যে, "গ্রামের অসংখ্য মানুষ পানি ও খাদ্য সামগ্রী হাতে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া বিপন্ন মানুষের সেবা করার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। রাত্রি যাপনের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের নিজের ঘরে জায়গা করে দিয়েছেন। বিপন্ন অনেক পরিবার দীর্ঘ সময় থেকেছেন সেসব পরিবারের সাথে। অনেক সময নিজেরা রান্না ঘরে থেকে তাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করেছেন। গায়ের দোকানি যোদ্ধাদের সঠিক পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা তাদের পথ চিনিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন। মাঝিরা নৌকাযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেছেন। মায়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার তৈরী করে দিয়েছেন। বোনেরা যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-যত্ন করেছেন।' [৬২]

আতিউর রহমান তাঁর গবেষণায় আরও দেখিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। যদিও সেই যুদ্ধে মধ্যবিত্তের ভুমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক। কিন্তু সেই জনযুদ্ধে ক্ষুদে ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, উকিল, শিক্ষকদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিল সেই নেতৃত্ব। আর এরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক তরুনদের, যাদের শতকরা ৭৮ ভাগ এসেছিল গ্রাম থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ৬০ শতাংশই ছিল ছাত্র, ১৩ শতাংশ কৃষক, ১৩ শতাংশ চাকুরে, ৮ শতাংশ ব্যবসায়ী।[৬৩]

অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট শিশুরাও সাহায্য করেছে। কারণ, শিশুদের পাক সেনা ও রাজাকাররা সন্দেহ করত না। বাদাম বিক্রেতার ছদ্মবেশে অনেক সময় ছোট্ট শিশুরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শত্রু পক্ষের সংখ্যা ও গোপন তথ্য জেনে এসেছে।[৬৪] মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে সাধারণ মানুষেরা খাবার সরবরাহ করত। সাধারণ লোকজন পান-সুপারি এমনকি বিড়ি-সিগারেটও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পৌছে দিন। কোনো কোনো সময় রাজাকাররা হিন্দুদের গরু জবাই করে তা থেকে একটা অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের

---

৬২ আবুল বারকাত (সমন্বয়ক), *একাত্তরে বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাথাঃ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ*, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১৯৩।

৬৩ আতিউর রহমান, *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.১৬-২০

৬৪ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মুক্তিযোদ্ধা জনাব মশিউর রহমান (মশু), জেলা ইউনিট কমান্ডার, সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১২/৩/২০২২, সাতক্ষীরা।

পাঠাত। অজানা কোথাও থেকে গরুর মাংস আসলে মুক্তিযোদ্ধারা মনে করত যে সেটা রাজাকাররা পাঠিয়েছে। কোথাও রাস্তা খোঁড়া থাকলে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দিত।[৬৫] সাধারণ মানুষ এলাকা ভিত্তিক গোপনে সমঝোতা রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত। কৃষকরা নজর রেখে মাঠ দিয়ে নিরাপদে পার করে দিত মুক্তিযোদ্ধাদের।

নিরাপত্তা মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষের অন্য সকল চাহিদা পূরণ হলেও নিরাপত্তার সংকট বা ঘাটতি থাকলে তা মানুষকে স্বস্তি দেয় না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও এদেশীয় তাদের সহযোগী কর্তৃক নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিত আক্রমনের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস একটানা আতঙ্ক ও ভীতিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে এ অঞ্চলের মানুষ। তবে যুদ্ধের পূর্বেও পাকিস্তানের অধীনে থাকাকালীন ২৪ বছর এ অঞ্চলের মানুষ নিরাপদে ছিল না। '৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরাপত্তা বিঘ্ন বা জনজীবন বিপন্ন হলে সরকার কর্তৃক অবহেলা, উদাসিনতা প্রদর্শন (যেমন ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস) এর মত বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। '৭১ এ যুদ্ধকালে প্রচলিত নিরাপত্তা যেমন ঘাটতি ছিল, তেমনি অপ্রচলিত নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোতেও ছিল শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। নিরাপত্তাহীনতার কারণে যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী হয়েছে তেমনি দেশে অবস্থানরত মুসলমান জনগোষ্ঠীও পাক সেনা ও রাজাকারদের নিকট নিজেদের নিরাপদ মনে করেনি। প্রতিরক্ষায় মুক্তিবাহিনী, নিয়মিত বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি নারী-পুরুষ-শিশুদের ত্যাগ ছিল অতুলনীয়। এমনিতেই কোন দেশ বা অঞ্চলে যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা যুদ্ধ বা গনহত্যা সংঘটিত হয় বা চলমান থাকে তখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে। আর নিজেদের সরকার বা শাসকেরা যখন তার জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, পরিচিত ব্যক্তি (রাজাকার হিসেবে) যখন শাসককে হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করে তখন নিরাপত্তার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। নিরাপত্তা সংকটে জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে অনেকে আবার অস্ত্র হাতে ঘুরে দাঁড়ায় নিজের শাসকের বিরুদ্ধে। যারা নানাকারণে সরাসরি অস্ত্র হাতে নিতে পারে নি দেশের প্রতি তাদের ঋণ শোধ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। যুদ্ধকালে হিন্দু জনগোষ্ঠী যে 'টার্গেট কিলিংয়ের' শিকার হয় সেটা অবাঞ্চনীয়। শুধু একটা নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে এমন হত্যাকান্ডের শিকার নিন্দনীয় ঘটনা।

---

৬৫ গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মুক্তিযোদ্ধা জনাব রফিকুল ইসলাম (৭৭), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৩/১২/২০২১, সাতক্ষীরা সদর।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে থাকে। ভৌগোলিকভাবে হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থান করেও পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক নানামুখী বৈষম ও বঞ্চনা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে দীর্ঘ এই সময় পূর্ব বাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বঞ্চনা যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিল, তেমনি ছিল নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে। নিরাপত্তার প্রচলিত কাঠামোগত যে দিক সেখানেও পূর্ব বাংলাকে নায্য হিস্যা দেওয়া হয় নি। পূর্ব বাংলার মানুষকে যেমন তারা নিম্ন শ্রেণীর মনে করেছে, তেমনি বাঙালিরা 'মার্শাল রেইস' না এই অপব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালিদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভূক্তিতে অনীহা দেখিয়েছে। পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা এমনও মনে করছে যে, সেনাবাহিনীর জন্য যে শারীরিক চাহিদা প্রয়োজন তা পূরণে বাঙালিদের সামর্থ নেই এবং সাহসের দিক থেকে বাঙালিরা কাপুরুষের সামিল।[১] জাতি হিসাবে বাঙালিকে এভাবে বিবেচনা করা লজ্জা ও হীনমন্যতার কারণ ছিল। অথচ বাঙালিদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য প্রস্তুত করে নেয়ার দায়িত্বও তাদের ছিল। তা না করে অবিবেচনা প্রসূত ধারণা নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামোগত সুবিধা না দিয়ে কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তারা সে ক্ষতি যেন পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা যে পিছিয়ে ছিল এ ব্যাপারে বাঙালিদের যে অভাব-অভিযোগ ছিল সেটা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের কোটা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়।[২]

প্রথাগত বা প্রচলিত নিরাপত্তা ক্ষেত্রগুলোতে দুই প্রদেশের মধ্যে আকাশ সমান বৈষম্য ছিল। বৈষম্যের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোও ছিল আঁতকে ওঠার মত। নিরাপত্তার অপ্রচলিত যে দিক সেখানেও পাহাড় সমান বৈষম্য বিরাজ করত। খাদ্য নিরাপত্তার প্রসঙ্গে জানা যায় যে, দেশভাগের পরই ১৯৫১ সালে খাদ্য ঘাটতির কারণে খুলনা, যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে দুর্ভিক্ষাবস্থা এ অঞ্চলের বাইরে এসে ময়মনসিংহ, সিলেট, সুনামগঞ্জ সহ আরও অনেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্য সংকট এতই তীব্র হয় যে, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অনশনব্রত পালন করেন। খাদ্য ও

১ এনায়েতুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৮।

২ ঐ, পৃ. ৪০৯।

লবণ সংকট নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে জোরালো বক্তব্য দেন। লবণ সংকট এতই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, লবণে চিনি, হাড়ের গুড়া ভেজাল মেশানোর ফলে তা খেয়ে অনেককেই অসুস্থ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। অপ্রথাগত নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতেও পূর্ব বাংলার মত পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। এন্থনী মাসকারেনহাস দু'পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা করে বলেন- 'পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও পূর্ব বাংলার মত এমন অবিশ্বাস্য দরিদ্র দেখিনি। পূর্ব বাংলার দৈন্য দশা, শহর ও গ্রামাঞ্চলেও সমান ভাবে লক্ষনীয়। যা পশ্চিম পাকিস্তানে নেই। ঢাকায় শীর্নকায় রিক্সাওয়ালা রাত কাটায় রিক্সায়, দেখতে বয়স চল্লিশ, আসলে বয়স হবে বিশ।'[৩] একজন বিদেশী সাংবাদিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে এখানে।

১৯৪৭ এ পাকিস্তান স্বাধীন হবার বছরেই চট্টগ্রামে ও কক্সবাজারের উপর দিয়ে যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় তাঁর সাথে বন্যাও দেখা দেয়। এর ৩ বছর পর খুলনাতে বন্যা হয়। ১৯৫১ সালের মে মাসে পুর্ব বাংলার অনেকগুলো জেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট বন্যায় পূর্ব বাংলার ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়। এরপরে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায় প্রতি বছরই বা দু' এক বছর পরপর পূর্ব বাংলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার বরবারই নির্লিপ্ত থাকে। ১৯৭০ সালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার পূর্বের মত অবহেলা প্রদর্শন করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলেও পাকিস্তান সরকার দুর্যোগের কোন স্তরেই তার দায়িত্ব পালন করেনি। মানবিক নিরাপত্তা অপ্রচলিত নিরাপত্তার মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানবিক নিরাপত্তাহীনতাকে অন্যতম হুমকি হিসেবে দেখা হয়। খাদ্য সংকট ও দারিদ্রতা, অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুষ্টিহীনতা ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ চিত্র।

পূর্ব বাংলা কত অরক্ষিত ছিল তাঁর সবথেকে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে। ১৭ দিনব্যাপী চলা এই যুদ্ধে পাকিস্তান তাঁর হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলের কথা মাথায় আনেনি। নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনা তো দূরের কথা যোগাযোগই বন্ধ করে দেয়। অথচ, ভারত ইচ্ছা করলে খুব সহজেই পাকিস্তানের পূর্বের এই অংশ দখল করে নিতে পারত। যুদ্ধে বাঙ্গালিরা যেমন বীরদর্পে অংশ নিয়েছিল, তেমনি সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালিদের অবদান, যুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক সমর্থনকে

৩ এন্থনি মাসকারেনহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

কৃতজ্ঞতাভবে স্মরণ করতে পারত। তা না করে বরং বৈষম্যের মাত্রা বাড়িযে দেয়- যা বঞ্চনার পাল্লাকে ভারী করে। আমেরিকার মূল ভূখন্ড থেকে হাজার মাইল দূরে হাওয়াই অঙ্গরাজ্য অবস্থিত হলেও ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপান যখন পার্ল হার্বার আক্রমণ করলে আমেরিকা পরবর্তীতে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা হামলা চালায়। অথচ ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান তার নিজের একটা প্রদেশে ন্যূনতম নিরাপত্তা দেওয়া দূরের কথা, যোগাযোগই বন্ধ করে দেয়।

বাঙালি জাতির স্বাধীকার আদায়ের যাত্রাপথে ৬ দফা একটি মাইল ফলক। ৬ দফা ঘোষণার পর থেকে স্বাধীকার আদায়ের বন্ধুর পথ মসৃণ হতে থাকে। পাক সরকার কর্তৃক বৈষম্য, পূর্ব বাংলার মানুষের নায্য অধিকার, তাদের নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা, আর সেই শংকা মোচনের সুপারিশ উঠে আসে ৬ দফায়। পূর্বে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবীতে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রুপান্তর করার জন্য দাবী করা হলেও পাকিস্তান সরকার সেটা না করে বরং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই পি আর বাহিনীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। এছাড়া পূর্ব বাংলাকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করার জন্য অস্ত্র-কারখানা ও নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করার দাবীও ২১ দফায় ছিল। ২১ দফায় এসব দাবী দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা করে আসছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা প্রমাণ করে ২১ দফায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য কত জরুরী ছিল[৪]। ৬ দফার পথ ধরে পরবর্তীতে এসেছে ১১ দফা। ১১ দফায় বৈষম্য উঠে এসেছে আরও বিস্তারিত পরিসরে। পূর্ব বাংলায় নিরাপত্তাহীনতার চরম অবমাননা আর অবহেলা দৃষ্টিগোচর হয় ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর। শতাব্দীর সবথেকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাকিস্তান সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি। পূর্ব বাংলার মানুষের এই দুর্দিনে বরং অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছিল। বিদেশ থেকে তড়িত গতিতে প্রাপ্ত সাহায্য ও লাশ সৎকারে ব্রিটিশনৌ-সেনাদের এগিয়ে আসা নিজেদের সরকারের চরম ব্যর্থতা প্রমাণ করে। অথচ ঘূর্ণিঝড় শুরু হবার পূর্বে সতকর্তা সংকেত, জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী উদ্ধার অভিযান, পর্যাপ্ত খাবার ও ঔষধ সরবরাহ, মৃতদেহ সৎকার, পূনর্বাসন, আশ্রয়স্থল নির্মাণ, উপকূলীয় পথ নির্মাণ এর দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার এড়াতে পারে না। পূর্ব বাংলার মানুষ ও তাঁর সচেতন অংশ এটা ভালভাবে নিতে পারেনি। নিজেদের

৪ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*,, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

সরকারকেই বিপদের দিনে তাদের পাশে দেখতে চেয়েছিল তারা। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য স্থগিত হওয়া নির্বাচনে তারা ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

১৯৪৭এ দেশভাগের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা বঞ্চিত হয়েছে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল অধিকার। ১৯৭১ সালে এই বঞ্চনার তীব্র বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৭১ এ সকল বঞ্চনাকে পাশ কাটিয়ে নিরাপত্তা ইস্যু সামনে চলে আসে। যুদ্ধকালে অর্থনীতি যেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি ফসল চাষ করতে না পারার কারণে খাদ্যাভাবে অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসায়ী মুটে, দিন-মজুর কেউ তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে না পারায় মাত্রাতিরিক্ত কষ্টে দিনযাপন করে। একদিকে যেমন ছিল খাদ্যের অভাব, অন্যদিকে অভাব নিরাপত্তার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তি আরও তীব্র হয়। যুদ্ধকালে হিন্দু জনগোষ্ঠী সবথেকে বেশি নিরাপত্তা সংকটে পড়ে। রাজাকার ও পিস কমিটির টার্গেটে পরিণত হয় তারা। হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংকট ছিল বেশ তীব্র। তারা জীবন বাঁচানোর লক্ষে বাপ-দাদার ভিটা ত্যাগ করে ভারতের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য আশ্রয় নেয়। ভারত যাবার পথে স্থানীয় দস্যু, ডাকাত, রাজাকারদের কাছে সম্ভ্রম হারানো থেকে শুরু করে জীবন ও সম্পদ হারানোর ভয় ছিল। আবার জীবনের মায়া ত্যাগ করে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে গেলেও সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সংকট ছিল। কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় ও চোখওঠা রোগ (জয় বাংলারোগ) মহামারী আকার ধারণ করে শরনার্থীদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত ও নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অবদানও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। একজন গৃহবধু যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছে, তেমনি একজন কৃষক, মুদি দোকানি, অবুঝ শিশু ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকে সহজ করতে ভুমিকা রেখেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় ২৪ বছর পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই নিরাপত্তা সংকটে কাটিয়েছে। যুদ্ধকালে সেই সংকট জনজীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। যুদ্ধের পূর্বের বছর যে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় হয় সেখানে ও বরাবরের মত উপেক্ষা প্রদর্শন করে পাকিস্তান সরকার। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী নির্বাচনে তাই পাকিস্তানীদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় পূর্ব বাংলার জনগণ। পূর্ব বাংলার মানুষকে অস্ত্রের মাধ্যমে থামিয়ে দেওয়ার যে কৌশল ইয়াহিয়া সরকার গ্রহণ করে তার জবাবে নিরাপত্তা সংকটে থাকা পূর্ব বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর ‘যার যা আছে’- স্লোগানে

উদ্দীপ্ত হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরে অবশেষ দেখা মেলে কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের। বিজয় অর্জনে বাঙালি ফিরে পায় তার নিরাপত্তা সহ সকল অধিকার।

গ্রন্থপঞ্জী

১ প্রাথমিক উৎস

১.১ দলিলপত্র ও অন্যান্য

- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, ১-১৬ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯
- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১) ৩ খণ্ড , ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২
- Sheikh Hasina (edited) Secret Documents of Intellegence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Hakkany Publisher's, Dhaka, 2021
- আর্কাইভস থেকে প্রাপ্ত দলিলপত্র: অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি প্রতিবেদন, সরকারি শ্বেতপত্র, পার্লামেন্টারি প্রসিডিংস, কাঠের বান্ডিলে প্রাপ্ত এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট ইত্যাদি

১.২ সংবাদপত্র (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক)

দৈনিক আজাদ

৪ জুলাই , ১৯৫১

২২ অক্টোবর, ১৯৫১

২৯ অক্টোবর, ১৯৭০

৩ নভেম্বর , ১৯৫১

১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

১৬ নভেম্বর, ১৯৭০

১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

১৮ নভেম্বর, ১৯৭০

২৩ নভেম্বর, ১৯৭০

২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

New York Times

১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলার বাণী

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা (১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন)

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

দেশ বাংলা পত্রিকা

১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

আনন্দ বাজার পত্রিকা

৮ জুন, ১৯৭১

যুগান্তর পত্রিকা

৩ এপ্রিল, ১৯৭১

Telegraph

৫ জুন, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

১৪ নভেম্বর, ১৯৭০

১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

দৈনিক সংবাদ

১৫ নভেম্বর , ১৯৭০

২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

২৫ নভেম্বর, ১৯৭০

২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

দৈনিক পাকিস্তান

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১১ নভেম্বর, ১৯৭০

১৩ নভেম্বর, ১৯৭০

১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

১৮ নভেম্বর, ১৯৭০

২১ নভেম্বর, ১৯৭০

Daily Dawn

২৫ জুন, ১৯৬৭

২০ জুলাই, ১৯৬৫

সাপ্তাহিক নওবেলাল

১২ এপ্রিল, ১৯৫১

১ নভেম্বর, ১৯৫১

সৈনিক পত্রিকা

২৪ জুন, ১৯৫১

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫১

১৪ নভেম্বর, ১৯৫২

৩ মাঘ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

২৮ অক্টোবর, ১৯৪৯

দৈনিক বাংলা

২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

দৈনিক পূর্বদেশ

২৩ নভেম্বর, ১৯৭০

২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

দৈনিক ইনসাফ

১৮ মার্চ, ১৯৫১

১.৩। সাক্ষাৎকার

গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার

যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

১। মুক্তিযোদ্ধা জনাব ফজলুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৪/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

২। মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল করিম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৪/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

৩। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আজিজুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৮/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

৪। মুক্তিযোদ্ধা জনাব ওয়াজেদ কচি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৮/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

৫।মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল জব্বার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ২০/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

৬। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবুল হাসান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৩/৫/২০১৮, যশোর

৭। মুক্তিযোদ্ধা জনাব শহিদুল্লাহ ফকির, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৭/৫/২০২১, সাতক্ষীরা

৮। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল মজিদ , সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৮/৫/২০২১, সাতক্ষীরা

৯। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল আজিজ ফকির , সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ২০/৫/২০২১, সাতক্ষীরা

১০। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল ওয়াহেদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৫/৭/২০২১, সাতক্ষীরা

১১। মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল করিম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৪/৬/২০২১, সাতক্ষীরা

১২। অনিল শিকদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৮/১/২০২০, পিরোজপুর

১৩। মুক্তিযোদ্ধা জনাব মশিউর রহমান (মশু),জেলা ইউনিট কমান্ডার, সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১২/৩/২০২২, সাতক্ষীরা

১৪। মুক্তিযোদ্ধা জনাব রফিকুল ইসলাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ৩/১২/২০২১, সাতক্ষীরা

অন্যদের গৃহীত সাক্ষাৎকার

নুরুজ্জামান (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, আফসান চৌধুরী, গ্রামের ওকাত্তর, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯)।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, আফসান চৌধুরী, গ্রামের ওকাত্তর, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯)।

কর্নেল মোহাম্মাদ শামসুল হক (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৬ খণ্ড, হাক্কানী পাবিলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯

নৃপেন্দ্র দাস, গ্রাম্য ডাক্তার (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, আফসান চৌধুরী, গ্রামের ওকাত্তর, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯)।

২। দ্বৈতয়িক উৎস

অপ্রকাশিত পিএইচডি ও এমফিল অভিসন্দর্ভ

মোশাররফ হোসেন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল, ২০১৪।

শহীদ কাদের চৌধুরী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট, ২০১৮।

হাবিবুল্লাহ বাহার, পাকিস্তানের জাতীয় ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিতর্কে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৭০) , পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মে, ২০১১।

কোষ গ্রন্থ

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাপিডিয়া, (১-১৪ খণ্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (২য় সংস্করণ), ঢাকা, ২০১২

মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধকোষ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫

হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞান কোষ (১০ খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২১

বাংলা গ্রন্থ

অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, তৃতীয় পর্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৪ ।

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫-১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো- আপারেটিভ-বুক সেসাইটি লি. ঢাকা, ২০১২

আকবার আলি খান, *পুরানো সেই দিনের কথা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০২২

আতিউর রহমান, *ভাষা আন্দোলনের আর্থ সামাজিক পটভূমি*, ইউপিএল, ঢাকা

আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, নওরোজ, ঢাকা, ১৯৭০

আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমাঃ প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ ১৯৫৩-১৯৯১*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬

আবুল মনসুর আহমদ, *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১

আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৯৯ ।

আবুল বারকাত (সমন্বয়ক), একাত্তরে বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাথাঃ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ', জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা

আফসান চৌধুরী, *গ্রামের একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৯

আফসান চৌধুরী, *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০২০

আহমেদ সিরাজ উদদীন, *মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, ভাস্কর প্রকাশন

আতিউর রহমান, *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬।

আতাউর রহমান, *ওজারতির দুই বছর*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ২০০০।

এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭।

এন্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, পপুলার পাবলিশার্স, (রনাত্রী অনূদিত), ঢাকা, ১৯৮৯।

এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪।

কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

কাজী আনওয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১)*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫।

কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১১

গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর ঃ একটি নির্দলিয় ইতিহাস*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১০।

গুল হাসান খান, *পাকিস্তান যখন ভাঙলো*, সংকলন ও অনুবাদ, এটি এম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬।

তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনা*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

দিব্যদ্যুতি সরকার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভূ-রাজনীতি ও শরনার্থী সমস্যা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০১৯।

প্রফেসর সালাহ উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৬৯।

মেজর রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪।

মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ঃ ১৯৬০ দশক*, অনুপম প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৪।

মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিন কাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১।

মুনতাসির মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা, ২০১২।

মহিউদ্দিন আহমেদ, *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬।

মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১।

মাজহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

মোহাম্মাদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলিকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৪।

সফেদ পাঞ্জাবী, *দুঃসময়ের মুখোমুখি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৩৮০।

মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

মেসবাহ কামাল ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, *অশ্রু সাগরে মিলিত প্রাণ, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮।

মিজানুর রহমান, *রাজনীতির তিন কাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০১।

মোনায়েম সরকার (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

মইদুল হাসান, *মূলধারা একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯২

মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগঃ যুদ্ধদিনের কথা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭

মেজর রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪।

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাত্তলানা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯৭।

শেখ মুজিবুর রহমান, *আমাদের বাঁচার দাবী ছয় দফা কর্মসূচি*, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ১৯৬৬।

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২।

সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *শেখ মুজিবুর রহমান*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।

সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪।

হাবিবউল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭।

হারুন-অর -রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফার ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯।

ইংরেজি গ্রন্থ

Ali, Rao F. *How Pakistan Got Devided*, Jang Publication, Lahore, 1992

Blood, Archer K. *The Cruel Birth of Bangladesh, Memories of an American Diplomat*, UPL, Dhaka, 2006

Bass, Garry J, *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide*, Alfred A. Knoph. New York, 2013

Choudhury, G.W, *The Last Days of United Pakistan*, The UPL, Dhaka, 2011.

kristol, Irving. *Defining our National Interest*, The national Interst, Fall, 1990

Khan, Fazal Mukim. *The Story of The Pakistan Army*, Karachi, 1963

Khan, Mohammad Ayub. *Friends Not Masters, A Political Autobiography*, Oxford University Press, New York, 1967.

Hossain, Kamal. *Bangladesh: Quest For Freedom and Justice*, UPL, Dhaka.

Hossain T and Tapas Shaha. *Struggle for freedom*, Tarun Printers, Calcutta, 1973

Humayun, Syed. *Sheikh Mujibs' 6- point formula, An analytical Study of the breakup of Pakistan*, Royal Book Company, Karachi

Jahan, Rounaq. *Pakistan: Failure in National Integration*, Oxford University Press, London, 1973

K C Shaha, The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East, in Ranabir Samaddar (ed.) Refugee and the State: Practices of Asylum and Care in India 1947-2000, New Delhi, Sage Publication, India, 2003

Karim, S, A. *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, UPL, Dhaka, 2009

Matinuddin, Lt. Gen. Kamal. *Tragedy of Errors- East Pakistan Crisis 1968-1971*, Lahore,1994

Maniruzzaman, Talukder. *The security of Small States in the Third World*, Canberra, 1982

Maniruzzaman, Talukdar. *The Politics of Development : The Case of Pakistan* Dhaka, 1971

Musa, Muhammad. *My Version: Indo-Pakistan War: 1965*, Lahore ,1983

Our Common Future: The World Commission on Environment and Development, New York, 1987

Pathria, Jyoti M. Bangladesh: Non Traditional security, South Asia Analysis Group, www.southasiaanalysis.org

Rohde, Cornelia. *CATALYST In the Wake of Great Bhola Cyclone*, Shahitya Prakash, Dhaka, 2014.

Sobhan, Rehman. *From Two Economies to Two Nations: My Journey to Bangladesh* , Daily Star Books, Dhaka, 2015

The Commission of Global Governance: Our Global Neighbourhood, New York, 1995

পরিশিষ্টঃ ১

পূর্ব বাংলার লবণ সংকট

১৯৫১ সনের লবণ সংকট সম্পর্কে ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন-এর বিবৃতিঃ

পূর্ব পাকিস্তানে লবনের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে প্রদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। লবণের অভাবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মতো পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইহার আসল কারণ কাহারও জানা নাই। তবে করাচি হইতে অপর্যাপ্ত সরবরাহই যে ইহার মূল কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সরকার নিযুক্ত লোভী আরতদারদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভই সম্ভবত: বর্তমান পরিস্থিতির কারণ। সরকারি হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ সাধারণত: সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করে না। তথায় বৎসরে মাত্র ৬ লক্ষ মণ খরচ হয়। ইহাও সর্বনবিদিত যে, সরকার দেশি শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্যে বাহির হইতে লবণ আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি লবণের কারখানা রহিয়াছে এবং তাহাতে বৎসরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও সেরূপ নামকরা কারখানা নাই। সুতরাং দেশে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন অপেক্ষা বৎসরে ৩৯ লক্ষ মণ লবণ ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশ হইতে লবণ আমদানি ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে দেশের প্রয়োজন মিটানো সম্ভবপর নয়।

সরকার কর্তৃক লবণ আমদানি বন্ধ হওয়ার পর হইতেই আমি লবণের নিশ্চিত ঘাটতি অনুমান করিয়াছিলাম। আমি সরকারকে ভারত এবং অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার প্রস্তাব অনুযায়ী গত এপ্রিল মাসে বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন পরিষদ বিদেশ হইতে লবণ আমদানির অনুমতি দানের সুপারিশ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সদ্ধিান্ত গ্রহণ করেন নাই। ঢাকা বণিক সমিতি প্রায় একই সময় খাদ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরূপ সুপারিশ জানাইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই।

উৎপাদনের স্বল্পতা ছাড়া প্রদেশে লবণের বিলি ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালোই রহিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দরে লবণ খালাস ও তাহা হইতে অন্যত্র চালান দেওয়ার ভার একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া। এ সম্পর্কে

আমি আরও জানাইতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তানে চা ও পানের অভাব থাকায় তথাকার বাসিন্দাগণকে বিদেশ হইতে এ উভয়বিদ দ্রব্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যাইয়া পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীগণকে এক সের লবণের জন্য যখন ২.০০ টাকা ৩.০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীগণ কোন যুক্তিতে বিদেশ হইতে পান ও চা আমদানি করিয়া নিজেদের ঘাটতি পূরণের অনুমতি পাইতেছে? একই পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নীতি গৃহীত হইতে পারে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য য, করাচিতে বর্তমানে মাত্র দুই আনা সের দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। [দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১]

এইবার লবণের দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারন করিয়াছে। সারা পূর্ব বঙ্গ জুড়িয়াই লবণের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু চড়া দর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সের প্রতি দুই টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থান বিশেষ ষোল টাকায় পর্যন্ত লবণ খরিদ করিতে লোকে বাধ্য হইতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে জনসাধারণের দুর্দশার অবধি নাই। তাই চারদিক হইতে কিছু কিছু সোরগোল উঠিয়াছে। আমাদের আফজল মন্ত্রী আবার বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের শৈথিল্য ও অবস্থার জন্যই নাকি এই বিড়ম্বনা। (সাপ্তাহিক নও বেলাল-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়, ১-১১-১৯৫১)

Special motion regarding salt situation in the Province [2nd Nov., 1952]

The Hon'ble Mr. S.M. Afzal : Sir. I beg to move that this Assembly is of opinion that the salt situation in the province of East Bengal be taken into consideration.

Mr. Chairman. Sir. it was in August.1950 that the Provincial Government noticed a rise in the price of salt. The rise in price appeared to be due to the monopolistic tendencies of the merchants supplying salt from Karachi. In order to counteract their activities the Provincial Government decided to promulgate statutory order to keap the price of salt at a reasonable level. Accordingly the East Bengal Salt Control Order was promulgated on the 30th August, 1950. The order provided for the fixation of wholesale prices and empowered the local dealers to distribute salt at prices fixed by Government, if this became necessary. The retail trade was excluded from the purview of this order on the ground that salt trade was being carried on by a very large number of persons of limited

supplies in all the markets and hats of the province and that any attempt to control salt transactions may result in widespread corruption amongst the minor officials of the Civil Supplies Department. The above measure was considered by itself to be adequate. The Provincial Government, therefore, proposed that the Centre should increase the supply of salt within the Province and they should import salt on Government account. This could not be given effect to because the Central Government decided to trade in salt themselves. They promulgated the Sea-Salt Control Order on the 13th November, 1950, under which the sale, purchase or procurement of salt came to be controlled by the Central Government.

Its import from foreign countries was also licensed. On the 14lh December 1950, the Central Government launched the scheme for the monopoly procurement of sea-salt by them and for its shipment to East Bengal on their account. They also asked the Provincial Government not to take any action that the latter might be contemplating with respect to the supplies of salt to East Bengal. It was explained that there was a large accumulation of sea-salt in the Karachi Salt Works which was sufficient to meet the demand of East Bengal. We protested against the monopoly scheme because we were of the view that it was not a wise policy to supplant private importers altogether and assume the entire responsibility for supply. This was not heeded to.

Since December, 1950, the Provincial Government have been watching dispatches of salt from Karachi with considerable anxiety. During the period from January to May, 1951, 9.70,942 maunds of salt were received from Karachi against estimated requirement of 25 lakh maunds. This deficiency was brought to the notice of the Central Government in the middle of May and they were asked to plan dispatches in such a way that supplies exceeded 5 lakh maunds per month so that something was left over as reserve. Due, however, to difficulties in getting shipping space the Central Government could not speed up dispatches. ...The deficiency noticed in May had been aggravated by July and the Hon'ble Minister, Civil Supplies, accompanied by the Director-General personally discussed the matter with the Central Ministry and pressed for placing salt on O.G.L. Urgent reminders were sent to the Central Government to expedite dispatches from Karachi and to import from abroad. This was continued in September and the Central Government were asked again to place salt on O.G.L. The Director-General went to Karachi again in September to apprise the Central

Government of the deteriorating position. Our suggestions for foreign import were turned down in the first week of October on the ground that foreign salt may not be cheaper and that the capacity for discharging the cargo at Chittagong and Chalna ports was strictly limited. They also informed us that arrangements were being made to charter foreign ships for the carriage of salt from Karachi to East Bengal even by paying higher freight.

Apart from departmental efforts the hon'ble Prime Minster took up to question with the Central Government very strongly during his visit to Karachi. Salt ships began to arrive from the middle of October when the price of the commodity had already gone out of control. From the middle of October, we have been receiving salt ships in quick succession and before the month was over we had 4 ships in Chittagong and 1 at Chalna with altogether 7,46,429 maunds of Karachi salt. We have also been informed that 6 other ships are sailing by middle of November with another 8,87,000 maunds. in addition, the Central Government are understood to be planning to import 10,00,000 maunds of salt from foreign countries and have assured the Province a regular supply of 7,00,000 maunds per month. According to this programme we will have received 16,3,000 maunds during the period of 6 weeks, from the 15th of October to the 30th November against a requirement of 9 to 10 lakh maunds. So we expect to have a reserve of over 5 lakh maunds by the end ol November, 1951.

Meanwhile what supplies had been received in the month of October, l')51 were rushed to all the areas in the Province and the local officers were instructed lo distribute salt at controlled prices. Some local officers had already been doing this, others started distribution on receiving supplies. In all towns supplies were given through ration shops at prices ranging between As. 4 to As. 5 per seer and in rmal areas supplies were sent through selected retailers and prices ranging between ,V. to As. 6 were fixed. Due to the haste in which the distribution had to be orgam•..-.! there have been reports of black marketing even by merchants workim- undei Government control. Every such case coming to the notice of Governmciii WM pursued and the offender punished.

Two employees of a wholesaler of Pirojpur have been arrested for selling salt in violation of the order issued by the Sub-divisional Controller. Another wholesaler of Pirojpur was arrested for stealthily disposing of part of his stocks. Many more arrests

had been made at other places. One wholesaler of Dacca who was found issuing salt on short weight has been blacklisted. Similar action has been taken in Mymensingh and other districts. All the officers have been instructed to take action against hoarders and have been told that good work done in this connection will be specially recogni/ed by Government.

Apart from these measures action is being taken under the Public Safety ordinance against merchants selling salt at scandalously high prices. We take the opportunity of warning all merchants against their unsocial activities and would inform the public that Government contemplate to take very strong action against black marketeers.

We have now the latest reports received from Subdivisional Officers and Subdivisional Muslim Leagues. According to these reports nowhere the free market price was above Rs. 6 per seer. Now the situation is almost under control. I would like to take the indulgence of the House to read out the prices reported by some agencies.

This was when the price was very high but now the price has gone down.

Name of places	Price per seer
Narayanganj	Rs.2.
Munshiganj	Rs. 4 to 6
Manikganj	Rs. 3 to 4
Cox's bazar	Rs. 6 to 8
Ranga mati	Rs. 4 to 5
Noakhali	Rs.2.
Feni	Rs. 3 to 5
Tippera	Rs. 3 to 5
Chandpur	Rs. 3 to 4
Brahmanbaria	Rs. 2 to 2-8
Mymensingh town	At the controlled rate.
Netrokona	Rs.4 to 5
Jamalpur	Rs.2 to 4 or 5
Tangail	Rs.2 to 4

Iswarganj	Rs.2 to 2-8
Sunamganj	No report.
Habiganj	Rs.2 to 3
Barisal	No. report
Pirojpur	Rs. 3.
Patuakhali	Rs. 2 to 5
Faridpur	Rs. 1-4 to 2-8
Madaripur	Rs.6.
Gopalganj	No report.
Goalundo	Rs.2.
Kushtia	Rs. 4 to Rs, 2
Chuadanga	Rs. 12 to Re. 1.
Meherpur	No report
Jessore	Rs. 12.
Magura	Rs.. 6.
Jhenidah	Rs. 1-4.
Khulna	Rs. 12 to Re. 1
Satkhira	Rs. 10
Bagerhat	No report.
Rajshahi	Rs.l.

From Bogra I have not received any report. Rajshahi-Re.l Naogaon-12 annas. Natore-12 annas to Re. 1, Chapai-Nawabganj 4 annas to 7 annas. Dinajpur-6 annas to Re. 1. Rangpur-14 annas. Nilpbamari-7 annas to 8 annas. Gajbandha-8 annas to Rs. 2. Kurigram-Re, 1, Pabna-4 annas to Rs 2. Serajganj-Rs.2 to Rs, 2-8. Bogra-8 annas to Re. I.I asked the Subdivisional Officers and the Secretaries of the Muslim League to inform me as to the highest price of salt in their areas. They have said that now at the present moment the prices is under control and in every town control has been introduced and in the rural areas also this control system is going to be introduced. It has been suggested that the Provincial Government were responsible for distributing salt that was supplied from Karachi. We do not shirk this responsibility. Supply was, however, so far below the requirement and so there was little salt available for distribution. During the months, January to September, we have received 25 lakh 78

thousand maunds against the minimum requirement of 45 lakh maunds per human consumption alone. With this meagre supply distribution could not possibly make salt available to all. With a view to increasing supplies further and to provide a reserve we have established Letter of Credit in Calcutta for the import of 4 lakh maunds of salt from' India. Unfortunately, however, export of salt from that country, is under licence 'and this is causing delay. We are1 also planning' to import 15 lakh maunds of salt from foreign countries, on our own account addition to. Central Government's imports and, for that.purpose,' we are in touch with the" Central Government.

Mr. Mir Ahmed Ali : Mr. Chairman, Sir, এত অল্প সময়ের মধ্যে ১৫ই অক্টোবর তারিখে কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর আমাদের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল সেটা সবাই জানেন। সেটা গোপনীয় কথা নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত লবণের দাম এই রকম হয় নাই। গ্রামে গরিবদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে ঝাঁপ দিলে পরিমাণ না জ্বলে দু:খীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশি জ্বলে। ১৬ টাকা সের লবণ বিক্রয় হলো তাতে গরিবের কোটি কোটি টাকার সর্বনাশ হয়ে গেল।

আমি বলতে চাই যে, ঐ সময় আমার Premier সুযোগ্য Nurul Amin সাহেব করাচিতে চলে গেলেন। তিনি ৭/৮ লক্ষ মণ লবণের যোগাড় করে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে বলতে হবে যে কেন এই বলণ সংকট হলো। এই Ministry গরিবের Ministry, এটা বড় লোকের Ministry নয়। গরীবকে কেন ১৬ টাকা সেরে লবণ কিনতে হলো? কেন সময়মত লবণ আমদানি করা হল না। লবণ তো আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয় না। নিজ দেশের লবণ কেন সময়মতো আনা হলো না। যখন লবণ কমে আসছিল তখন Civil Supply Minister সাহেব কোথায় ছিলেন? করাচিতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে Enquiry হওয়া দরকার। বাঙালি লবণ অভাবে মরে নাই তবে কষ্ট হয়েছে যথেষ্ট।

রসুলুল্লাহকে আল্লাহ বলেছেন: "হে মুহাম্মদ, পাল্লা ঠিক রাখ।" নেকি বদি পাল্লায় ওজন হবে। লবণের সের ১৬ টাকা হলো। আমার প্রধানমন্ত্রী পাগল হয়ে চলে গেলেন করাচিতে। আমি বলি দেশে প্রচুর লবণ আছে। সার্চ করুন। লবণ বের হবে। পুলিশ লাগিয়ে দিন। আমি প্রধানমন্ত্রী ও Civil Supply Minister সাহেবকে বললাম যে লবণ Control করলে চলবে না। যেখানে Control সেখানে অভাব। আমার কথা হচ্ছে যে, আপনারা ঈমান ঠিক রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। আপনারা চাষির মন্ত্রী,

গরিবের মন্ত্রী। আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করুন। পাকিস্তানের প্রধানমন্তী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে Force করুন। আমি চাই যারা এই সমস্ত Neglect করেছে তাদের সরিয়ে দিন Department থেকে। তাদের থাকবার দরকার নাই। তাদের জন্য আপনার বদনাম হয়। আমি জানি Civil Supply Minister সাহেব অনেক অফিসারকে Punishment দিয়েছেন। কেন আজ দোষী অফিসারদের ছেড়ে দেওয়া হলো? কেন ৫০ লক্ষ মণের জায়গায় ৫ লক্ষ মণ লবণ আসল?

যখন লিয়াকত আলী খান সাহেবের মৃত্যু হল তখন লবণের মূল্য ১৬ টাকা সের হলো। সত্যিকারের বিপদ পাকিস্তানে হচ্ছে। ভয় করবেন না। এ বিপদ কেটে যাবে। লবণের অভাব দূর করুন। ধন্যবাদ বাদ দিন। যাতে লোকে কম মূল্যে লবণ পায় সেই চেষ্টা করুন। এই আমার নিবেদন।

Mr. Benode Chandra Chakraborty : Mr. Chairman, Sir, আমাদের সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শুনে বাস্তবিকই আমার মনে হলো যেন তিনি ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লবণের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে Central Goverment এর অব্যবস্থার দরুন এই সংকট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর এই কৈফিয়ত শুনে দেশের লোক সুখী হতে পারবে না। এই দেশের কর্তৃত্বভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। এই বিরাট পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সুখ, দু:খ, অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু দেখাশুনার দায়িত্বভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আজ তাঁদের এই করুণ কাহিনী শুনে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারবে না। লবণ সংকট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যখন সরবরাহ সচিবকে বলেছিলাম তখন তিনি Warning আগ্রহ্য করে বলেছিলেন যে লবণের সরবরাহ ব্যবস্থা তাঁরা যেভাবে ঠিক করলেন তাহা না করলে লবণ সংকট দূর হবে না। আজ Central Government কে দায়ী করলেও আমি বলতে বাধ্য যে Central এবং Provincial Govenment এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার, দায়িত্ব Provincial Government এরই উপর। সে জন্য আমি বলব যে Provincial Government তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে। এই দারুণ লবণ সঙ্কটের দিনেও আমরা সরবরাহ সচিবের কোন Statement ইতিপূর্বে পাই নাই কাজেই বলতে হয় যে তিনি তার দায়িত্ব এ যাবৎ এড়িয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দোষ Central Govermment এর ওপর চাপান সত্ত্বেও স্বভাবত এই কথাই মনে হয় যে, Provincial Government ও তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই। পূর্ব বঙ্গে প্রতি বৎসর কত লবণের প্রয়োজন তা সরবরাহ সচিবের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমরা দেখছি অনবরত একটা না একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি। কোন সময় চালের অভাব, কোন সময় চিনির অভাব, আবার কোন সময় তেলের অভাব। একটা

না একটা অভাব লেগেই আছে। আমাদের অভাবের জন্য দায়ী কে? অনেক লোভী ব্যবসায়ী এই লবণের অভাবের সময় উচ্চ মূল্যে লবণ বিক্রি করে অনেক অর্থলাভ করেছে। গভর্নমেন্ট তাদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেন নাই। গভর্নমেন্টের হাতে Public Safety Ordinance রয়েছে যা তাঁরা সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া গভর্নমেন্টের হাতে আরও অনেক ক্ষমতা রয়েছে যারা ইচ্ছা করলেই এইসব অতি লোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তা তাঁরা করেন নাই। লবণ আমদানির কথা অনেকদিন হইতে শুনছি কিন্তু লবণ আজও এসে পোঁছায়নি। আমরা বুঝতে পারছি না লবণের দাম আরও বাড়বে কিনা। দেশে রীতিমতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারলে যে উদ্দেশ্য Civil Supply Department সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয় Civil Supply Department এর কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে না এবং অভাব কখনও মিটবে না। আমরা অনেক সময় দেখি, সব শহরে চিনি Rationing ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব শহরেও সময় সময় চিনির অভাব হয়, এমন কি ক্রমান্বয়ে ২/৩ সপ্তাহ চিনি পাওয়া যায় না। শহরেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের কথা সহজেই বুঝতে পারছে না। যে জিনিস Civil Supply এর আওতায় নেয়া হয় সেই জিনিসেরই অভাব হয়, এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি না। Civil Supcply Department এর দ্বারা লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করলে লবণের অভাব শীঘ্র মিটবে না। বরং যে পরমাণ লবণ পূর্ব বঙ্গের জন্য প্রয়োজন তা পূর্বাহ্নে আমদানি করে বাজারে ছেড়ে দিলে ফল ভালো হবে। এতে জনসাধারণের হয়রানিও কমবে এবং গভর্নমেন্টেরও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। আজ মাসাধিকাকাল যাবৎ লবণ সংকটের দরুন দেশের সকল শ্রেণির লোককেই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদিও দেশের জনসাধারণ নিশ্চিয় হয়ে বসে আছে তাহলেও এমন একদিন আসবে যখন তারও চুপ করে থাকবে না। এখন হয়তো জনসাধারণের সংঘবদ্ধ হবার শক্তি নাই, কথা বলবার শক্তি নাই, কিন্তু এমন দিন চিরকাল থাকবে না। দেশের এই সংকট কালে বর্তমান সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নাই। তাঁরা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে জনসাধরণ তুষ্ট হতে পারে নাই। গভর্নমেন্ট জনসাধারণকে এমনভাবেই চেপে রাখতে চান যাতে কোন প্রকার অসুবিধাতেও তারা মাথা যেন না তুলতে পারে। আজ লবণ সংকটের দিনে যাদের হাতে কিছু টাকা আছে তারা, Black-marketing করে বহু টাকা রোজগার করছে। এমনও শুনেছি অনেক স্থানে মুসলিম লীগের কোন কোন President এবং Vice-Pesident রাও Black-marketing করছে।

Mr. Chairman (Al-haj Jana Sharfuddin Ahmad): Mr. Chakraborty, in course of your speech you cannot mention any political party. You need not say anything about Muslim League.

Mr. Benode Chandra Chakraborty: যা সত্য কথা, আমি তা বলেছি। আপনাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই আমি এই কথা বললাম। গলদ যা আছে তা আপনারা শোধরাবার ব্যবস্থা করুন। আমি Muslim League Organization এর দোষ দেই নাই। আমি বলেছি এমন অনেক লোক আছেন যারা এই লবণ সংকটের সুযোগ নিয়ে বহু টাকা লাভ করেছেন। আমি জানি লবণ সঙ্কট পার হয়ে গেলে আবার নতুন সঙ্কট এসে উপস্থিত হবে। প্রাদেশিক সরকার যদি দেশের লোকের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে না পারেন তাহলে তাদের এ দায়িত্বভার ত্যাগ করে যারা সক্ষম তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এমনভাবে আর অধিককাল দেশের নিরীহ জনসাধরণকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার তাঁদের নেই।

Mr. Chairman (Al-haj Janab Sharfuddin Ahmad): Mr. Lahiri, you will you able to finish within 5 minutes?

Mr. Provas Chandra Lahiri: No, Sir.
The Hon'ble Mr. Nurul Amin: If Mr. Lahiri cannot finish his speech within 5 minutes, he may finish it within 10 minutes. We may wait for another minutes at best.

Mr. Provas Chandra Lahiri: জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিলেন তা আমরা শুনলাম। এ ব্যাপার দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের দুই প্রান্ত থেকে দুই জন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুই রকম কথা বলেছেন। আমাদের সরবরাহ সচিব বলেছেন যে, আমাদের যেটুকু লবণের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ লবণ সরবরাহ করেনি। লবণ সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছেন অথচ সরবরাহ করতে পারেননি। ৩১ শে অক্টোবর তারিখের পাকিস্তান অবজারভারে আছে "Mr. Fazlur Rahman, Pakistan's Minister for Commerce told the Pakistan Observer that report about the shortage of salt in East Bengal and its prices are very exagerated. He said that the Central Government had a placed salt in a large quantity at the disposal of the Provincial Government for distribution. It is the responsibility of the provincial Government to arrange the fair and proper distribution of the salt in the Province, he added."

জনাব ফজলুর রহমান Press Reporter-দের কাছে এই বিবৃতি দিয়েছেন। যদি এই বিবৃতি সত্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ সরকারের। তিনি বলেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করা

হয়েছে, পূর্ববঙ্গ সরকার Fair Distribution করতে পারেনি, তাঁদের গাফেলতির জন্য দাম বেড়েছে। আর একটা কথা তিনি বলেছেন লবণের দাম Exaggerate করা হয়েছে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে ফজলুর রহমান এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম যে দাম কি পরিমাণ বাড়লে সেটাকে Exaggerate বলা যেতে পারে। সরবরাহ সচিবের বিবৃতিতে সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৬ টাকা সের। যে লবণ তিন হতে এক টাকা আট আনা বলেছেন। অনুসন্ধান করে দেখুন যে, Border এলকায় দাম কম, কারণ সেই সব জায়গায় লবণ অন্য রাষ্ট্র থেকে Smuggled হয়ে আসে। রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে চোরাকারবারিরা Smuggle করে এনে বলণ বিক্রি করছে, তাই দাম সস্তা। এতে যদি আমরা আনন্দ প্রকাশ করি তাহলে চোরাকারবারিদের সমর্থন করা হবে। অন্য জায়গা থেকে যারা চোরাকারবার করে লবণ আনছে তারা অসাধু, তাদের যদি প্রশ্রয় দেন তাহলে তারা যখন অর্থের বিনিময়ে দেশের সমস্ত জিনিস পার করে দেবে, তখন তাদের অসাধু বলার আর মুখ থাকবে না।

সংবাদপত্রে দেখা যায় নানা জায়গায় লবণের দর ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছ। বেশি দূর নয় এই নারায়ণগঞ্জে লবণ ১৫/১৬ টাকা সের। শুনলাম নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ২ জন লোক লবণ খেয়ে মারা গিয়াছে- প্রকাশ হয়েছে লবণের ভিতর Bone dust মিশানোর ফলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (Voice: কোথায়?) এ ঘটনা হয়েছে বেশিদূর নয় এ নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে। গভর্নমেন্ট একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আজ চট্টগ্রাম থেকে খবর এসেছে যে সেখানে ভেজাল লবণ খেয়ে লোকে পেটের অসুখে ভুগছে। সরবরাহ সচিবের দেশ বরিশালের রিপোর্ট যে, সেখানে লবণের সঙ্গে চিনি মিশানো হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেখানে এক ঠাকুর মহাশয় থাকতো, খেতে পেত। তার এই অবস্থা দেখে এক শিষ্য তাকে বললো, "ঠাকুর মহাশয়" আপনি আমাদের দেশে চলুন, সেখানে জিনিসপত্র সস্তা। এই কথায় ঠাকুর মহাশয় তার শিষ্যের বাড়ীতে গেল। শিষ্য বাজারে গিয়ে ঠাকুর মহাশয়ের জন্য নানরকম জিনিস কিনে আনলো। ঠাকুর মহাশয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করল এসব জিনিসের দাম কত। শিষ্য উতত্র দিল যে এখানে সব জিনিসের দাম এক আনা। চাল, মুড়ি ও মুড়কি সব জিনিসের এক আনা দাম। ঠাকুর মহাশয় তো এই কথা শুনে তল্পীতল্পা গুটিয়ে রওনা হলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো, যাচ্ছেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বলল যে সেখানে মুড়ি-মুড়কির একদর সেখানে থাকব না। সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের এখানে লবণে ভেজাল চিনি আর চিনিতে ভেজাল লবণ এবং গভর্নমেন্টকে গালাগালি করে লাভ নাই। আমার এ সম্পর্কে প্রস্তাব হচ্ছে যে ২টি Scheme নিতে হবে। একটা Short-term আর একটি Long-term প্রথমে Short-term নেওয়া দরকার, পরে Long term Scheme হবে। Short term Scheme বিষয়ে বলতে চাই যে, immediatelty পশ্চিমবঙ্গ হতে ভারত হতে Directl আনা হোক এবং পশ্চিম বঙ্গের লবণ

এখানে আনতে গেলে করাচী হয়ে জাহাজ তারপর এখানে আসবে, এই নীতি বন্ধ করুন। সরাসরি লবণ আমদানির ব্যবস্থা করুন। আর স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে পুলিশ আছে। কার ঘরে লবণ মজুত আছে তা তাঁর জানা উচিত। পুলিশ দিয়ে মজুত লবণ বের করে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি হয় তার বন্দোবস্ত করা উচিত। Long term ঝপযবসব সম্বন্ধে বলবো যে এই পূর্ববঙ্গে লবণ তৈরির ব্যবস্থা করুন। এই সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার বাজেট বক্তৃতায় বলে আসছি। Proceeding তো ছাপা হয় না। (হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে) কয় বৎসরের হয়েছে? বাজেট অধিবেশনে আমরা যে প্রস্তাব করি তাতো আপনারা আর দেখেন না। আমরা যে সব প্রস্তাব দিয়েছি সেই অনুসারে লবণ তৈরির ব্যবস্থা করুন। নোয়াখালীতে বা সমুদ্র তীরে অনেক লবণ তৈরি হতো। কায়েদে মিলাত লিয়াকত আলী খান যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি লবণের ওপর ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলেন: জানি না কেন আবার লবণের ওপর ট্যাক্স বসান হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির জন্য নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় যে লবণ তৈরি হত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলো জবারাব করে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ তৈরি হতে পারে বা সরবরাহ হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং সে জন্য Long term Scheme করুন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের Control ভেঙ্গে দিন। আপনারা শক্ত হন। আপনারা পূর্ববঙ্গের শক্তিতে শক্তিবান হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলুন যে আমাদের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরির জন্য তোমাদের ওপর লবণের ট্যাক্স রহিত করতে হবে এবং লবণ Decontrol করতে হবে। লবণের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আজ লবণের সমস্যা দেখা দিয়েছে; এর পর সরিষার তেল, কেরোসিন তেল এবং নারিকেল তেলের সমস্যা এসে পড়ল বলে। সরিষার তেলের দাম দিন দিন বাড়ছে। পরিষদের অধিবেশন আর থাকবে না। তখন আপনারা একভাবে না একভাবে চালিয়ে যাবেন। প্রকাশ্যভাবে বাহিরে আমাদের কিছু বলবার উপায় নাই: Special Powers Ordinance ঘাড়ের ওপর ঝুলছে। আপনারা হয়তো নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তার বিষময় ফলের কথা চিন্তা করবেন।

Mr. Chairman (AAl-haj Janab Sharfuddin Ahmad): The House stands adjonrned till 3 p.m. tomorrow.

ADJOURMENT.

The assembly was then adjourned at 4-10 p.m on Saturday, the 3rd November, 1951.

সূত্র: অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫১ দৈনিক আজাদ ও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার কার্য বিবরণী, (উদ্ধৃত, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২৯)।

পরিশিষ্টঃ ২

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট বিতর্কে মওলানা ভাসনীর বক্তব্য

Maulana Abdul Hamid Khan: জনাব সদর সাহেব, দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শাসন ও শোষণ হতে মুক্তি লাভ করে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ আশা করেছিল যে হারানো গৌরব ফিরে পাবে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড় আফসোসের বিষয় যে, এই হাউসে জনাব অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করেছেন তা তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে করেননি। গভর্নর জেনারেলের মনোনীত মেম্বর হিসেবে করেছেন। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা কখনই আশা করিনি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখ ও বেদনা বুঝবার তাঁর শক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন সংশ্রব নাই। তিনি গভর্নর জেনারেলের প্রেরিত প্রতিনিধি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নাই। বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্নর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত।

তারপর তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিক ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজুর যারা দিবা রাত্র হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাজস্ব জোগায় তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। শতকরা ৪ জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয় জলের জন্য ১০ লক্ষ টকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা করেননি। যুক্তবঙ্গে ১৯৪৩-৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা।

পূর্ব পাকিস্তান যারা হাসিল করেছে তাদের ওপরই ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা করতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা করে ইহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে, পূর্ব পাকিস্তানের আবাল বৃদ্ধ বণিতা, কৃষক, মজুর সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়।

দেশের শিল্প, কৃষি, নৈতিক চরিত্র ও সর্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র দুই কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আমি আশা করি মাননীয় অর্থসচিব সাহেব পুলিশের ব্যয় সঙ্কোচ করে শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করবেন এবং এই বাজেট রহিত করে নূতন আকারে আনায়ন করবেন।

মাননীয় অর্থসচিব সেদিন বলেছেন যে জমিদারী প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাঁর ফিগার বুঝতে পালাম না। পূর্ব বাংলার মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে ১ কোটি লোক কি করে মারা যায়? এটা তিনি কি করে আবিষ্কার করলেন? গরিব কৃষকদের ওপর জুট লাইসেন্স ফি বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকা সেস্ বাকি আছে। এক ময়মনসিংহ জেলায় ২৬ লক্ষ সেস্ বাকি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত দিন ঘুমান আর সন্ধ্যার সময় গিয়ে দস্তখত করেন। এই বাকি সেস্ আদায়ের কোন ব্যবস্থা করছেন না। যে সমস্ত গরিব কৃষক কৃষি ঋণ নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থসচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়ি-ঘর নিলাম এবং জোত-জমি ক্রোক করে উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রবীণ প্রতাপশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি বাকি সেস্ আদায়ের ব্যবস্থা কতে পারেননি। এই হাউসে অনেক মিনিস্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি পড়ে আছে। (হাস্য...)। যদি মন্ত্রীরা গরিব কৃষকদের মেরে মন্ত্রিত্ব করতে চান তাহলে তাহারা আর বেশিদিন মন্ত্রিত্ব করতে পারবেন না।

The Hon'ble Mr. Hamidul Huq Chowdhoury: Mr.Speaker, Sir, Will you ask the hon'ble member to take personal responsibility for the statement he has made that a large amount of cess remains in arrear so far ass I am concerned.

(At this stage there was uproar in the House.)

Maulana Abdul Hamid Khan: যদি মরণাপন্ন কৃষকদের প্রতি এই ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মন্ত্রিমন্ডলীর সোনার চেয়ার ধ্বংস হবে। কৃষকদের ওপর অত্যাচার করে মন্ত্রিত্ব করার অধিকার কারো নাই। আজ আর ব্রিটিশ শাসন নাই। আজাদ পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অকিার। প্রত্যেক মানুষ চায় খাওয়া-পরা, রোগে ঔষধ, থাকার ঘর, চলাচলের রাস্তা, ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা এবং এগুলো তাদের সঙ্গত দাবি। আমি আশা করি মন্ত্রিমণ্ডলী জমিদার প্রথা উচ্ছেদ করে জনপ্রিয়তা লাভ করবেন।

Co-operative Department এর ঋণদান সমিতি সুদের টাকা আদায় করতে কি অত্যাচার না করে? এই Department একটি Bogus Department । গভর্নমেন্টের কত টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক কোন কাজ হচ্ছে না । এর চেয়ে Trade society করে Share বিক্রি করে গ্রামে গ্রামে Industry গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করলে অনেক ভালো হত।

বিনা বেতনে civil Supply Department-এ Superintendent-এর পদ পেলেও অনেকে দরখাস্ত করবে। আমি দেখেছি Civil Supply Department-এর ২০০ টাকার কর্মচারীর ঘরে Silk মশারি এবং দরজা জানালায় silk এর পর্দা। এরাই এই পাক পাকিস্থানকে নাপাকের Depot- তে পরিণত করেছে । এটা বড়ই আফসোসের কথা। এই নাপাকের Depot উচ্ছেদ করতে হবে Civil Supply Department দুর্নীতিপূর্ণ Department । এই Department-কে উচ্ছেদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই House এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। Muslim League এর নির্দেশ অনুযায়ী দেশের জনসাধারণ লীগ মনোনীত কলা গাছকেও ভোট দিয়েছে। মুসলিম লীগ প্রার্থী ১ নয় শতকরা ৯৮ টি আসন দখল করেছে। জনসাধারণ আপনাদের মুখপানে চেয়ে আছে- জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, দুর্নীতিপূর্ণ কন্ট্রোল প্রথা উঠে যাবে।

এই পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ টাকার মদ কিক্রি হচ্ছে। মদ বিক্রি করে, হারাম বিক্রির রাজস্ব দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনা হতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ছাড়া পাকিস্তানের উন্নতি হতে পারে না। আপনারা জানেন বহু টাকা ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আসাম গভর্ণমেন্ট মদ বিক্রি তুলে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অলহাজ, আশা করি পাকিস্তানে নাপাক ডিপো, মদ-গাজার দোকান, বেশ্যাবৃত্তি এবং দুর্নীতিপূর্ণ Control ব্যবস্থা রাখবেন না। পাকিস্তানে পাক মানুষ বাস করবে। পাক Department থাকবে। মেম্বরদের জন্য ১০ লক্ষ কয়েক হাজার টকা বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকগণ আজ ৮ মাস যাবৎ সামান্য ১৫ টাকা বেতনও পাচ্ছে না। অথচ মন্ত্রীদের বেতন ঠিক মাস মাস আদায় হচ্ছে।

Mr. Speaker: আপনার সময় হয়েছে, আপনি বসুন।

Maulana Abdul Hamid Khan: দুটি কথা। প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট এই যে, sales-tax Central গভর্নমেন্টর সঙ্গে চুক্তি করে Central Government এর Subject করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র ১ কোটি টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমণ্ডলী কোন্ স্বধীনতার বলে করলেন? Assembly -র member- দের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে? আমরা কি Central Government এর গোলাম?

ব্রিটিশ গগভর্নমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ, Jute Tax, এমনকি Railway Tax, Income Tax, Sales Tax নিয়ে যাবে Central Government। এইসব Tax এর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ Central Government -কে দেওয়া হোক। এই বাজেটে মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী যাঁরা আজাদীর জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং কায়েদে আজম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের memorial-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই দিকে আমি গভর্নমেন্টর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সূত্রঃ Assembly Procedings Official Report, East Bengle Lagislative Assebmbly, Vol. I, No. I, First Session 1948, p. 42-85

পরিশিষ্ট-৩

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সভায় প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বাংলায় বাজেট বক্তৃতা

আমি ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাজেটের আয় ব্যায়ের হিবাব-নিকাশ পেশ করিতেছি। পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে গণপরিষদ গত মার্চ মাসে একটি আইন পাস করিয়া চলতি আর্থিক বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ২৬ শে মে তারিখে শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা প্রচার করেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্ট কর্তক গৃহীত হয়। কিন্তু তখন জাতীয় পরিষদের কার্য বন্ধ থাকার দরুন প্রেসিডেন্ট শাসতন্ত্রের ১৯৩ ধারার (৩) উপ- ধারার (গ) দফায় এবং ২৩০ ধারার (১) উ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৫৬ সালের ১লা জুন হইতে ৩১ শে আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানর রাজস্ব হইতে ব্যয় মঞ্জুর করেন। অনুরূপভাবে ৩১ শে আগস্ট তারিখেও প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় মঞ্জুর করিযছেন। এইসব কারণে আমি এখন চলতি আর্থিক বৎসরের অবশিষ্ট ছয় মাসের আয় ব্যয়ের হিসাবই পেশ করিতেছি মাত্র। এই সঙ্গে আমি আইন সভার সদস্যদের অবগতির জন্য গভর্নর এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মঞ্জরিকৃত টাকার হিসাব নিকাশ পাশাপাশি দেখাইয়াছি এবং মঞ্জুরিকৃত টাকা সমেত সারা বৎসরের মোট ব্যয়ের হিসাবও প্রদর্শন করিয়াছি।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার সবে মাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনসধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মাফিক এই সরকার ২১ দফা কর্মসূচি কার্যকরী করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। বিগত কয়েক বৎসরে দেশের সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই, বরং নতুন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদেশের জনগণ তাই আজ অন্তহীন সমস্যার সম্মুখীন; আমাদের সরকার এইসব সমস্যার সমাধানে বর্তমান তৎপর রহিয়াছেন। প্রকৃত সমাধান যদিও সময় সাপেক্ষ তবুও আশা করা যায় যে সত্বরই দেশের বর্তমান সমস্যা গুলোর যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইবে। নতুন মন্ত্রিসভার কার্যভর গ্রহণ করিয়া পক্ষকালের মধ্যেই বাজেট পেশ করিতে হইতেছে। এই স্বল্পকারে ভেতর কোন বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। আগামী জনুয়ারি মাসে যখন বর্তমান বৎসরের সংশোধিক বাজেট ও ১৯৫৭-৫৮ সনের জন্য নূতন বাজেট পেশ করা হইবে, তখন মন্ত্রিসভা দলীয় কর্মসূচি অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের জন্য পরিষদের সম্মুখীন হইবে।

জনকল্যাণই এই সরকারের একমাত্র লক্ষ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মন্ত্রিসভা পাঁচসালা পরিকল্পনায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ খুবই অল্প। এই প্রদেশ অতীতে ভয়ানক রকমে অবহেলিত হইয়াছে। পাকিস্তানের লোকসংখ্যার শতকরা ৫.৬ ভাগ এই প্রদেশে বাস করে। তাঁহাদের দারিদ্র প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। তথাপি পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উক্ত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বরাদ্দ

বর্তমান বাজেটে নিম্নরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছে:

বাজেট ১৯৫৬.৫৭ লক্ষ

আয়

গত বৎসরের উদ্বত্ত ১,৫২ লক্ষ

রাজস্ব ৩২,৫৬ লক্ষ

ঋণ খাত হইতে প্রাপ্তি ১,২২,৮৪ লক্ষ

ব্যয়

১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে মে পর্যন্ত গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়।	১৯৫৬ সালে জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কর্তক অনুমোদিত ব্যয়।	১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত রবাদ্দকৃত ব্যয়।	সমগ্র বৎসর ১৯৫৬-৫৭

রাজস্ব খাতে ব্যয়	৪,৬৬	৯,৩০,	১৮,৯৪	৩২,৯০
মূলধন খাতে ব্যয়	২,৯৫	৬,৩৩	১২,৩৭	২১,৬৫
ঋণ খাতে ব্যয়	১৪,৮২	৬৩,৭৬	৫২,৬৮	১,০১,২৬
উদ্বৃত্ত	..	..	..	১,২০

১৯৫৫-৫৬ সালের শেষ হিসাব পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরের প্রাথমিক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজস্ব খাতে আদায় হয় মোট ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই সকল সংখ্যার পরিবর্তন হওয়ার সম্বাবনা আছে; কারণ দেখা যায় প্রারম্ভিক হিসেবে কোন কোন কেন্দ্রীয় ট্যাক্সের প্রাদেশিক সরকারের হিস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় মঞ্জুরীকৃত সাহায্য সম্পূর্ণভাবে ধরা হয় নাই। গত বৎসরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় এই বৎসরের আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ ভূমি রাজস্ব। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয় এবং ইহাতে প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের বিধান করা হয়। গত ছয় বৎসরের এই আইন পুরোপরিভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান আর্থিক সালের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্যসূচিমতে দখলকৃত জমিদারী হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট রফতানি শুল্কের হিস্যা বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এবং বিক্রয় করের হিস্যা বাবদ আরও ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জমিদারী দখল করার দরুণ "স্ট্যাম্প" খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কৃষি আয় কর বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

ব্যয়ের খাতে যদিও আইন পরিষদকে ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাব বিবেচনা করিতে হইবে, তথাপি তুলনা করিয়া দেখার সুবিধার্থে গোটা বৎসরের হিসাবই আলোচনা করা হইতেছে। মার্চেও প্রাথমিক হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব ব্যয় ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, তৎস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট বাবদ ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন খাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে হিসেবের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজস্ব খাত হইতে ব্যয় করা হয়। উহাদের জন্য ২ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিভিল ওয়ার্কসে ৯৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ প্রায় সমস্ত জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। জনকল্যাণমূলক কার্যের চাহিদা মিটাইতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। কীভাবে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, মন্ত্রিসভা সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে নতুন করা ধার্য করিয়া জাতীয় গঠনমূলক কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

গত বৎসরের মূলধন খাতে খরচ হইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অথচ এই বৎসর আমরা ঐ খাতে বরাদ্দ করিয়াছি ২১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা, কর্ণফুলী পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিক

পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ইত্যাদি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলোর ব্যয় বাবদ মূলধন খাত হইতে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত কয়েক বৎসরে মূলধন খাতে গড়পড়তা ব্যয় ছিল বার্ষিক ৫ কোটি টাকার মতো। ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কাজ ত্বরান্বিত করিয়া সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বেশির ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারের গৃহীত ঋণ, রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিভিন্ন প্রকারের ডিপোজিট ও এ্যাডভান্স, যথা-সিভিল, রেভিনিউ এবং ক্লিমিনাল কোর্ট ডিপোজিট, ডিপোজিট অব লোকাল বডিজ ইত্যাদি ঋণ খাতে হিসাব দেখানো হয়।

চলতি বৎসরের বাজেটের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভূমি রাজস্ব

ভূমি রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল প্রজাস্বত্ব আইনের সরাসরি দখলের বিধান অনুযায়ী সরকার প্রদেশের মোট ৫০,০০০ টাকা ও তদূর্ধের বার্ষিক আয়বিশিষ্ট বড় বড় জমিদারীগুলো দখল করার পর এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, অতঃপর সরাসরিভাবে দখল করা আর সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং, অবশিষ্ট সমস্ত রাজস্বভোগীদের স্বত্ব বর্তমান বৎসরে দখল করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

বন

চলতি আর্থিক বৎসরে এই প্রদেশের বন রক্ষণ ও বন সম্পদের উন্নতির জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বর্তমান স্টক সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগ কর্তৃক বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন হইতে কাঠ সংগ্রহ পরিকল্পনার জন্য ২১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান বেসরকারি বন আইন মোতাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনীত বেসরকারি বনসমূহ বেরসকারি বন সংরক্ষণ পরিকল্পনা মতে পরিচালিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন

বনসমূহের সংস্কার পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সেচ

সেচ কার্যের জন্য ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেচ পরিকল্পনা গুলোর মধ্যে কর্ণফুলী পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহার জন্য বাজেটে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি ভাগে এই পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইবে।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। ইহার জন্য ক্যাম্প, অফিস গৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ প্রায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রধান এবং শাখা খাল খননের কাজ অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহের ভিত্তি স্থাপনের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য বাজেটে ৭০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়া যশোর ও খুলনা জেলায় বাকি অংশের সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা তৈয়ারির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রেরিত একজন বিশেষজ্ঞর তত্ত্বাবধানে গঙ্গা কপোতাক্ষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চল জরিপ করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে উহার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। উহার জন্য আনুমানিক ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। বাজেটে উহার জন্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আশু ফললাভের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী একটি উপপরিকল্পনা (তিস্তা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে) তৈরি করা হইয়াছে। এই উপপরিকল্পনায় আনুমানিক ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হইবে। উহার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনাটির জন্য বাজেটে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আর্থিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। প্রায় ৫ লক্ষ একর জমির উন্নয়ন ও বার্ষিক ৮০ লক্ষ মণ অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদনই এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য। উহাদের জন্য বাজেটে ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

প্রদেশের বন্যা সমস্যার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ জরিপ কার্যের কর্মসূচি প্রণয়ন, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত কার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা কমিশন গঠন করিয়াছেন। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হইয়াছে। জরিপ ও তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য বন্যা কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে দশটি স্বল্পমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বন্যা কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর উহা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরীর জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। পাকিস্তান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে দুইটি, যথা ১। জরিপ ও তদন্ত এবং ২। রংপুর জেলার কালাপানী বাঁধ সম্প্রসারণ কার্যের আশু ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয় কার্যই আরম্ভ করা হইয়াছে।

কালাপনী বাঁধ নির্মাণের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। এই বাঁধ নির্মিত হইলে যমুনা নদীর বন্যার ব্যাপক ধ্বংসলীলা হইতে প্রায় ৫২ বর্গমাইল পরিমিত শস্য উৎপাদনকারী এলাকা রক্ষা পাইবে। পাকিস্তান সরকার এযাবৎ অন্যান্য আরও বন্যানিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও ১২ টি সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা রহিয়াছে। বর্ষা শেষে এইসব পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইবে। জল নিষ্কাশনের সুবিধার্থে সরকার খাল সংস্কার করিবার জন্য বহুসংখ্যক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনা বন্যার তীব্রতা হ্রাসে সাহায্য করিবে।

শিক্ষা

শিক্ষার খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সাধারণ প্রয়োজনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাদির জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমি স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই একাডেমি কালক্রমে শুধু অন্যান্য ভাষায় লিখিত দর্শন, কারিগরি বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ কেন্দ্ররূপেই গড়িয়া

উঠিবে না, বরং ইহা বাংলা ভাষার অভিজ্ঞ পন্ডিত ও শিক্ষার্থীগণের একটি গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্ররূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ঢাকা কলেজ ধানমন্ডি এলাকায় নতুন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কলেজের ছাত্রাবাসানের নির্মাণ কার্যও শুরু করা হইয়াছে।্ ইকবাল হলের বর্তমান গৃহের স্থলে একটি নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইডেন গার্লস কলেজ ও হোস্টেলের জন্যও নতুন গৃহ নির্মাণ করা হইবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যাহাতে দেশের বালকগণ নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সরকার চট্টগ্রামে একটি ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে ব্যয় হইবে উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার জমি প্রদান ও এককালীন খরচের অংশ বহন করা ছাড়াও এই পরিকল্পনা বাবদ বার্ষিক পুনঃপৌনিকভাবে যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে উহা বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিবেন। কারিগরি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি ও সাহায্য বাবদ ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসর সরকার এই বাবদ মোট ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে এই বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার প্রসার যাহাতে ত্বরান্বিত হয়, সেইজন্য সরকার খুব উদ্বিগ্ন। তদুদ্যশ্যে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য স্বাভাবিকভাবে বরাদ্দকৃত ১০,০০০ টাকা ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৩০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

এই খাতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান পরিকল্পনার জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বহনযোগ্য নতুন এক্সরে যন্ত্র এবং স্টেরিলাইজার ক্রয় বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ক্লাস খোলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কলেজের গৃহনির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারি হাসপাতাল সমূহে ঔষধপত্র ও

অস্ত্রপাচারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকার প্রদেশের মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে উন্নতি করিবার দাবি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। কাজেই আর্থিক বৎসরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিকেল কলেজ খোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯৪৯-৫০ সালে বি, সি, জি, টিকা প্রদান কর্মসূচি গৃহীত হয়। এবং ক্রমাগত বর্ধিত হারে ইহার কাজ অগ্রসর হইতেছে। চলতি সনের বাজেটে এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া মশক নিবারণী ও ম্যালেরিয়া নিরোধ অভিযান চালান হইতেছে এবং বন্যাপীড়িত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। গৃহীত ক্রমসম্প্রসারণ কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ৫০ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সুতরাং এই বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। শহর এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত আংশিকভাবে চারটি জেলার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাবলী প্রাদেশিক সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পদের চাকুরির বাবদ প্রতি বৎসর ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আরো কতকগুলো ডিস্‌নন্সারী প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আনার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্থাপন করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বহু পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইন পাস করা হইয়াছে।

কৃষি

কৃষি খাতে ২ কোটি ৪২ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজের জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা বাদে কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অধিকতর ব্যাপকভাবে কৃষি গবেষণা চালাইবার জন্য বর্তমান বৎসরে বাজেট বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ এই বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মৎস্য

এই খাতে বাজেটে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকাংশ প্রোটিনজাত খাদ্য মাছেই পাওয়া এবং প্রদেশের মৎস্য সম্পদকে প্রকৃত 'সোনার খনি' আখ্যা দেওয়া

হয়। কিন্তু এই সম্পদকে এ পর্যন্ত পুরাপুরিভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য পালন ও সংরক্ষণ আইন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চালু করা হয় নাই। বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নীতি হইতেছে এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকরী করা এবং মৎস্য, ডিম্ব ও পোনামাছ ধ্বংস বন্ধ করা। সেই মতে মৎস্য ডিরেক্টরেটকে (১) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ দ্বারা দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ও (২) মাছের পরিত্যাক্ত অংশ এবং নষ্ট মাছের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিক পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিভিল ওয়ার্কস

রাস্তাঘাট এবং সরকারি ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ বাবদ ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই খাতে পূর্বে গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যয়ের অঙ্ক ছিল ৪ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই খাতে আমরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। বাজেটে বহুসংখ্যক জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা দেশকে দ্রুত উন্নরি পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিব।

খাদ্য

বর্তমান বৎসরে আনুমানিক খাদ্য ঘাটতি ৭ লক্ষ টন। বর্তমান বাজেটে এই ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার নিম্নোক্ত স্থানসমূহ হইতে খাদ্যশস্য পাইবার আশ্বাস পাইয়াছেন:

পশ্চিম পাকিস্তান	৯৪৩৭৫
ব্রহ্মদেশ	৬১৪৫০
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	৪১৪৭১৩
ভারত	২৫০১৯
সিংহল	১০০০
জাতিসংহের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল	৩২২৩
সোভিয়েত রাশিয়া	৪০০০০
চীন	৬০০০০
মোট	৬৯৯৭৮০

ইহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিপূর্বেই আসিয়া পৌছিয়াছে। বাদবাকি খাদ্যশস্য হয় আসিবার পথে, না হয় উক্ত দেশগুলোতে জাহাজে বোঝাই হইতেছে। এতদপরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব গত ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে আরও ১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্তদেশ হইতে খাদ্যশস্য জাহাজে আনায়ন করার বিশেষ অসুবিধা বিধায় আমরা অন্যান্য দেশ হইতেও খাদ্যশস্য অতিসত্বর আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। যখন সমস্ত আমদানিকৃত খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছাবে তখন খাদ্যাবস্থা শুধু স্বাভাবিকই হইবে না বরং সঞ্চয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রহিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচি

এতদুদ্দেশে বাজেটে ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯৫৫-৫৬ সালে বিশেষ কার্যকরী করা হয় এবং বর্তমানে উহা সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। তেজগাঁও, দৌলতপুর, ফুলতলা ও গাইবান্ধায় থানাসমূহে তিনটি বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সন্তোষজনকভাবে কার্য করিতেছেন। যে দুইদল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম এই বৎসর পাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নতুন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৫ জন মহিলার একটি দলও তেজগাঁও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বর্তমানে তিনটি উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানের ব্যবস্থা মাফিক ৬০-এর পরিবর্তে ১২০ জন কর্মীকে শিক্ষা দিতে পারে; সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আলোচন্য বৎসরে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার কথাও চিন্তা করা হইতেছে। উহার উদ্দেশ্যে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক কর্মী তৈয়ার করা-যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র প্রদেশে উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মচারীদের ভিতরে পল্লীমুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য এবং যে সমস্ত কর্মচারী সরাসরি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের নতুনভাবে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে একটি 'একাডেমি' প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা হইতেছে। এই প্রসেঙ্গ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদিগকে এই 'একাডেমিতে' কিছুকাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এই প্রদেশে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিবার আগে এই কর্মসূচি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারেন। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনার সাহায্যে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে গঠনের কার্য ত্বরান্বিত হইবে।

উপসংহারে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া আমি বলিতে চাই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব সবেমাত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রেও আমাদের সুযোগ্য নেতা জনাব শহীদ

সোহরাওয়ার্দী এক কায়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বন্য ও খাদ্য সমস্যায় বিপন্ন দেশবাসীর খেদমত পূর্ণভাবে করা প্রকৃতই সুকঠোর কর্তব্য। আশা করি, পরিষদের মাননীয় সদস্যবর্গী ও দেশবাসীর সহযোগিতায় এই কর্তৃব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে দেশকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

সূত্রঃ East Pakistan Assembly Proceedings Official Report of The Third Session, 1956. Vol. XV, No. 1, 17th September, 1956.

পরিশিষ্টঃ ৪

আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবী রূপে ৬ দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালাল আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মুক্তি সনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচনের- প্রথম দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয় শিক্ষা- লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিতে হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা- সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল অসিয়াছে। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমীস্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এরা আছেন অপজিশন

দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এরা সকলে একজোট।এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬- দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রি বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি তারা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্য আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচাররপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফার বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর- প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদা আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্স ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতার অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবর পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার ভোট দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের

জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহের প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচানর দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের উঠেন, তারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতরি সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচনী ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইন সভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্যসংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া থাকে।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছিথ যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের(বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছি যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে দেশরক্ষা, পরারষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিটেন প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এইা তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার, চলিতে থাকিত। আমি আমার

প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিগত কারণও আছি। তখনও ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল । ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও আবিভাজ্য কেবল সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অভিভাজ্য ছিল। পেশোওয়ার হইতে চাটগাঁও পর্যন্ত একই রেল চলিত পানিতে। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয় । দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তা নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন- টেলিগ্রাফ পোস্টাফিসের ব্যাপরেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমীস্বার্থী শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নট, ফেডারেল জার্মানী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশ সমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবেঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক, সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানের পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এতটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দূর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দন্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট

রিপাবকিলসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনেটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁড়িয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা

থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্ল্যাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাট চাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডালের তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইব। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীর সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ও অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ আর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা

বলিতেছেন, তার একমাত্রা কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে মোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে?পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংক্ক কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকার আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগেল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছিঃ

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে:

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফল আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায়ী জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আবদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইল, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পুর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রুপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই, পি, আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন?সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময়

ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন?পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। ঐ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছেঃ
এক. তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না?কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে

অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইতে পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথাঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তান হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদেরে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবেঃ

১। প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

৪। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫। আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-সেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিমপাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-স, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁ, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়-দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেকা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়,

সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তাণীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজ যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি! আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীভনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছায়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাইবোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২।

পরিশিষ্ট-৫

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

একুশ দফা

নীতি: কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্ধৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারে খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষিদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের নৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবল মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভোদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্য পুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থ্ করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্টভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার (নির্দেশে) গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২২শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সূত্র: যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর, জানুয়ারি, ১৯৫৪, উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*: *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

পরিশিষ্ট-৬

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ

‘আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারি’

নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা- এই চারটি জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল সফর করে আমি সবেমাত্র এখানে ফিরেছি। গত ১২ই নভেম্বর রাতে এবং ১৩ই নভেম্বরের ভোরে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবলীলায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্ব তা অবগত হয়েছে। মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যে আপনাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের কাছে বাঙালি আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবে।

আমাদের হিসাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। অবশ্য কারো কারো মতে এই সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। যে সমস্ত এলাকায় এখনো হাজার হাজার মানুষ ও মৃতদেহ সৎকারের অভাবে পড়ে রয়েছে, সে সকল এলাকায় বাতাস গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। খুলনায় পাইকগাছা, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, বোরহানুদ্দিন, চর লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা দ্বীপসহ ভোলার প্রায় সর্বত্র, কালাইয়া ও বাউফল থানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, গলাচিপা থানার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে চর অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত দ্বীপ সমূহ, রাঙ্গাবালি, বড়ো বাইশধিয়া, ছোট বাইশদিয়া, চরকাজল ও পানপট্টি সহ পটুয়াখালী জেলার দুর্গত এলাকাসমূহ, নোয়াখালী জেলার উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ- বিশেষভাবে হাতিয়া, চর গাজী, চর আবদুল্লাহ, চর আলেকজান্ডার এবং রামগতি থানা ও সুধারাম থানার অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলে ৯ দিনের বেশি সময় আমি ঘুরেছি।

এ সমস্ত অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখে গেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাপ্রলয়ের ধাক্কা সামলে যারা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে, তারা যে কী ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করছে, তাও ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। পটুয়াখালী, ভোলা ও নেয়াখালীর বহু অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০/২৫ ভাগ এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রাণে বেঁচেছে সত্য, কিন্তু ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদিপশু অর্থাৎ পার্থিব সহায়সম্বল হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের পরনে কাপড় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

নেই, এমন কি বহুস্থানে তৃষ্ণার পানিটুকু পর্যন্ত না খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। তাদের শরীরের আহত স্থানে ঘা হয়ে গেছে। এভাবে অসহায় বাত্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীরা অনাহারে, অনাশ্রয়ে এবং রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দায়িত্ব পালনের প্রতিটি পর্যায়ে সরকারের চরম ব্যর্থতা। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার দুদিন আগে 'সুপারকো' ও আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে খবর পাওয়া সত্ত্বেও উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় নি। হতভাগ্যদের কিছু লোককে অন্তত অন্যস্থানে অপসারণের কোনো প্রকার চেষ্টা করা হয় নি। ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা অথবা ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপণের তেমন কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয় নি। সরকার মৃতের যে হিসাব দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য রকমের কম। প্রাথমিক সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৫০ জনের মতো বলে জানানো হয়েছে।

যদি প্রলয়ের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্ধারকাজ ও সাহায্য অভিযান চালানো হতো, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানো সম্ভব হতো, হাজার হাজার লোক-যারা প্রলয়ের ধাক্কা সামলেও টিকে ছিল তাদেরকেও অনাহারে, অনাশ্রয় ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হতো না। যদি নৌ-বাহিনী তৎপরতার সাথে উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করতো তাহলে হাজার হাজার লোককে সাগরে সলিলসমাধি লাভ করতে হতো না। উদ্ধার কাজ ও সাহায্য অভিযানের এই ব্যর্থতা ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু উদাসীনতা আর অপরাধের এখানেই শেষ নয়।

আমি যে সমস্ত অঞ্চল ঘুরেছি সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পরেও বাত্যা-দুর্গতদের কাছে এক আউন্স রিলিফও পৌঁছায় নি। তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে বৃক্ষমূলে। এমন পানি তাদেরকে পান করতে হচ্ছে, মানুষ ও গবাদি পশুর লাশে যা পচে দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেই পানি পান করে তাদের মুখে দেখা দিয়েছে দগদগে ঘা। উদরাময় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং কলেরা মহামারী আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজকর্মী এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ রিলিফ দল দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্যে গিয়েছেন, প্রশাসন ব্যবস্থার অসহযোগিতার ফলে তাদেরকেও নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যানবাহন ও যোগাযোগের সামান্যতম সুবিধা দিয়েও সাহায্য করে নি। যানবাহনের এই চরম সংকট দেখা দিত না যদি সরকার বিশেষ করে মার্শাল 'ল' সরকার

সময়মতো তার ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য জেলা থেকে লঞ্চ ও অপরাপর নৌ-যান রিকুইজিশনের ব্যবস্থা করতেন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় তা দুর্গত এলাকার কাজে ব্যবহার করতেন। সেক্ষেত্রে তথাকথিত 'দুর্গম' এলাকার প্রশ্ন দেখাই দিত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা বলতে পারি। কেননা, আমি নিজে একটা ছোট্ট ভগ্নপ্রায় লঞ্চের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপসমূহসহ প্রায় প্রতিটি দুর্গত অঞ্চলে যেতে পেরেছি। সরকারের এ সমস্ত ব্যর্থতা এবং লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে সাইক্লোনের ১০ দিন পরেও অনেক জায়গায় এতটুকু সাহায্যও পৌঁছায় নি।

বর্তমানে কিছু কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু কিছু হেলিকপ্টার পরিদৃষ্ট হয়। আগে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিমানযোগে রিলিফ নিক্ষেপের কাজ শুরু হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এটা প্রদেশব্যাপী জনগণের উচ্চ এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদেরই ফলশ্রুতি। সত্য কথা বলতে কি, সারা বিশ্ব থেকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য সামগ্রী এসে না পৌঁছালে অবস্থার হয়ত কোনো পরিবর্তন হতো না। বাংলাদেশের দুর্গত মানুষ বিশ্বসমাজের মহানুভবতাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, আমাদের সরকারের এটা লজ্জারই কথা।

আমাদের দুর্গত ভাইদের জন্যে বহির্বিশ্বে অন্ন-বস্ত্র, ওষুধ এবং ঐ সমস্ত জিনিস দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক পরিবহন সরঞ্জাম পাঠিয়েছেন। বাঁচা-মরার প্রশ্নে যে সমস্ত দেশ উদার হস্তে সাহায্যদ্রব্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশের মানুষ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার দুর্গত ভাইদের প্রতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্রুত ও মানবিক সাড়া দেওয়ায় সেসব দেশের সরকার জনগণের প্রতি জানাই আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

বিদেশ থেকে দ্রুতগতিতে প্রাপ্ত বিপুল সাহায্য কেবল আমাদের সরকারের টালবাহানা এবং ঔদাসীন্যকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। ভাগ্যের পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পটুয়াখালীতে মৃতদেহ দাফন করতে হচ্ছে ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যদের। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার সমূহ অলসভাবে বসে আছে, সেখানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তের দেশের হেলিকপ্টরের জন্যে। যেক্ষেত্রে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের জন্যে উদার হস্তে সাহায্যের কথা ঘোষণা করতে পেরেছে মাত্র দুদিনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে

দুর্গতদের জন্যে ৫ কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণা করতে সময় লেগেছে ১০ দিন। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে ধরা হলে শুধুমাত্র চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সাহায্যের পরিমাণ অনেক ছাড়িয়ে যাবে।

যেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দানশীল ব্যক্তিরা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলার মানুষের রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা বাইশ পরিবারের কেউই আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য ঘোষণা করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত বস্ত্রশিল্প এ যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধানতম বাজার হিসাবে ব্যবহার করেছে, তাদের কেউই এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্যে একগজ কাপড় দেয় নি। এজন্যেই কি বিগত দু'দশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি? এ জন্যেই কি বাংলাদেশের পাটচাষী অভুক্ত থেকে করাচী ও লায়ালপুরের পুঁজিপাতিদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে সহায়তা করেছে?

জাতীয় সংহতির সেই খুঁটিরা আজ কোথায়? ইসলামের স্বয়ম্ভূ রক্ষকরা আজ কোথায়? কোথায় আজ মাওলানা মওদুদী, আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ? কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা? বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে দুর্গত মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু সাহায্য দেয়ার জন্যে তাঁদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান অভিজ্ঞতা একটি বিষয় আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং প্রতিটি বাঙালি সেই মহাসত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, তা হলো এতদিন যাবৎ আমাদেরকে একটি কলোনি ও বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত অধিকার আমাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হয় নি। আমাদের জীবন-মরণের সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদে। সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার আমলাদের হাতে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য অবহেলা ও বৈষম্যের জন্যে আজ তাদেরকেই আমি দায়ী করছি, কেননা তারাই বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতির রুদ্ররোষের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। বাংলার ১০ লাখ আদম সন্তান প্রাণ হারিয়েছে, আরো ৩০ লাখ মৃত্যু এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে আমাদের বাস করতে হচ্ছে বন্যা এবং সাইক্লোনের মধ্যে।

আজাদীর ২৫ বছর পরেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে এমনকি পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি হয় নি। ১০ বছর আগেও একবার ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই এলাকায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এবার ১০ বছর পর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশক আগে ঘূর্ণিবাত্যা প্রতিরোধী স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সমদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম সমূহের পুনর্বিন্যাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পূর্ণ এক দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও এসব পরিকল্পনা একগাদা প্রকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছে এবং তা এখনো কার্যকর করা হয় নি। এসব ঘূর্ণিবাত্যা প্রতিরোধ আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্যে গত ১০ বছরে মাত্র ২০ কোটি টাকার সংস্থান হয় নি। অথচ ইসলামাবাদের বিলাস বৈভবের জন্যে ২২০ কোটি টাকার অভাব হয় নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের মংলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্যে ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয় নি।

এসব দেখে শুনে আজ আমাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাংলাদেশকে যদি প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে অবশ্যই আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে। তখনই কেবল আমরা ক্ষমতাসীন চক্রের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নই হোক আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রাম পুনর্গঠন বা ঘূর্ণি দুর্গতদের পুনর্বাসনই হোক, যে কোনো জরুরী সমস্যার সমাধান করতে পারব।

উপকূলবর্তী এলাকায় যারা বেঁচে আছে, তাদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ ও খাবার পানি যোগানের জন্যে অতি শিগগির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর মাত্র কয়েকদিন বিলম্ব হলে সাহায্য গ্রহণের জন্যে সেখানে আর কাউকে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ যদি দেশে গণসরকার প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে তাঁরা সাহায্যদ্রব্য দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্যে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে নিয়োজিত করতে পারতেন। আমলাদের যদি কোনো গণসরকারের কাছে নিজেদের কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হতো, তাহলে তাঁরা এত উদাসীন হতে সাহস পেতেন না।

দেশবাসীকে আরেকটি ঘূর্ণিবাত্যা ও গর্কির (সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস) অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এক ব্যাপক পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্যে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বাঁধ ও ঘূর্ণি

প্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু বিপদ সংকেত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। যারা প্রাণে বেঁচে গেছে, তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে গবাদি পশু ও বিদ্যুৎচালিত লাঙ্গল সরবরাহ করতে হবে। তারা যাতে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে, সেজন্যে শীতকালীন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বীজ ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। এর সবই করা সম্ভব যদি আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারি। আমরা আজ শপথ নিচ্ছি, বাংলার উপকূল অঞ্চলে এবার যা ঘটেছে তা আর ঘটতে দেব না। এবারের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সারা বিশ্বের কাছে এই মহাসত্যই তুলে ধরেছে যে, ৭ কোটি বাঙালি কত অসহায়। শুধু শহরে-বন্দরে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নয়, বাংলার প্রতিটি পল্লীতে, প্রতিটি অলিতে-গলিতে, দ্বীপাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় এই মহাসত্যই আজ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক মোক্তার আমাদেরই হতে হবে। আমাদের সম্পদ কীভাবে ব্যয়িত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের। আর আমাদের তহবিল কীভাবে কোথায় ব্যয় করব, সেই ক্ষমতাও থাকতে হবে আমাদেরই হাতে।

আমরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হতে চাই না। জনগণকে সর্বসময় ক্ষমতা অর্জন করতে হবেই। নির্বাচনে যদি হয়- ভালো, আর যদি না হয়, জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তি তো অর্জন করতে হবে। বাংলার জনগণ অন্তরে এবং মনে ইতোমধ্যে ভোটের রায় ঘোষণা করেছে। তারা 'শক্ত কেন্দ্রের' বদৌলতে অনেক দুর্ভোগই ভুগেছে। জাতীয় সংহতির নামে তাদের উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বয়ত্তশাসনের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। শাসকদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যাবে, তারা হুঁশিয়ার হোন, বাংলাদেশ আজ জেগেছে। বানচাল করা না হলে বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের রায় ঘোষণা করবে। আর যদি নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়, তাহলে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোক আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্জণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্যে, আমরা যাতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারি তার জন্যে, আর যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি তার জন্যে, প্রয়োজনবোধে আরো ১০ লাখ বাঙালি প্রাণ দেবে।

সূত্র: ঢাকা হোটেল শাহবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ২৬ নভেম্বর ১৯৭০, শেখ মুজিবুর রহমান, *ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫* (ভূমিকা: শেখ হাসিনা ও সম্পাদনা একে আব্দুল মমেন), চারুলিপি, ঢাকা, ২০২১ পৃ. ২০৫-২০৯।

পরিশিষ্টঃ ০৭

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীর ভাষণ

জনগণের প্রতি মাওলানা ভাসানীর ডাক

পূর্ব পাকিস্তানের আজাদি রক্ষা ও মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন

আজি আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালিকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মতো দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩ টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট হইতে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের আজাদির লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে, আর কোনো যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ কামড়ে আর গগণবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার যে লড়াই করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সফল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বছর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য [আমি] দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অঙ্ক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো বাঙালিকে বুঝাইতে হইবে না, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানিদের নূতন শপথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি সেই পথ লক্ষ করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিলেন। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনার ও দেশি-বিদেশি সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, কোনো ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহয্য, কওমি গানের আসার, সাংবাদিকের ফিচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই ধিকৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য শক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃ পুনঃ বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বৎসরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথমবারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারিশত কোটি টাকার মূল্যের ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদিপশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতিকস্ঠে রোপণ করা ধান, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি। গত ২৩ শে অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘরবাড়ি, গাছপালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষ দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার পর পুনঃ পুনঃ কলেরা-মহামারিতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী, নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তাহা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মতো এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে। আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না যে আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয়নিঃসৃত ভালোবাসা আর প্রজ্ঞাপ্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে; কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিকট হইতে সেই ভালোবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাত কোটি বাঙালিকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্যসামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে তখন পাকিস্তানের বেতার টিভি বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে; তখন তাহাদের আহ্লাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বার লক্ষাধিক রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবান দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সব কিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতি নয়-

প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকবেলা আপোস নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়- পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল ও জনসভার আয়োজন করুন। তাই মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরি আবেদন করিতেছি।

এইদিন আপনারা আওযাজ তুলুনঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদি রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবান দিতে সদ্য প্রস্তুত। সেই সাথে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ আমরা স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলামুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি, মানবতার নামে আজাদির লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিব আশা করি, বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি হুশিয়ারিও উচ্চারণ করিতে চাই- আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনো চাল চালাইতে চায় তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায় তবে তাহাকেও তল্পিতল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব।

বাঙালি কোনো দিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আরও লইবেও না। বিদেশি সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।
জনগণের সংগ্রামী ঐক্য-জিন্দাবাদ।
ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা-বাংলা ছাড়!
দুর্গত জনসেবায়-আত্মনিয়োগ কর।
নাছরুম মিনাল্লাহে ফাতুহুন কারিব
(জয় আমাদের নিকটবর্তী)
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৩০-১১-১৯৭০ ইং।

পরিশিষ্ট-৮

সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছিঃ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (২০ শে মার্চ ১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ শে মার্চ এই তিন দিনব্যাপী আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২০ শে মার্চ এর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল পল্টন ময়দানে কাউন্সিল উত্তর জনসভা। প্রধান বক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জনসভায় কাউন্সিলে গৃহীত ৬-দফা কর্মসূচি, এর পটভূমি, বাঙালিদের জন্য এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, এ দাবি আদায়ে চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'শক্তিশালী কেন্দ্র' এর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত এ-পর্যন্ত দেয়া তত্ত্বের অসারত্ব, নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৬-দফা দাবি আদায়, সরকারি দমন-পীড়ন-নির্যাতন নেমে এলে স্বেচ্ছায় নেতা-কর্মীদের কারাবরণের ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধু বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য দৈনিক ইত্তেফাক-এর পাতা থেকে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

কালবৈশাখীর উদ্দাম নতুন ঘূর্ণিঝড় এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক জনসভার মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিন ব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। প্রকৃতির উদ্দাম তান্ডবকে স্তব্ধ করিয়া সভায় সমাগত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে দৃপ্তকণ্ঠে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি ঘোষণা করেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের চোখে-মুখে আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা, কুসুমাস্তীর্ণ পথে সে জিজ্ঞাসার জবাব মিলিবে না- এ জিজ্ঞাসার জবাব পাইতে হইলে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনকে আশির্বাদ বলিয়া বরণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির এই বাণী লইয়া আপনারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, পূর্ব পাকিস্তানর প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগত কালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথে ৬ দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে।

সভার সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ৬ দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, এইবার যদি কোন গণতান্ত্রিক কর্মীর উপর নির্যাতন নামিয়া আসে তবে পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি কারাগার আমরা ভরিয়া তুলিব। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিব। তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন সাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি এবং দুই প্রদেশের জনসাধারণকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তোলার মধ্যেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নিহিত আছে। গোটা পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাহাদের সমৃদ্ধি সাধানকল্পেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করিয়াছে। বিগত আঠার বৎসরের বঞ্চনা ও নির্যাতনের আলোকে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

কেন এই বেইনসাফ

পূর্ব পাকিস্তান দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী বাস করে। তথাপি পূর্ব পাকিস্তানকেই বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে কেন? কেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করা হয় নাই? যদি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের তিন-তিনটি রাজধানী থাকিত, যদি সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই এখানে থাকিত, যদি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী ঢাকায় হইত, যদি বিদেশী কূটনৈতিক মিশনগুলির সদর দফতর এখানে থাকিত, তবে আমরা নয়, ৬ দফার মত দাবী লইয়া সংগ্রাম করিত পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা।

চিন্তা করিয়া দেখুন

পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি ৬ দফা দাবীর যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান সংগ্রামে কি কোরবানী করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান দেশের অর্থনীতিতে কি পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য আমরা স্বাধীনতার পরও রাজনীতি ক্ষেত্রে কি কোরবানী দিয়াছি, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের আজ তা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা

দরকার। তাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, কেন্দ্রে আজ একটি মহাশক্তিধর সরকার থাকা স্বত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় সে সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কোন কাজে আসে নাই।

শক্তিশালী কেন্দ্র থাকিয়া কি লাভ হইল

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান স্বয়ং যুদ্ধের সময় এখানে আসিতে পারেন নাই। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোনো রুপ সাহায্য-সহায়তা এখানে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। জাতির চরম বিপর্যয়ের দিনে আইয়ুব সাহেবের শক্তিশালী সরকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আজ সবাইকে গোটা সমস্যাটিকে তলাইয়া দেখিতে হইবে। পাকিস্তানকে সত্যিকারের শক্তিশালী করিতে হইলে পাকিস্তানের দুইটি হাতকে সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। আজ পাকিস্তানের দুইটি হাতের মধ্যে একটি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে আর একটি ফাঁপিয়া উঠিয়াছে- এই অবস্থাকে শক্তিমান অবস্থা বলা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে ওয়ারস'তে মার্কিন ও চীনা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে আলোচনার কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো সম্প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন, শেখ মুজিব তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পুর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যদি চীন এবং আমেরিকার দিকে তাকাইয়া ও নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তবে পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রের আর প্রয়োজনীয় কি? দেশরক্ষার প্রশ্নে বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া পরারাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কথাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তাদের প্রতি আর ঈমান আনিবে কিভাবে! শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, ৬ দফা দাবী আদায়ের জন্য যারা সংগ্রাম করিবে তাহাদের উপর অত্যাচার আসিবে, নির্যাতন হইবে, কিন্তু এই অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়া লইয়া ৬ দফার সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, একদিন সবাইকে মরিতে হইবে, সেই মৃত্যুর আদেশ পরম করুণাময়ের নিকট হইতে আসিবে, ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে আসিতে পারে না।

সূত্রঃ ইত্তেফাক, ২১শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮।

পরিশিষ্ট– ৯

৬-দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে রংপুরে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ

স্থান: পাবলিক লাইব্রেরী হল ময়দান জেলা: রংপুর আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহত জনসভা।

তারিখ: ০৯/০৪/৬৬

সময়: বৈকাল ৫.১০ মিঃ

শ্রোতা: আনুমানিক ছয় হাজার

সভাপতি: জনাব মতিয়র রহমান

বক্তা: শেখ মুজিবর রহমান

(১)

মাননীয় সভাপতি ও আমার রংপুরের ভায়েরা। এই ৬ দফা, আমি বিড়ি শ্রমিকদের আশ্বাস দিতে পারি যে কোন রকম অবস্থায় তাদের সঙ্গে আছি। এই ৬ দফা দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল আয়ূব সাহেব বড় গরম হইয়াছেন Civil War এর হুমকি দিয়াছেন। সমূলে ধ্বংস করবেন এটা বলেছেন। আমি ৬ দফার কথা যে বলি ভোটের জন্য নয়, ভোট আইয়ূব সাহেব নিয়াছেন, এই ৬ দফা এটা আমার ব্যক্তিগত দাবী নয়, আওয়ামী লীগের দাবী নয়। ১৭ দিনের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মধ্য সম্বন্ধ ছিল না, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কেউ কাহাকে সাহায্য করতে পারেনি। ৫$^{১}/_{২}$ কোটি লোক আলাদা হইয়াছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের লোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার দরকার হইয়াছে। ভায়েরা আমার আপনারা ৬ দফা মানতে পারেন নাও মানতে পারেন, এখানে কাহারো শত্রু নাই বন্দুক নাই, আয়ূবের মত ক্ষমতা কেড়ে নিব। জানি Emergency আছে, তাসখন্দে নাকে খত দিয়াছেন, ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল আছে, নিরাপত্তা আইনে বন্দীও করতে পারেন এসব জেনেও নেমেছি এবং প্রস্তুত হইয়াও নেমেছি। সহ্যের সীমানা আছে, ১৮ বছর আমরা পাকিস্তান পেয়েছি, দোষ হয়তও করেছি। কিন্তু একটি দেশের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়া পশ্চিম পাকিস্তান করেনি। দোষ আমাদের আছে সত্য কিন্তু সম্পদ সব পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়া যাই নাই। ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় কি ছিল, অনেকে বলেন ২১ দফার কথা তাদের মনে নাই যে এই আমরা ৫/৬ বছর জেলে ছিলাম করতে পারিনি কিছু। শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আছে এই দেশের ক্যাপিটালিষ্ট এই জন্য তাদের সঙ্গে পারিনি, আমাদের একমাত্র শক্তি জনসাধারণ। আমি বলি জনসাধারণকে আয়ূব সাহেব আপনাদের পাকিস্তানে ১০ বছর সিইনসি আছেন ৮ বছর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আপনি পাকিস্তানের সব আমিরুল মোমিন খেলাফতে মোছলেমীন ১০ বছর সিইনসি, পূর্ব বাংলায় কতজন সৈন্য ছিল যুদ্ধের সময় কখনো ভাঙ্গা জাহাজ ছিল নৌ বাহিনীতে

যুদ্ধ জাহাজ ছিল, আমরা ৫৬ জন মুসলমান হিসাবে আপনাদের বিশ্বাস করিনি? বাড়ীর পাশের I.C.S হিন্দুদের বিশ্বাস করিনি, মুসলমান পাঞ্জাবী I.C.S ভাইদের বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু ভারত যদি পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে নিয়া যায় তাহলে পূর্ব বাংলার একটা মানুষ সহ্য করবে না, আমার মা বোনর উপর অত্যাচার করবে আমরা তাহা সহ্য করব না। একটা টোটার কারখানা আছে এখানে। পাকিস্তানের আয়ের ৬২ টাকা ব্যয় দেশ রক্ষায়, পাকিস্তান অরডন্যান্স কারখানা সেটা পাকিস্তান আর্মি হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিন্ডি। এয়ার ফোর্স হেডকোয়ার্টার ছিল আগে করাচীতে, নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার করাচী। যারা হাটু পানিতে ডুবে মরে তারাও নৌবাহিনীর সেনা হয়। সন্দ্বীপের মধ্যে দেখলাম কি অবস্থা সেই পানির মধ্য পানিতে খেলা করে, পানির মধ্য জন্ম পানির মধ্য মৃত্যু তারা নৌ বাহিনীতে সেনা নয়। কেন বাঙ্গালী সৈন্য নাই আমি জানি তুমি বাঙ্গালী নাও নাই। এবার বাঙ্গালী না থাকলে লাহোর থাকত না, কেউ স্যারানডার করিনি। শতশত সুপারসনিক জেট পশ্চিম পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তানে ওই ধরনের জেট নামাবার মত Airport নাই। চট্টগ্রামে যুদ্ধ জাহাজ নাই। IWTA এর জাহাজের উপর কামান ছিল। ভায়েরা আমার, আজকে তিনি বলেন দিল্লী লে লেয়েগা, আমি বলি- তুমি দুনিয়া নাও ,তোমার পাঞ্জাব ভোট দিয়াছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, সেখানে খিজির হায়াত খানের মিনিষ্ট্রি ছিল, তুমি বাঙ্গালীকে বল এরা জুতা পায়ে দিতে পারে না, এরা না হলে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান হতনা। ভায়েরা আমার, আজ সেই জন্য ৬ দফার প্রয়োজন হইয়াছে। আপনারা জানেন এখানে ব্যাংক আছে। অনেকে বলে ৬ দফা হলে কি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন হবে? যাহারা আয়ূবকে সমর্থন করেন, আমেরিকার দালাল যদি পাকিস্তানে কেউ থাকে সেই আয়ূব দালাল। কে মার্শাল ল'র সময় আমেরিকার সাহায্য চেয়ে ছিলেন কে জনসনকে টেলিফোন করে ছিলেন সেটা আয়ূব আমরা কেউ নই। কে এই ধরনের সিষ্টেম করেছে, গরীবদের গরীব ধনীদের ধনী করতে, এটা করেছে আয়ূবের দল। বন্ধুগণ আমরা অনুরোধ, ভায়েরা ৬-দফা হবে জনসাধারণের ভোটে জামাতে ইসলামের ভায়েরা আসেন নিজামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ আসুন সকলে আসুন ভোটে আপনারা জয় করুন। ২১ দফার এক দফায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, দুনিয়ার ইতিহাসে এই ধরনের নাই। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ২১ দফায় ছিল, আমরা ১২ জন পার্লামেন্টে ছিলাম, যদিও ছাত্র প্রাণ দিয়াছে, আমাদের ১২ জনের ধাককায় বাঙ্গালি কিছু ব্যবসা চোখে দেখছে, আর মাত্র ৬ মাস দেখবেন। আপনি বলেন গৃহযুদ্ধ হবে, তোমার গুলি করবার অধিকার আছে, আমার গুলি খাবার অধিকার আছে, তোমার জেল দিবার অধিকার আছে, আমার জেল খাটবার অধিকার আমার আছে, তুমি Civil War কাহার সঙ্গে করবে, রিফিউজীর সঙ্গে, ওরা আমার ভাই পূর্ব বাংলার মানুষ এমন নিমক হারাম নয়, আমরা বাঙালিরা কোটি কোটি টাকা Tax দিয়েছি রিফিউজিদের জন্য, আসাম থেকে ৫ লক্ষ রিফিউজী আসছে তাদের কিছু হয় নাই। ৬ দফায় আয়ূব

সাহেব ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। মোনায়েম বলেছেন গভর্নরের উচিত সত্য কথা বলা, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় রাষ্ট্র প্রধান হইয়া বাঙালি জাতি ধরে যে গালি দিয়াছে ইংরাজ তাহা পারেনি। আপনি রাজশাহী মিটিংএ বলেছেন বাংলার মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে জুতা পায়ে দিতে পারিনি, মুসলমান জমিদার হিন্দুদের উপর হিন্দু জমিদার মুসলমানের উপর অত্যাচার করেছে। আজ জাতি তুলে গালি দেয়, প্রেসিডেন্ট, যার কথার দাম আমরা দিই না, দুনিয়া দাম দেন, তিনি আমার ৫$^{১}/_{২}$ কোটি মানুষের জাতিকে গালি দিয়া গেলেন। আমরা জুতা পায়ে দিতে পারি না আপনি শেখাইয়াছেন। কত বড় অন্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এসব বলেন, আজও দেখি এই বাংলাদেশের লোক এখন আয়ূব জিন্দাবাদ দেন, আমি হলে মাথা ফাটিয়া দিতাম। রাত্রের অন্ধকারে ক্ষমতা নিলেও তাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মানতে হবে। আয়ূব সাহেব বাংলার অর্থ না হলে মরুভূমিতে এমন করতে পার না, আয়ূব সাহেব ৩টা রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে করেছেন, রাজধানী যেখানে থাক মানুষ সেখানে সুযোগ পায় সুবিধা পায় সেখানে কোটি কোটি টাকার ডেভলপমেন্ট করা হইয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তান রাওয়ালপিন্ডি সেখান থেকে করেছেন। এখন ইসলামাবাদে সেখানে ৫০০ শত কোটি টাকা খরচ হবে, কাহার টাকা জনসাধারণের টাকা না আয়ূব সাহেবের নিজের টাকা। আজ বন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হইয়া যায়, সোহরা্ওয়ার্দীর ক্রগ মিশন দেশের মধ্য করলে এখানে বন্যা হত না। ৫০০ কোটি টাকায় ইসলামাবাদে করিয়াছেন অনইসলামিক কাজ। আমানতের টাকা যে খেলাফ করে তাকে বেইমান বলে, ঢাকায় রাজধানী করেছেন তার নাম প্রোগাগান্ডা রাজধানী। বন্ধুগণ, ৩টা মিলিটারী হেডকোয়ার্টার তোমার ওখানে বৈদেশিক এ্যামব্যাসি ওখানে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ্যাডমিনিসট্রেশনে শতকরা ৩২ টাকা ও ৬২ টাকা দশ রক্ষায় ব্যয় করা হয়, এই ৯৪ টাকা ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, আমরা ৫৬ জন তোমরা ৪৪ জন। বৈদেশিক মুদ্রা ৭০ টাকা আয় করি আমি ৩০ টাকা আয় কর তুমি, আমি করি ৭০ টাকা তুমি ৩০ টাকা, এই ভূড়িওয়ালারা এসে সব নিয়ে যায় শিল্প কারখানা তাদের হাতে। একটা ফার্মের কথা জানি ৪০ জন ম্যানেজার আছে এর একটাও বাঙ্গালী নয়। তোমরা বড় শিল্প কারখানার মালিক কি করেছেন প্রফিট করে। বাঙ্গালীর স্থান কোথাও তোমরা রাখ নাই। আজ বৈদেশিক মুদ্রা কে আয় করে পাটের চাষীরা। ভায়েরা আমার আপনারা বাঁচতে পারবেন না। আমি জানি আয়ূবের ক্ষমতা এসব জেনেও নেমেছি, বিবেক বলে একটা জিনিষ আছে। আজকে আপনাদের কাছে বলতে চাই আজকে আমাদের চাষীদের কেমন করে দাম পায় নাই, এটা বলতে গেলে অনেক সময় দরকার, গভর্নমেন্ট সময় বুঝে পলিসি দেয় ফলে ভূড়িওয়ালারা যথেষ্ট দাম পায়। বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানে তিনভাবে শোষণ করা হয়। এই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়া গেলে আপনাদের সংসার থাকতে পারে না। এটা সহজ কথা। আজকে তাই বৈদেশিক মুদ্রা আপনি আয় করেন পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়, দুনিয়া থেকে

ঋণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়, ৫০ কোটি টাকা সুদ দিতে হয় পূর্ব বাংলার চাষীদের। সেই জন্য আজকে বাধ্য হইয়া আমি ৬ দফা দিয়াছি। ৬ দফায় কি ঘাবড়িয়ে গেছে, কোন জায়গায় হাত পড়েছে। এতদিন বলেছি স্বয়ত্তশাসন চাই। স্বায়ত্তশাসন কি আকাশ বাতাস কি স্বায়ত্তশাসন। স্বায়ত্তশাসন একটা জিনিস পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ ক্ষমতা। একটা দাবি জনগণের ভোটে পাকিস্তানে ফেডারেশান হবে জনগণের ভোটে পার্লামেন্ট হবে। আমাদের প্যারিটি দিতে হবে আর বিশ্বাস করিনা এখন সোজাসুজি দাবি ১নং দাবি পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী সরকার জনগণের ভোটে হবে। এইটা দাবি আইয়ূব খান মানতে পারে না। দুই নং দাবি বলেছি ওখানে কিছু কিছু ক্ষমতা থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, করাচী পনেরশ মাইল দূরে আমাদের একটা লোকের রাজধানী দেখার সৌভাগ্য হবে না। সেজন্য বলেছি ওখানে দুইটা ক্ষমতা থাকবে। ১টা হল দেশ রক্ষা, আর বদেশিক নীতি আর কোন ক্ষমতা থাকবে না। তারা বলে কেমন করে হয় কেন্দ্র দূর্বল হবে, দেশরক্ষা যার হাতে আছে, কেন্দ্র দূর্বল হয় নাই। আইয়ূব সাহেবের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছিল কেন যুদ্ধের সময় আসতে পারলেন না, কেন তুমি যুদ্ধের সময় সৈন্য পাঠাতে পার নাই। কেন যুদ্ধের সময় সবুর মিয়া আটকে ছিল। কেন ওনি যাওয়ার পারলো না। ভাইয়েরা যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে যে অবস্থা চলছে সেজন্য দেশরক্ষা আর বৈদেশিক নীতি তাদের। আর একটা ৩নং, মুদ্রা পাকিস্তানের দুইটি মুদ্রা হবে, একটা মুদ্রা দুনিয়ার অনেক দেশে আছে, দুই মুদ্রাও আছে। আমেরিকার প্রত্যেক ষ্টেটে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক আছে। ইংল্যান্ডে আছে, রাশিয়াতে যেখানে Finane Deptt. নেই। আজকে রাশিয়ার থেকে পাকিস্তান শক্তিশালী হয় নাই। তার ভয়ে আমেরিকার পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়। তাই সেইজন্য বলেছি ১টা মুদ্রাও হতে পারে দুই মুদ্রাও হতে পারে। এক মুদ্রা হলে লেখা থাকবে পাকিস্তান মুদ্রা লাহোর, পাকিস্তান মুদ্রা ঢাকা, যাতে ভূড়ীওয়ালারা টাকা কামাই করে পশ্চিম পাকিস্তানে না নিতে পারে। সেজন্য এখানে ক্যাপিটাল ফরমেশান হতে পারে না এইজন্য আমাদের সিহাবের প্রয়োজন আছে। এক মুদ্রা থাকলে আমাদের হিসাব থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিতে পারবে না, এই দেশের Industry তে খরচ করতে হবে।

তুমি কামাই করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। বাহির কর ইতিহাস। আইয়ূব খান ইতিহাস পড়ার সময় পায় নাই, লেফ রাইট করতে সময় চলে গিয়েছে। আজকে আদমজী এখানে Income করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়, জাকাত পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের টাকা নিতে পূর্ব পাকিস্তানের পারমিশান নিতে হবে। সেজন্য এক মুদ্রা হতে পারে দুই মুদ্রা তে পারে এক মুদ্রা হলে কনষ্টিটিউশানে রেস্ট্রিকশান থাকতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে সোনার দাম ১৫০ আর পশ্চিম পাকিস্তানে

সোনার দাম ১২০ টাকা, যদি কোন লোক করাচী থেকে ঢাকা আসে এরোপ্লেনে, তখন এয়ারপোর্টে কাষ্টম হয় বলতা হ্যায় সোনা হ্যায়! কেমন করে হয় ১৫০ টাকা পূর্ব পাকিস্তান আর ১২০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে, নোটের কোন দাম নাই। সেজন্য দুই মুদ্রা অথবা এক মুদ্রা, যুদ্ধের সময় আপনারা জানেন পূর্ব বাংলা ষ্টেট ব্যাঙ্কে এক ছটাক সোনা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান সব সোনা ছিল। যুদ্ধের টাকা দিয়ে কেহই মালপত্র দিবে না, যুদ্ধের সময় ঢাকার State Bank এক ছটাক সোনা ছিল না। কারখানার মালিক তারা চান ভাল করে সিগারেট বিক্রি করতে পারে। ভাইয়েরা সংঘবদ্ধ হউন, গোড়ায় হাত দিয়েছি, আমি এমন জায়গায় হাত দিয়েছি, অনেক মিয়াদের মাথা খারাপ হয়েছে। এই বাংলাদেশের পলি মাটিতে যেমন ফসল হয় তেমনি জঙ্গলও হয়, এই বাংলাদেশেল দুঃখের জন্য বাংলার লোক দায়ী। গ্রামের লোক ছাড়া গ্রামে ডাকাতি করতে পারে না। আমি চাই ইঁদুরের দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। আইয়ূব সাহেব মেহেরবানী করে সাড়ে পাঁচকোটি লোকের ভোট দেন তারপর আপনি শতকরা ৭০ টা ভোট পান যদি আমি রাজনীতি ছেড়ে দিব, রাজনীতি করব না। আপনাদের কাছে অনুরোধ ত্যাগ এবং সংগ্রাম ছাড়া কোন দিন কোন কাজ আদায় হবে না। এক টাকা ভাগ করে নিতে পারি তাহলে সব দাবী আদায় হবে। ছয় দফা দাবি তোমাদের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম। বন্ধুরা আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করছি, ওয়াদা করছি যদি আইয়ূব সাহেব বাহিরে রাখেন ইনশাল্লা আবার আসব মাত্র পাঁচটা মামলার আসামী। যুবক ভাইয়েরা গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে যান, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, গোলাম হয়ে যাবেন। আচ্ছালা-মু-আলাইকুম।

মোঃ শামছুল হক

মোঃ মোজাম্মেল হক

গভঃ রিপোর্টার

০৪.০৫.৬৬ ইং।

উৎসঃ Secret Documents of Intelligence Branch of Father of the Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Volume 10, P- 439.

পরিশিষ্টঃ ১০

৬-দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে যশোরে জনসভা

ইংরাজী ১৫/০৪/৬৬ তারিখে যশোর জেলার অধীন টাউন হল ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভার প্রধান বক্তা শেখ মুজিবর রহমান বাংলায় বক্তৃতা করেন। দুইজন বাংলা রিপোর্টার কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা লিখতে সমস্ত বক্তৃতা ৫(পাঁচ) পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বক্তৃতার ১ম ৩য় ও ৫ম পর্যায়ের পদানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। ২য় ও ৪র্থ পর্যায়ের পদানুবাদ যথাস্থানে সংযোজিত হল।

শেখ মুজিবর রহমান
১ম পর্যায়

মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমার যশোরের ভাইয়েরা, আমি ভাবি নাই এত তাড়াতাড়ি বক্তৃতা করতে হবে। হঠাৎ হুকুম হল। আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা শুভ সংবাদ দেই। আয়ুব সাহেবের Foreign Minister জনাব ভুটটু সাহেব আমাকে Challenge করেছিলেন-তিনি আমার সঙ্গে পল্টন ময়দানে মোকাবেলা করবেন আমি তা গ্রহণও করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ১৭ই তারিখে আমি রাজী আছি। কিন্তু আজ ১২ টার সময় আমার সেক্রেটারী জানালেন তাঁর সঙ্গে সেখানে আলোচনা হয়েছে, তিনি সসম্মানে পশ্চাৎপসারণ করেছেন। আয়ুব খাঁ আমার ৬ দফাতে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন আমাকে খতম করবেন বলে হুমকী দিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধের হুমকী দিয়েছিনে। তাই জনাব ভুট্টুর কথার উত্তরে বলেছিলাম আপনি নিজে যদি দরকার হয় আপনার প্রেসিডেন্ট সহ হাজির হন। কিন্তু আজ দুপুর ১২ টার সময় তিনি বললেন, আমার নানা অসুবিধা আছে। কারণ তিনি বুঝেছেন বাংলাদেশের জনসাধারণ ৬ দফা চায়। এটা ভুট্টু কেন আয়ুব খাঁ, মোনায়েম খাঁও অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই জন্য বলি ৬ দফা মেনে নিন, দেশের মঙ্গল হবে।

আয়ুব খাঁ ক্ষেপে গেলেন কেন? তিনি আমাদেরকে হুমকী দিলেন। বললেন সমূলে ধ্বংস করে দিব। আমরা বললাম, জেল আপনি দিতে পারেন। কারণ Emergency বা Defence of Pakistan Rules আপনি ভোলেন নাই। আপনি আমিরুল মোমেনিন আপনি সব পারেন। তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে আমি আজ এই যশোরের জনসভায় বলতে চাই আপনার

জেল আমাদের খাটা আছে, আপনার মামলার আসামী আমরা হয়েই আছি, আপনি সব করতে পারেন কিন্তু মারতে পারবেন না, সেটা আমার হাতে। সেই জন্য আপনাকে জানায়ে দিতে চাই আপনাকে আমরা ভয় করি না। আমাদের এই গণআন্দোলন ৬ দফা দাবী থামবে না। এই ৬ দফা আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ এবং জনসাধারণ যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছে।

আজ আয়ূব খাঁ শুধু নন, মন্ত্রী সাহেবরাও কি লাফাতে আরম্ভ করেছেন ছাগলের মত। তারা বলছেন পূর্ব বাংলার লোক ৬ দফা চায় না। তা হলে আয়ুব খাঁ ঘাবরায়ে গিয়েছেন কেন? যুদ্ধ না করেই আপনি Field মার্শাল হয়েছেন- পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্টও আছেন ৭ (সাত) বছর। এর পরেও এত ঘাবরায়ে গিয়েছেন কেন? আপনার কামান আছে, বন্দুক আছে, জেলখানা আছে, মোনায়েশ খাঁর মত খাদেম আছে, আমরাও রাজী আছি। কিন্তু জন সাধারণের দাবী কেউ দাবায়ে রাখতে পারে নাই। আপনিও পারবেন না। আয়ুব খাঁ সাহেব ঘাবরায়েছেন। মন্দ নয়! তবে আমরা জানি দুনিয়ার মানুষ জেনে ফেলেছে ১৮ বছর পর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে পূর্ব পাকিস্তানকে আপনি শোষণ করেছেন আপনার দল বল শোষণ করেছে।

কেন আমি এই ৬ দফা দিলাম, কেনই বা আওয়ামী লীগ এটা সমর্থন করল? আজ এই যে ৬ দফা দাবী করছি সেটা আপনাদের কাছে ভোট চাওয়ার জন্য আনি নাই। কারণ রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আয়ুব খাঁ সাহেব বেঁচে থাকলে ক্ষমতা ছাড়ার আশা নাই। এই ৬ দফা আওয়ামী লীগের নয়- মুজিবরের নয়- পূর্ব বাংলার কোটি মানুষের বাঁচা মরার দাবী তথা পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী। ১৭ দিন যুদ্ধের সময় আয়ুব খাঁর কাছে প্রশ্ন করতে চাই ১৭ দিন যুদ্ধ চলেছিল পূর্ব পাকিস্তানে আপনি কি আসতে পেরেছিলেন? আপনার C-in-C যিনি ছিলেন তিনি কি আসতে পেরেছিলেন ? টোটা, বন্দুক, বুলেটেন কারখানা আছে এখানে? আপনি এখানে আসতে পেরেছিলেন ? দুনিয়া থেকে আমরাআলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের যাওয়া জায়গা আছে। পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তান যাওয়া যায় ,করাচী থেকে সউদী আরবে যাওয়া যায়। হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাদের রাস্তা ছিল কিন্তু পূর্ব বাংলার ৫ কোটি লোকের কোন রাস্তা ছিল না।

তাঁকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে ৫ কোটি মানুষ যুদ্ধের সময় কি করে ছিল সে খবর আপনি নিতে পেরেছিলেন? কোন Legal Govt. পূর্ব বাংলায় ছিল? ছিল না। কারণ টেলিফোন মারফত সরকার চলতে পারে না-সরকার চলতে পারে লেখার খবরের মারফত। আপনার

কোন খবর আসতে পারে নাই। যুদ্ধের সময় যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হত তাহলে আপনি সৈন্য পাঠাতে পারতেন না। যদি না পারেন আমার রক্ষা করতে আপনি বলছেন যে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভর করে। আমি বলতে চাই পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্ভর করে। কেন আপনি পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন? আপনি বলেন- 'দিল্লী লে লেঙ্গে' কিন্তু লাহোরের অবস্থা কি হয়েছিল? সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেত খাদ্য সামগ্রী ফুরায়ে যেত Bank এর টাকা ফুরায়ে গিয়েছিল-মালপত্র দুনিয়া থেকে আসতে পারে নাই সেই অবস্থায় ১৫ শত মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা দরকার তা আপনারা বুঝেন না।

আপনারা ৩টি রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে করেছেন। করাচী রাজধানী পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেটা আপনি পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে দিয়েছেন যার আয় বছরে ৩০ হতে ৪০ কোটি টাকা। কোন অধিকারে করাচী রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানকে দিয়েছিলেন? পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন? তারপর রাওয়ালপিন্ডিতে আর একটা রাজধানী করেছেন। তারপর ইসলামাবাদে একটা করেছেন যেখানে মানুষ, গরু, পশুপাখী কিছু নাই। সেখানে অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন। অথচ আমরা শতকরা ৫৬ জন আপনারা শতকরা ৪৪ জন। রাজধানী যেখানে থাকে মানুষ সেখানে সুযোগ সুবিধা পায় আমরা কিছুই পাই না। পাকিস্তানে শাসন চালাতে শতকরা ৯৪ টাকা ব্যয় হয় আপনি Militaryর Head Q. করেছেন রাওয়ালপিন্ডিতে Air Force এর Head Quarter পেশোয়ারে, নৌবাহিনীর Head Quarter করাচীতে। যুদ্ধের সময় চট্টগ্রামকে রক্ষা করার জন্য একটা যুদ্ধ জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানে ছিল? ছিল না। কেন ছিল না? আমরা শতকরা ৫৬ জন আপনারা শতকরা ৪৪ জন। ৩০ লক্ষ মুসলমান কাশ্মীরে তাদেরকে রক্ষার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যুদ্ধ করলেন আর ৫ কোটি মানুষকে রক্ষার জন্য আপনি কিছুই করলেন না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে নৌবাহিনী এর মধ্যে বাঙ্গালি নেওয়া হয় নাই কেন? আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন করতে চাই যখন আপনি C-in-C ছিলেন তখন এক গোপন Circular দিয়েছিলেন যে দুই জনের বেশী বাঙালি সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হবে না-আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই জন্যই ভুট্টু সাহেবকে ময়দানে চেয়েছিলাম। সেখানে সব কথা বলার সুযোগ ছিল কারণ অনেক কথা খুলে বলা যায় না।

আজ সৈন্য বাহিনীতে ১০ জন বাঙ্গালী নেন নাই বলেন, তাদের মাজা ছোট, সিনা কম লম্বায় ছোট। যার একটা জাপানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে আসুন, চায়নার সঙ্গে যুদ্ধ করে আসুন তারাও তো ভাত খায়। যুদ্ধ করতে হলে মগজের প্রয়োজন বাঙালীর মগজ আছে। পানির মধ্যে আমরা বাস করি খেলি আমি সন্দ্বীপ গিয়েছিলাম। সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। জাহাজ থেকে নামলে সাম্পান নৌকায় করে নামতে

হয়। সেই পানির মধ্যে আমার দেশের লোক বাস করে নৌবাহিনীতে আমরা সৈন্য হতে পারি না, যারা হাঁটু পানিতে ডুবে মরে তারাই নৌবাহিনীর সৈন্য যারা পানি চোখে দেখে নাই তারাই নৌ বাহিনীর সেনাপতি আর যারা পানিতে বাস করে খেলে তারা নৌবাহিনীতে যেতে পারে না। এইভাবে আমাদের সর্বনাশ করছেন। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা যখন চেয়েছিলাম তখন আপনারা বলেছিলেন হিন্দুরা পাজামা পরে পশ্চিম বাংলা থেকে এসে বাংলা চেয়েছিল কিন্তু গলির পর যখন ৪ জন ছেলে মারা গেল তখন দেখা গেল তারা সবাই মুসলমান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা আপনাকে দিতে হয়েছে, কিন্তু রক্তের বিনিময়ে। আজ আপনি কাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলেন নাই। ৫৪ সালে শতকরা ৯৭ জন বাংলাদেশের লোক মোসলেম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল আপনারা করাচীতে বসে ৯২ক ধারা জারী করেছিলেন শেরে বাংলাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন-আমাকে গ্রেফতার করেছিলেন। আমি জেল খানায় গিয়েছিলাম ৫০ জন এমএলএকে গ্রেফতার করেছিলেন। প্রায় ৪ হাজার লোককে সেই সময় গ্রেফতার করেছিলেন। শেরে বাংলাকেও আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী বলেছেন, ছাত্রদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলেছেন, শ্রমিকদেরকে বলেছেন রাজনৈতিক কর্মীদেরকে বলেছেন। কাকে বলেন নাই? বৃদ্ধ বয়সে সোহরাওয়ার্দীকেও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যিনি না হলে পাকিস্তান আসত না তুমি Field মার্শাল কর্নেলের বেশী কিছু হতে পারতে না। তুমিই সোহরাওয়ার্দীকে জেলে দিয়েছিলে। যার জন্য তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় যার জন্য বৈরুতের এক নির্জন প্রকোষ্ঠে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তিনি পাকিস্তানএনেছেন না আয়ুব খাঁ এনেছেন? কোথায় ছিলেন তিনি? তাঁর নাম কেউ তখন শুনেছিলেন? আমি জানি পাকিস্তান হওয়ার পরে তিনি একজন কর্ণেল ছিলেন এই হল অদৃষ্টের পরিহাস। তাকে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী বলেন নাই? আমার বিরুদ্ধে ৩টা রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা চলছে, আরও কিছু করার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমিও রাজী আছি।

আপনারা যুক্ত নির্বাচন যখন চেয়েছিলেন । তখন বলেছিল হিন্দুরা মুসলমানের সঙ্গে ভোট দিলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। আয়ুব খাঁ এখন যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এখন পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে াবে। আয়ুব খাঁ এখন যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এখন পাকিস্তান ধ্বংস হয় না? ১৮ বছর পর্যন্ত কি করেছেন আপনারা? আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী, ঠিক আছে যা বলেন বলার আপনার মুখ আছে্ আপনাদের কাছে একটা উত্তর চাই পাকিস্তানর প্রেসিডেন্ট যেভাবে আপনি হযে গিয়েছেন যদিও পাকিস্তানের লোক দাম দিক আর না দিক, দুনিয়ার মানুষ আপনাকে দেয়, অন্ততঃপক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে। আপনি রাজশাহীতে বলেছিলেন বাংলাদেশের মুসলমান জুতা পায়ে দিয়ে হিন্দুর কাছে যেতে পারে নাই। আমরা নাকি জুতা পরতে জানতাম না, উনি আমাদেরকে জুতা পরতে শিখায়াছেন, এই কথা তিনি দুনিয়ার লোককে জানালেন। ওয়াশিংটন থেকে

মস্কো ও পিকিং পর্যন্ত এই কথা বলে গেল যে আমরা বাংলার মুসলমান জুতা পরতে পারতাম না হিন্দুর সামনে। আমরা কৃতদাস ছিলাম slave ছিলাম, অসভ্য ছিলাম, উনি আমাদেরকে সভ্য করতে এসেছেন। তবে জুতা আমি পায়ে দিয়েছি কি না জানি না। কিন্তু এইটুকু জানি যে আপনার মাত ইংরেজের জুতা আমরা পালিশ করি নাই।

২য় পর্যায়

আমরা বাংলাদেশের মানুষ কৃতদাস ছিলাম, স্লেভ ছিলাম, আপনি আমাদের সভ্য করতে এসেছেন। জনাব আয়ূব সাহেব আপনাদের মত আমরা ইংরেজের জুতা পালিস করিনি (সভায় গোলমাল ও হাতাহাতি) ভায়েরা আমার এই রকম যদি আনপাদের ধৈর্য হয় তাহলে আমি বক্তৃতা ছেড়ে দিই, বসেন বসেন আপনারা। যাহা বলেছিলাম ভাই, আমি আয়ুব সাহেব আমাদের জাতি তুলে গালি দিয়াছেন তিনি ইতিহাস পড়েনি, ইতিহাস পড়বার সময় ছিল না, কারণ তখন তিনি ইংরেজের চাকরী করছেন। বাংলা থেকে ইংরেজ শাসন নিয়াছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার নিকট থেকে ক্ষমতা নিয়াছিলেন তখন সেই আয়ুবের দল রণজিৎ সিংহের গোলাম ছিলেন, ১৫০ বছর গোলাম ছিলেন-ইতিহাস পড়বার সময় নাই, লেফট রাইট করতে সময় গিয়াছে। আয়ুব সাহেবকে জানাইয়া রাখি আজ যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ৫$^{১}/_{২}$ কোটী লোককে গালি দেওয়া কত জঘন্য তিনি বলেছেন এক দফা Civil War হবে, কাহার সঙ্গে হবে। আমি যদি গৃহযুদ্ধের কথা বলি গভর্নমেন্ট আমার বিরদ্ধে মামলা করবে। রাষ্ট্র প্রধানের কতগুলি অধিকার থাকে তাকে কোর্টে বিচারে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্র প্রধান না হলে তাকে আমি মনে হয় কোর্টে নিয়া হাজির করতাম। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? রিফিউজী, তারা আমার ভাই, পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়াছে। এটা তাদের এখন জন্মস্থান এটা রক্ষা করবার দায়িত্ব তাদের, তার সঙ্গে আমাদের ভাই ভাই সম্বন্ধ কিসের গৃহযুদ্ধ, আয়ুব সাহেব পরীস্কার করে বল্লে ভাল হয়। বাংলায় কতকগুলি বড় শিল্পের মালিক আছে। ২/৩ লক্ষ টাকা নিয়া এসেছিল এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। তারা ব্যাঙ্ক ইনসিউরেন্স এর মাধ্যমে এখান থেকে টাকা নিয়া যায়। আয়ুব সাহেব যখন এসেছিলেন তাকে তারা দাওয়াত করে খাওয়ায়, তারা বলেন মুজিবরের ৬ দফায় আমাদের অবস্থা খারাপ। আমি বলি তোমার বাংলাদেশের বাণিজ্য কর ভাল কথা। এখান থেকে আয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়া যাও। তোমাদের চিন্তা করা উচিত, এইভাবে চলবে না তোমার একদিন না একদিন টাকা ফেরত দিতে হবে। আমার ৬দফা কি। জনসাধারণের ভোটে পাকিস্তানে ফেডারেশন হবে, জনসাধারণের ভোটে পার্লামেন্ট এটা সব ক্ষমতার মালিক হবে। আয়ুব মানতে পারে না, তিনি রাত্রের অন্ধকারে ক্ষমতা নিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য পাকিস্তান হইয়াছে আয়ুব সাহেবের লেফট রাইটের

জন্য পাকিস্তান আসেনি। ১নং কেন্দ্রীয় সরকারের ২টা ক্ষমতা থাকবে, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। দেশরক্ষা যাদের হাতে থাকে ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে, পার্লামেন্ট এসব কন্ট্রোল করবে। এতে আয়ুব খান একটু ঘাবড়িয়ে গিয়াছে, সব পাতি শেয়ালের এক লেজ। মুদ্রা হয় ২টা, না হয় ১টা মুদ্রা হবে। পাকিস্তানে নোট দেখেন এর কোন দাম নাই, যে পরিমাণ সোনা জমা থাকে সেই পরিমাণ নোট ছাপানো হয়। সেখানে থাকবে পাকিস্তান নোট ঢাকা পাকিস্তান নোট লাহোর যুদ্ধের সময় দেখেছি পূর্ব বাংলার ষ্টেট ব্যাঙ্ক এ ১ ছটাক সোনা ছিল না, আর ১৫ দিন যুদ্ধ থাকলে সোনা দিয়া মাল কিনতে হত, ১৮ বছরে সমস্ত সোনা করাচী শহরের State Bank এ জমা আছে। পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় শিল্পপতিরা আছেন তারা এখান থেকে সমস্ত টাকা নিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করেন যাকাত পর্যন্ত দেয় না সেই জন্য পূর্ব বাংলার কোনদিন মুক্তি আসবে না। আমি বলি পাকিস্তানে ২ মুদ্রা আছে, যেমন ধরেন ২ অর্থনীতি পশ্চিম পাকিস্তানে সোনা ১২০ টাকা পূর্ব পাকিস্তানে মোসা ১৫০ টাকা কেন এই রকম, এটা এক রাষ্ট্র? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১ ছটাক সোনা এখানে আসতে পারে না, সোনা নিয়া আসলে কাষ্টম সেটা নিয়া নেয়, এই সোনা নাকি ভারতে পাচার হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাসা করি মার্শাল'র সময় আরব সাগরে কয়েক টন সোনা পেয়েছিলেন সেটা কোথায় যশোরে না করাচিতে। এই যুদ্ধের সময় খেমকারামে বলে জাগায় সেটা পাকিস্তানের সৈন্য দখল করলে তারা দেখে হিন্দুস্তানের গোডাউনে পাকিস্তানী গম, পূর্ব পাকিস্তানের বস্তা আর লাহোরের গম ৪০ হাজার মন, আমি আয়ুবকে জিজ্ঞাসা করি এটা কোথায়? আমার সোনা আনতে হলে পারমিশন আর তোমার লাগেনা। এই সোনার পরিমাণে নোটের দাম হয়, যাহারা অর্থনীতির ছাত্র তারা স্বীকার করবেন। তোমার কাপড়ের দাম ২ টাকা আবার ৬ টাকা। আমার পূর্ব বাংলায় জিনিসের দাম ১০ টাকা। মুসলমান ভাই ভাই, তুমি খাবে আমি না খাইয়া মরব? আয়ূব সাহেবকে সেই জন্য আজকে চেক দেওয়া দরকার। রাশিয়া দুনিয়ার মধ্য শক্তিশালী দেশ যাহার কথা শুনলে আমেরিকার কাম নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে তাসখন্ডে আয়ূব সাহেব গিয়াছিলেন কসেগিনের কথায় ভয়ে সই করেছেন সেই রাশিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থ দফতর নাই, প্রাদেশিক সরকারের অর্থ দফতর আছে। তাসখন্দে উজবেকিস্তান তাদের আলাদা ফ্ল্যাগ আছে আলাদা পার্লামেন্ট আছে তথাপিও তারা রাশিয়ার একটা প্রদেশ। ইউক্রেন বাইলো রাশিয়া ইচ্ছা করলে জাতিসংঘে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। আয়ূব সাহেব আপনি পড়েননি কি করে বুঝবেন। তাই ২ রকমের নোটি হবে তাহলে আমি বুঝতে পারব কত এখান থেকে গেল। যত পরিমাণ নোট ছাপানো হবে সেই পরিমাণ সোনা উভয় ষ্টেট ব্যাঙ্কে থাকবে। জনাব আমাদের ওই কাগজের নোটের দাম নাই। পূর্ব বাংলায় সোনা নাই সব সোনা নিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই বলি পূর্ব বাংলার কোন ব্যবসায়ী এখান থেকে ব্যবসা করে টাকা পয়সা পারমিশন ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়া যাইতে পারবে না, ১৮

বছর তুমি সব নিয়াছ। ৪নং খাজনা Tax কেন্দ্রীয় সরকার সব Tax ধরেন ১৮ বছর পর্যন্ত সেল ট্যাক্স কাষ্টম ট্যাক্স দুনিয়ার Tax । আমরা Tax দিই তারা পশ্চিম পাকিস্তান মরুভূমিতে সুজলা সুফলা করেন, ৫০০ কোটি টাকা দিয়া ইসলামাবাদে অনইসলামিক কাজ করছেন। আমি বলছি তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিজ নিজ Tax করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের যাহা প্রয়োজন আমরা দিব। ব্যাপার কি জানেন আমার টাকা নিয়া বলেন পূর্ব বাংলাকে এই দিয়া দিলাম, ওনার জমিদারি থেকে দিলেন আর মোনায়েম বলেন আমার প্রেসিডেন্ট এই দিলেন, আমার প্রেসিডেন্ট এই দিলেন, কেন দিল আমার টাকা Tax নিয়া যাও শতকরা ৮০ টাকা নিয়া ২০ টাকা দিলাম।

৩য় পর্যায়

আমার Tax আমি তুলি পশ্চিম পাকিস্তানের Tax পশ্চিম পাকিস্তান তুলুক। Parliament আইন করে দিবে কত টাকা পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে, কত টাকা পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের জন্য দিতে হবে। তাতে আঁতকে উঠেছেন কেন? লজ্জা হয় না। ১৮ বছর খেয়েছ, হিসাব নিকাশ চাই। আমার বন্ধু মিজানুর রহমান হিসাব দিবেন উনি Parliament এর Member.

ভাইরা এই হল চতুর্থ দফা। ৫ম দফা হল এটাতেই তাদের মাথাটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তান আয় করে পাট, চামড়া, মাছ দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের আয় শতকরা ৭০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৩০ টাকা। পূর্ব পাকিস্তান আয় করে শতকরা ৭০ টাকা যেখানে ব্যয় করা হয় শতকরা ৩০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তান আয় করে শতকরা ৩০ টাকা সেখানে তার জন্য বয় করা হয় শতকরা ৭০ টাকা। এই কি ইনসাফ? তিন রকমভাবে তারা বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে এক হল আমাদের আয় থেকে, দ্বিতীয় আমার এই বৈদেশিক মুদ্রা, আমাকে Mortgage দিয়ে যে Loan এনে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তার সুদ আমাকে দিতে হয়। উনি Building করে আরামে থাকেন, আরামে খান আর সুদ দেই আমি। চম'কার। আমাকে Mortgage দিয়ে উনি আরাম করেন। ভালই হয়েছে। প্রতি বছর যে ৪০ কোটি টাকা সুদ দিতে হয় তার ৪০ কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানকে দিতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি আমি আপনারা তা বেশী করে ব্যয় করেন। আয়ুব খাঁ যা দেনা করে তা আমাকে Mortgage রেখে।

আমরা বলছি আর কষ্ট করতে হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের Bank এ থাকবে, পশ্চিম পাকিস্তানের Bank এ পশ্চিম পাকিস্তানের আয় থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকারের যা প্রয়োজন তা আমরা দিব। আর যে টাকা তুমি দেনা করেছ সেই টাকার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান কত খরচ করেছে, পূর্ব পাকিস্তান কত খরচ করেছে?

আমি যা খরচ করেছি তার সুদ আমি দিব তুমি যা খরচ করেছ তার সুদ তুমি দিবে। এইখানে আয়ুব খান পাগল হয়ে গেছেন। জায়গা মত হাত পড়েছে। কারণ ১৮ বছর পর্যন্ত তুমি আমানত খেয়ানত করেছ। ৬ দফার আর একটা দফা আছে সেটা হল Para Military অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে সৈন্য বাহিনী Recruit করতে হবে। এটা নূতন নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আছে, E.P.R পশ্চিম পাকিস্তানে আছে Rangers অর্থাৎ যারা Border পাহাড়া দেয়। দুইটি দুই Govt. এর সম্পত্তি। যদি তাই থাকে তা'হলে Para Military তে আপত্তি কি? পূর্ব বাংলাকে রক্ষা করতে হলে পূর্ব বাংলার ছেলেই তার মা বোনকে রক্ষা করতে জীবন দিবে। তুমি আমাকে ১৮ বছর ধোকা দিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কেটে গেছে। আমার আমানত খেয়ানত করেছ। মুসলমান হিসাবে হিন্দুকে বিশ্বাস না পাঞ্জাবীকে মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করেছিলাম, রাজধানী সেখানে দিয়াছিলাম অর্থাৎ আমার সম্পত্তি তোমার হাতে দিয়েছিলাম আমার অর্থ তুমি লুট করেছ ১৮ বছর পর্যন্ত বাংলার কৃষককে ভিখারী করেছ তোমার সঙ্গে আপোষ নাই। সোজা কথা দিবে না দিলে কেমন করে আদায় করতে হয় তা বাঙ্গালী জানে। তুমি বাংলার ইতিহাস জাননা এটা তিতুমীরের দেশ এটা সূর্য্য সেনের দেশ, এটা সোহরাওয়ার্দীর দেশ, এটা রণজিৎ সিংহের দেশ নয়। এটা বালু মাটির দেশ এখানকার মাটি বর্ষাকালে কাদা হয় আর চৈত্র মাসে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় যার আঘাতে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বাংলার মাটি বড় খারাপ বড় ভাল। আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের আবর্জনা বাংলাকে শেষ করে দিল। পরগাছা না কাটলে গাছ মরে, ফল দেয় না। পরগাছা কাটলে গাছ বাঁচে। ভাইরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ইনশায়াল্লাহ জয়লাভ করব।

৪র্থ পর্যায়

আজ দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয়, যে জঘন্য অত্যাচার চলছে পাকিস্তানে তার একটা আমি বলছি, আমাদের দেশের যুদ্ধের পরে টেন্ডু পাতা আমদানী বন্ধ করে ৭ লক্ষ বিড়ী শ্রমিককে বেকার করা হইয়াছে এখানে টেন্ডু পাতা আসতে পারে না পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে পারে, আমরা এক রাষ্ট্র আমরা

মুসলমান। গভর্নমেন্ট এদের কথা চিন্তা না করে টেন্ডু পাতা আমদানী বন্ধ করলেন। বড় বড় মালিকদের সিগ্রেটের জন্য বিড়ীপাতা বন্ধ করছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে পারে এখানে আসতে পারবে না। গভর্নমেন্ট নেভী ধরেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে ধান নিচ্ছে ১৩১/২ টাকা দরে, এটা গভর্নমেন্ট গোডাউনে আনাইয়া দিয়া আসতে হবে, গ্রামে ২/১ টি লোকের ধান বেশী হয়, আর গভর্নমেন্ট সমস্ত ধান গোডাউনে নিয়া যাচ্ছে। বাধ্যতামূলক নেভী করলে বাধ্যতামূলক রেশনিং করতে হয়, নাহলে গ্রামের লোক না খেয়ে মারা যাবে। গভর্নমেন্টের খেয়াল নাই ইন্দোনেশিয়ায় চাল পাঠান আর আমাদের দেশের লোক না খাইয়া মারা যায়, গ্রামের লোক বাঁচবে কেমন করে। বড় বড় শহরে রেশনিং চাউল দেওয়া হয় গ্রামে দেওয়া হয় না, পাকিস্তান শহরের জন্য না গ্রামের জন্য? তোমার দরকার হলে বিদেশ থেকে আন এটাও একটা Tax নেভীর ধান না দিলে মামলা দেওয়া হয়, কোন মানুষ বাচতে পারে? যুদ্ধের সময় তাঁদের দরকার ছিল। মানুষ দিয়াছে, ২১/২ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে মোনায়েম সেটা ক্যামেরার দিকে দাড়িয়া আয়ুবকে সেই টাকা দিয়াছেন। গরীবের কাছে যখন পাট থাকে দাম ১০/১২ টাকা আর বড় লোকের কাছে গেলে ৩০/- টাকা হয়। আজ ১৮ বছরের মধ্য বাঙ্গালী চেয়ারম্যান জুট বোর্ডে আসেনি। আমার পূর্ব বাংলা আমার ওখানে চেয়ারম্যান, PIDC চেয়ারম্যান করবে তাও তারা করবে না, পোর্ট ট্রাষ্ট এসবের তোমার ওখান থেকে লোক নিয়া এসে চেয়ারম্যান করবে। ইম্পোর্ট লাইসেন্স আগে ক্যাটাগরি ছিল। গভর্নমেন্ট নূতন পলেসি করেছেন। তাতে মাল আসবে। এতে হইয়া বড় বড় ব্যবসায়ী ১০/১২ লক্ষ টাকার মাল আনে ব্যাঙ্কের সাহায্য পায় আর পূর্ব বাংলার যারা মাল আনে তাদের ব্যবসা শেষ হইয়াছে, সবদিক থেকে আপনারা খতম হতে চলেছেন আপনারা জানেন না ৬ দফা দাবী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্ট অর্ডার দিয়াছেন ইত্তেফাক কাগজে পূর্ব বাংলা শোষণ করে টাকা নিয়া গেলেও ইত্তেফাক দেখতে পারবে না, ছাত্রদের মারলেও ঢাকা টাইমস ছাপাবে না। আমার সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে আমি বলতে পারব না লিখতে পারব না এটা কোন গণতন্ত্র, কোন ইনসাফ? আয়ূব সাহেব বন্দুক কামান দিয়া দেশ চলবে না। আজ পর্যন্ত শত শত কেস ছাত্রদের বিরুদ্ধে আছে। মোনায়েম উইথড্রো করবেন। প্রায় ২ শতক কেস ছাত্রদের বিরুদ্ধে চলছে, এরা কারা এরা আমাদের ছেলে, কেস উইথড্রো কর। আপনি ভূলিয়া যাবেন না আমার বন্ধু ফজলুল কাদের বলেছেন আর দালালি করব না কাজী কাদের তিনি কোয়ায় আজম খান নাই লেঃ শেখ নাই বাকী নাই আমাদের ফরিদপুরের জামান সাহেবও নাই। মন্ত্রীত্ব চলে গেলে বলে আয়ূব সাহেব বড় খারাপ। গভর্নমেন্ট আপনাদের ষ্ট্যাবল গভর্নমেন্ট আপনারা বাম ওয়ানেস গভর্ণমেন্ট সব জাগায় আয়ুব খান জাকির হোসেন নাই চট্টগ্রামের পাহাড়ের উপর বসে আছেন। আজম খান নাই, ফারুক সাহেব মন্ত্রী হইয়াছেন। এখন আছেন আমাদের মোনায়েম সাহেব মনে হয় আর বেশী দিন নাই। নূরুল আমিন আমাদের জেলে দিয়াছিলেন। ৫২ সালে

বাহির হইয়াছিলাম তিনিও বলেন অন্যায় করেছি। আপনারাও বুঝবেন সময় পার হয়ে গেলে। এখন বলছেন পাকিস্তানের লাহোর প্রস্তাব এটা মুসলীম লীগের পূর্ব বাংলায় মুসলীম লীগ সোহরাওয়ার্দী করেছেন যে মুসলমান লীগ আমরা করতাম পাকিস্তান সবার আগে তখন মোনায়েম কোথায় ছিল? আপনারা বলেন প্রস্তাব আর চলে না, লাহোর প্রস্তাবর ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার দেশের লোক ভোট দিয়াছিল লাহোর প্রস্তাব যারা না মান তারা পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না। লাহোরে তদানীন্তন ভারতের সমস্ত মুসলমান নেতারা যে প্রস্তাব করেন সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই দেশে ১৯৪৬ পাকিস্তান হয়। গণভোটের মাধ্যমে সেটা পাশ হইয়াছে, সেটাই বলবার কাহারো অধিকার নাই। লাহোর প্রস্তাব (মাইকের গোলমাল)

৫ম পর্যায়

আর চলবে না বেশীদিন, বহু সহ্য করছি, জেনে শুনেই নেমেছি। জানি অত্যাচার হবে, জানি জুলুম হবে। কেউ একজনের জমি দখল করলে সহজে ছাড়তে চায় না। আয়ূব খাঁও সহজে ছাড়বে না। এতকাল পর্যন্ত কোন কাগজপত্র নাই যে তারা হিসাব দেখাবে। দুইশত বছরে ইংরেজ যা শোষণ করে নাই। ১৮ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান তাই শোষণ করেছে। আজ পশ্চিম পাকিস্তানের সবাই একমত। মাওলানা মাওদুদী বললেন মুজিবর আর একটু গেলেই সব শেষ। উনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের লোক ৬ দফা চায় না। আমি বলি জাতিসংঘ থেকে একজন প্রতিনিধি আনা হউক তার মারফতে দেখা হউক ১৮ বছরে তোমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে কত টাকা নিয়ে গেছ। নিরপেক্ষ একজন লোক বসাও, তোমরা সবাই বস, দেখ ১৮ বছরে তোমরা কি করেছ। তারা এতে রাজী হতে পারে না। কেননা সব গুমর ফাঁক হয়ে যাবে। পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে আয়ূব খাঁ বলেন শক্তিশালী কেন্দ্র না হলে পাকিস্তান শক্তিশালী হয় না। আমি বলি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান শক্তিশালী না হলে পাকিস্তান শক্তিশালী হতে পারে না। এক হাত লুলা হলে আর এক হাত নিয়ে কাজ চলে না। দুই পাকিস্তান শক্তিশালী হলেই পাকিস্তান শক্তিশালী হয়। তুমি ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও আমাদের জন্য কিছু করতে পার নাই। সেইজন্য পূর্ব পাকিস্তানকে Self Sufficient করতে হবে সব দিক দিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের সব নেতা মৌলানা মওদুদী বলেন চৌধুরী মহম্মদ আলী বলেন, আয়ূব খাঁও বলেন ৬ দফা মানলে পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবে। ভাষানির মাওলানা সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদের দালাল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী আছেন কি? যুদ্ধের পর আয়ূব খাঁ পাকিস্তান থেকে ওয়াশিংটন যেয়ে বললেন জনসন সাহেব আমাকে

রক্ষা কর। সাম্রাজ্যবাদ দুই রকম হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী যারা ছিল তারা বিভিন্ন দেশ দখল করেছিল। একে বলে Territorial সাম্রাজ্যবাদ। আর একরকম অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ তারা শোষণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পাকিস্তানে আয়ূব খাঁ যে Govt. করেছেন সেই Govt. সমস্ত পাকিস্তানের সম্পদ অর্থাৎ দেশের ৮০ ভাগ সম্পদ কয়েকজন শিল্পপতি এবং কারখানার মালিকের হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা পূর্ব পাকস্তানকে শোষণা করেছে আয়ুব খাঁর মারফত। শোয়েবের অর্থনীতি আদমজীকে আরও বড় করেছে এবং আয়ূব খাঁর ছেলেকে ১৭ কোটি টাকার সম্পদের মালিক করে দিয়েছে। উনি বলছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দালাল আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে রাজী নয়। পরিষ্কার বলুন আয়ূব খাকে আমরা সমর্থন করি, তা বলেন না কেন? কেননা আয়ূব খাঁ হলেন সাম্রাজ্যবাদের দালাল তাকে খতম করতে পারলে আমরা পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারব। ৬ দফা আদায় করার পর যে দল ইচ্ছা ক্ষমতায় যাক আপত্তি নাই। আমাদের ক্ষমতায় আসার ইচ্ছা নাই। আয়ূব খাঁও সহজে ক্ষমতা ছাড়বে না। আপনি চায়না গিয়েছিলেন Govt. Party Leader হয়ে লেবানন গিয়েছিলেন। Govt. Party Support করেছিল আপনি Govt. Party র Leader হয়ে যান। আমরা বেশী কথা বলব না। কেন আমরা ৬ দফা দাবী করেছি? কারো সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নাই। এটা আওয়ামী লীগের নয় ৫ কোটি লোকের দাবী এটা যে অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের লোকে পাবে সেই অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেও পাবে। কিন্তু তারা এটা নিতে চায় না। কারণ এখন তারা দুই রকমভাবে খায় কেন্দ্রের খায় পশ্চিম পাকিস্তানের খায়। সেই জন্য তারা রাজী হয় না। আমি যে দাবী পূর্ব বাংলার জন্য করেছি, সেই দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও করেছি। কেন তারা রাজী হয় না? কারণ রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে কারণ মূলধন পশ্চিম পাকিস্তানে, Foreign Embassy সব পশ্চিম পাকিস্তানে। যদি এই সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে থাকত তাহলে তোমরা ৬ দফার চেয়ে বেশী চাইতে আমিও তোমাদেরকে দিয়ে দিতাম।

তাই পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কাছে বলি ১৮ বছর খেয়েছ আর খাওয়ার চেষ্টা করো ন। তুমি ৫ শতক কোটি টাকা দিয়ে রাজধানী কর আর আমার ব্যার জন্য টাকা পাই না। তোমার সমস্ত টাকা ফুরে গেছে। যুদ্ধ তোমাকে বাধাতে বলেছিল কে? ভুট্টু বলেছেন এক হাজার বছর যুদ্ধ করব। যারা বেশরমের মত কথা বলে বলে চায়না আমার বন্ধু, আমেরিকা আমার মিত্র যে গভর্নমেন্ট আমেরিকাকে মিত্র বলে সে গভর্নমেন্ট কি করে জনসাধারণের গভর্নমেন্ট হতে পারে?

আজ যদি ৬ দফা আমরা আদায় করতে না পারি তাহলে বাংলার মানুষ সর্বহারা হয়ে যাবে। আয়ুব খাঁর শক্তি জেনেই আমরা নেমেছি। যুবক ভাইয়েরা গ্রামে গ্রামে নেমে পড়ুন। আপনি জেল দিতে চান আর একটা জেল নূতন করে বানায়ে নেন। আজ লোকের পেটে খাওয়ার নাই, জেলে ভাত পাওয়া যাবে। জেলে গেলে প্রথমবার একটু পা কাঁপে দ্বিতীয় বার মন খারাপ হয় তৃতীয় বারে কিছুই হয় না। দেশের বড় দুর্ভক্ষ, মানুষ খেতে পায় না। ২০ লক্ষ লোক বেকার হয়েছে, বাংলাদেশে এদের আমি বলি চলুন, জেল খানায় যাই। সেখানে কাপড় পাবেন পরবার, ভাত পাবেন খাওয়ার, সেখানে ভাত কাপড়ের গ্রান্টি আছে। যদি ২০ হাজার লোক যোগাড় করতে পারি তাহলে লক্ষ লোক অমনি হয়ে যাবে। আয়ূব খাঁ তুমি মোনায়েম খাঁর কথা মত আবার অত্যাচার করার চেষ্টা করবে না। বাঙ্গালী যদি ক্ষেপে উঠে মুছিবত হবে, দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করতে চাই না। যদি গোলমাল করেন তাজন্য আপনি দায়ী আমরা দায়ী নই।

মোঃ সামসুল হক মিঞা
মোঃ শামছুল হক
গভর্নমেন্ট রিপোর্টারস,
২৫.০৪.৬৬ ইং।

উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch of Father of the Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Volume 10, p. 421.

পরিশিষ্ট: ১১

৬-দফার পক্ষে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আওয়ামীলীগের জনসভার বিবরণী

Proceedings of the public meeting held at satkania kasari maidan on 27.03.66 from 16.00 to 19.40 to 19.40 hrs. at the instance of Awami League Audiences-5000.
President- Mr. Sirajuddin Ahmed

1. Speaker Abdullah Al Haroon, Organising secy. Ctg. Awami League
শেখ মজিবুর রহমান লাহোর থেকে আসিয়া ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেছেন তাহা আমরা চট্টগ্রাম থেকে সর্ব প্রথম সমর্থন করিয়াছি। যে লাহোর প্রস্তাব মত পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লাহোর প্রস্তাব মত রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হয় নাই। এই ৬ দফা দাবী প্রতিষ্ঠা না হইলে পূর্ব পাকিস্তান আর্থিক দিক হইতে দূর্বল হইয়া আছে। গত পাক ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা Naval Hq প্রতিষ্ঠার দাবি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী নয়। আমরা ৭৫% বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন করি অথচ তার প্রায় সব অর্থ খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার জন্য। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল চায় না। আওয়ামী লীগ চায় আঞ্চলিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা, কুটির শিল্পস্থাপন, পূর্ব পাস্তিানিদের দৈহিক দিক দিয়া সময় অনুপযোগী বলা হইয়া থাকে অথচ আলম প্রশান করেছে।

2. Aminul Islam Choudhuri, M.N.A
বন্ধুগণ আজ দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাতে আপনারা ৬ দফা দাবী নিয়ে এই সভায় একত্রিত হইয়াছেন। এই ৬ দফা কি এবং কেন: ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক আবাস ভূমি হইবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হইয়াছে তাতে দেশের ৯০% অর্থ দেশের এক অংশের কিছু লোকের হাতে যাইয়া পড়িয়াছে। অথচ গ্রামবাসীদের কোন উন্নতি হয় নাই। আমরা পাট চাষ করি অথচ পাট চাষী পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না। পাট বিক্রি করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয় তা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে ব্যয় হয়। অথচ আমাদের American Aid এর ঢেউটিন কিনতে হয় প্রতি বান ১৬০ টাকায়। ৬ দফা দাবী করিলে আমরা

বিচ্ছিন্নবাদী বলে বলা হয়। বিচ্ছিন্নবাদী ওরা যারা বৃটিশ সাম্রজ্যবাদীর অধীনে ছোট ছোট চাকুরী করিতো। এখন গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করিয়া আছে। আমাদের দাবী বেঁচে থাকার দাবী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিবাদের নয়। যদি কেহ বলে ৬ দফা দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানকে কি ভাবে রক্ষা করিবে। পাক ভারতের ১৭ দিন যুদ্ধে যে ভাবে আমরা দেশকে রক্ষা করিয়াছি, সে ভাবে রক্ষা করিবো। ৬ দফা দাবী স্বয়ত্তশাসনের দাবী পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে প্রচার করুন ছড়ায়ে দেন।

3. Jahur Ahmed Chaudhuri, Labour Secy

শেখ মজিবুর রহমান লাহোর থেকে আসিয়া ৬ দফা দাবির উল্লেখ করিলে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অথচ একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক ইহাকে গৃহযুদ্ধ বিচ্ছিন্নতা হিন্দুদের সামনে চেয়ারে বসে নাই এই সব উক্তি করা হচ্ছে। ১৮ বৎসর যারা যারা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণা করিতেছে। এখন তারাই ৬ দফার বিরুদ্ধে আবোল তাবোল বলিতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের চা পাট বিক্রি করে ৭০% পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয় আর পূর্ব পাকিস্তানে খরচ করা হয় ৩০%। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা নায়। গোলাম মোহাম্মদ খাঁ হইতে পারে। খর মরুভূমি কি চাষাবাদ উপযোগী হইতে পারে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় না। আমরা যদি বিচ্ছিন্নবাদী তবে বিশ্ব আদালতে আমাদের বিচার কর। ইংরাজ ও হিন্দুরা আমাদের শোষণ করেছে, এখন পূর্ব পাকিস্তানীদের যে শোষণ করা হচ্ছে, তাহা কি হালাল। আমাদের হিন্দুদের গোলাম বলা হয়। এখন আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের গোলামে পরিণত হইয়াছি। শোষণের ফলে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আর মরুভূমি স্বর্ণপূরী হইয়াছে। রাজনীতিতে আপনি (President Ayub) দুর্নীতি আনিয়াছেন, সেভাবে Bonus Voucher এর মারফত Black Marketing প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিল্পপতিদের Tax Holiday দেওয়া হইয়াছে। তাই আপনারা ৬ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগে যোগদেন।

4. Mr. Siddique, President Ctg. dist. Awami League

Awami League অর্থ জনসাধারণের দল, মানুষ চায় বাঁচতে, তার খাওয়া পড়ার বাঁচার দাবী এবং সকল মানুষের ভোটের দাবী। Bonus Voucher এর মারফৎ সরকার Foreign Exchange খরিদ করিতেছে, ইহা কি দুর্নীতি নয়। এতে বিশ্বে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা কি ধরা পড়ে না, অথচ সরকার জোর গলায় প্রচার করে Devolpment হচ্ছে। দেশের লোকের জন্য দাবী দাওয়া করলে জেলে যাইতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক জন বিরোধী দলের নেতা জেলে আছেন।

5. Rafiqul Hossain Ex. M.P.A

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার মাইল। তাই আপনাদের দেখার সুযোগ হয় না পশ্চিম পাকিস্তানের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা কারো মতে ২২টি পরিবার কারো মতে ১৫০ পরিবারের উন্নতি মাত্র তারাই স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতেছেন। ৬ দফার প্রণেতা শেখ মজিবুর রহমান সাহেবের আগমন। শেখ মজিব জিন্দাবাদ ৬ দফা মানতে হইবে। বাংলার সন্তান শেখ মজিব জিন্দাবাদ, মিজানুর রহমান জিন্দাবাদ, M.A আজিজ জিন্দাবাদ, জহুর আহামদ জিন্দাবাদ, M.R. Siddique জিন্দাবাদ।

৬ দফার মোটামুটি কথা হইয়াছে এই যে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে আজ ১৮ বৎসর। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে আমাদের অনেক ভাজা হইয়াছে। এই ভাজা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ৬ দফা প্রনীত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান আইয়ুব খানের পায়ের মোজা। পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নরেরও আইয়ুবের পায়ের মোজা। পূর্ব পাকিস্তানীরা পায়ের মোজাকে সালাম করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানীরা কি গভর্নরকে নিয়োগ করিয়াছেন, করিয়াছেন আয়ুব খান, কেন্দ্রীয় সরকার।

6. Sk. Mojibur Rahman, President E.P. Awami League

(১৪ বৎসর) বহু বৎসর পূর্বে সোহরা্ওয়ার্দি সাথে সাতকানীয়া আসিয়াছিলাম। সেই সোহরা্ওয়ার্দি আজ আর নাই। বৈরুতের ১ হোটেলে তিনি মারা গিয়াছেন। আইয়ূব তাকে জেলে দিয়াছে তাহাতে সে মারা গিয়াছে। Ayub Khan আমাদের সমস্ত ক্ষমতা তার পকেটে রাওলপিন্ডি রাখিয়াছেন। ১৭ দিন যুদ্ধে আমাদের দেশে কামান, বন্দুক, বিমান, সৈন্য কিছুই আসতে পারে নাই ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ। ৬ দফা দাবী উঠাতে প্রেসিডেন্ট বেসামাল হইয়া গিয়াছেন। গৃহযুদ্ধের হুমকী জেল জলুম ইত্যাদি। আর রাজধানী, তাহা জিবনে দেখবেনও না, বাঙ্গালীর কোন ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরী বাকুরী কিছুই নাই। চট্টগ্রামে ১ খানা যুদ্ধ জাহাজ ছিলো না। কয়েক খানা ভাঙ্গা বিমান ছিলো। কয়টা সৈন্য ছিলো বাঙ্গালীরা যুদ্ধ জানে না। যেহেতু বাঙ্গালীরা ভাত খায় চিনারা ভাত খায়। একবার তাদের সাথে যুদ্ধ করে দেখুন না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের Tax পূর্ব পাকিস্তান আদায় করবে। কেন্দ্রের দরকার অনুযায়ী টাকা দিবো। আমরা বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন করি। ৭০% ভাগ পশ্চিমে খরচ হয় এই খানে ৩০% ভাগ। আর যদি ১৫

দিন যুদ্ধ হইতো তাহা হইলে কিছুই পাইতেন না। ব্যাংকে টাকা ছিলো না। ঢাকার ষ্টেট ব্যাংকে ১ তোলা স্বর্ণও ছিল না। ১৮ বৎসরে যা শোষণা করেছেন। বৃটিশেরা এইরূপ শোষণ করে নাই। যদি এই ৬ দফা দাবী বাঙ্গালী আদায় করতে না পারে তবে বাঙ্গালী বাংলায় আর ১০ বৎসর পরে থাকতে পারবে না। রাজস্বের ৬৪% দেশরক্ষায় খরচ হয়। অথচ বাংলায় ৫% খরচ করা হয় না। Rawalpindi স্থলবাহিনীর HQ, Naval Hq করাচী, বিমান বাহিনীর Hq পেশোয়ারে। অথচ বাংলায় ১টা Hqও নাই। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমন করে তবে কোন পাকিস্তানী তাহা মানবে না। প্রেসিডেন্ট C-in-C থাকাকালীন গোপনে অর্ডার দিয়াছে ২% বাঙ্গালী সেনাবাহিনীতে নিতে।

বাংলাদেশের জন্য যে কথা বলে সেই আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির নিকট দেশদ্রোহী। আমরা নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম করিবো যদি আমাদেরে বাধ্য করে তবে তার জন্য আমরা দায়ী নয়। এই জনগণেল ভোটে পাকিস্তান আসিয়াছে। আইয়ুব খান তাহা কাড়িয়া নিয়াছে। চট্টগ্রামে অনেকের ফাঁসী হইয়াছে আজ স্বাধীনতার ফল তারা ভোগ করিতেছে না। আজ তোমরা তোমাদের আমরা আমাদের। তৈয়ার হন আমাদের একজন কর্মি যদি জেলে যায় তাহা হইলে জেল ভরিয়া যাইবে। জেল খুব ভালো খাওয়া পরা পাওয়া যায়। বহুবার জেলে গিয়াছি দালালদের শেষ করিতে হইবে। যারা এই দেশে থাকিয়া আইয়ুবের দালালী করে। যারা জাতীয় পরিষদে বলে পূর্ব পাকিস্তানে Ordnanc Factory র দরকার নাই। পূর্ব ও পশ্চিম দূরত্ব ১৫০০ মাইল। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের বাজারে পরিণত হইয়াছি। আমরা প্রশ্ন করি পশ্চিম পাকিস্তানে স্বর্ণের দাম প্রতি তোলা ১২০ টাকাএবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৫০ টাকা পূর্ব পাকিস্তানের কোন লোক বিমানে তেজগাঁও আসলে তল্লাশী করে স্বর্ণ আনিয়াছে কিনা। কেননা এই স্বর্ণ ভারতে Smuggling হইবে। যুদ্ধের সময় খেমকারণ দখল করার পর তথায় ৪০ লক্ষ মন গম পাওয়া গিয়াছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানীদেরে চোরাচালানী বলা হয়। Marital Law হবার পর আরব সাগরে ২৭ মন স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। কর্ণফুলী মেঘনা শীতলক্ষাতে পাওয়া যায় নাই। পূর্ভ পাকিস্তানে যে টাকা শিল্পপতিরা আয় করে তাহা এই খানে ব্যয় করতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে শুধু পাটের টাকায় শিল্প গড়িয়া উঠিলে একটা লোক এইখানে গরীব থাকতো না। Ayub রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া করাচী হইতে রাজধানী Rawalpindi নেয়। Rawalpindi হইতে Islamabad নিয়া ৫০০ কোটি খরচ করা হয়।

আমার বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা হয় না। Cyclone হইলে মোনায়েম আসে Helicopter য়ে ৩ মন ধান ১০ খানা কম্বল কয়েকটা টাকা কত দরদ। লেভী ব্যবস্থায় ধান ক্রয়। ধান

ক্রয় বিদেশ হইতে করা হয় না কিনা। দেশেল লোক ভাত খাইতে পায় না। আবার ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত Tax যুদ্ধে ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধ বাধালে কেন? যুদ্ধ করিতে যাইয়া খোয়াইয়া আসিয়াছে। একটা লোক মরতে গিয়া কাপড় খুইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন যুদ্ধ চলিলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাইতো। আইয়ূব খান বলেন আমরা নাকি বাঙ্গালীর জাত কোন দিন জুতা পরিয়া হিন্দুদের সামনে যাইতো না। আইয়ূব খান আপনি কি ছিলেন কত টাকা বেতন পাইতেন। ৫ কোটি বাঙ্গালীকে গোলাম বলিয়াছে। পাকিস্তানের নাগরিক সকল তোমার কাছে সমান হওয়া উচিৎ। তুমি (President) গোলাম ছিলে। Left Right করিতে অথচ আমরা বাঙ্গালীদের গোলাম বল। ইতিহাস জান না।

বাংলার নৌয়াব সিরাজদুল্লা নিজের হাতে জুতা না পরার দরুণ মাথা দিতে হইয়াছে। এখন প্রস্তুত হন। ত্যাগের জন্য বেশী নয় ২০,০০০ কর্মী। ২০,০০০ লোক জেলে ঢুকারে Ayub Khan হইতে আমরা ৬ দফা দাবী আদায় করতে পারিবো। এটা মনে রাখবেন আল্লায় না মারিলে Ayub Khan এর গুলির আঘাতে মরিবো ন। তারা ধরতে আসুক আমরা জেলে যাবো। গুলি মারে বুক পেতে দিবো। সুরাবদ্দী জখন জেলে গিয়াছে তখন আমরা জেলকে কেন ভয় করিবো।

7. Mizanur Rahman Chaudhuri M.N.A.

যদিও জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হই নাই। আজ ৪/৫ বৎসর আওয়ামী লিগের মারফৎ আমরা আমাদের বক্তব্য বলিয়া আসিয়াছি। Ayub, Monayem খানের সাথে আমার বিরোধ নিতির বিরোধ। আমাদের ভোটাধিকার আর্তিক অধিকার কাড়িয়া নিয়াছে। Ayub Khan অর্থনৈতিক Council Head হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ২৪০০ কোটী টাকা বাংলার বুকে ছুরী মারিয়া নিয়া গিয়াছে। আমার পাটের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে শত শত শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে একজন শ্রমিক হওয়ার ভাগ্য আমাদের জোটে না। Azam Khan Tidal bore cyclone থেকে চট্টগ্রাম নোয়াখালী,বরিশাল, খুলনা বাঁধ নির্মাণে ৯০ কোটী টাকার একটা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে তাহা কোথায়। সমগ্র পাকিস্তানকে বন্ধক দিয়া ১৫০০ কোটি টাকা কর্জ্জ করে সব পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হচ্ছে। অথচ তাহা সুদে আসলে পাকিস্তানের ১০ কোটী লোককে পরিশোধ করতে হইবে। স্বাধীনতার অর্থ এই নয়। সাদা চামড়া চলে গেলে বাদামী চামড়া শোষণ করিবে। করাচীতে ১২ টা হাসপাতালে তার মধ্যে ৬ টা mobile তাহা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হইয়াছে, ১ খানাও পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় নাই। এইবার ১ কোটি টাকার টিন কিনার কথা ছিলো কিন্তু এখন তাহা আর কিনা হইবে না।

নগদ টাকায় টিন কিনলে প্রতি টন ১২০০ টাকা আর Aid যা বাকি কিনলে প্রতি টন ২০০০/২১০০ পড়ে। তাই আমার গরীব চাষিরা ৭০ টাকার পরিবর্তে প্রতি বান টিন ১৬০ টাকায় কিনেত হয়। আগের রাজনীতিকরা দুর্নীতিবাজ ছিলেন প্রেসিডেন্টের ছেলে কিছুদিন পূর্বেও সিলেটে কেপ্টেন ছিলো তাহাকে চাকুরী হইতে নিয়া শিল্পপতি করা হইয়াছে। এখন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ১৭ কোটি টাকার মত আর প্রেসিডেন্ট বেহায়া। আমরা দুর্নীতিবাজ না আর কে। এমন লজ্জার ব্যাপার আমাদের ভোটাধিকার হরন করা হইয়াছে। যদি ১৭ দিনের যুদ্ধ আরো দেড় মাস চলিতো তবে পূর্ব পাকিস্তান অচল হইয়া যাইতো। কারণ State Bank এর ঢাকায় কোন স্বর্ণ ছিলো না। আর ভারত আক্রমন করিয়া অধিকার করিয়া নিলে আমাদের ঢাকা আর চলতো না।

ছয় দফার ব্যাখ্যা

এইবার যা লোক ভর্তি করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ৯২% পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। ১৯৫৬ সালে Deputy Commander Naser Ali Khan Circular করে দিয়াছে বাঙ্গালী ২% মিলিটারীতে ভর্তি করা হইবে এর বেশী নয়। বাঙ্গালীরা জান দিয়াছে জমি দেয় নাই।

8. President Sirajuddin Ahmed

সাতকানীয়া অধিবাসীর পক্ষ হইতে ওয়াদা দিতেছি যে, আমরা ৬ দফা দাবীর জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করিবো।

Resolutions:

১। ৬ দফা মানিয়া নিয়া দেশের গণতন্ত্র চালু
২। সাতকানীয়া কলেজ BSc এবং উন্নয়নের মধ্যে ফেলা হোক
৩। ডলুব পোল
৪। সাতকানীয়ার জনকল্যান
৫। জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে প্রবর্তন
৬। নোয়াবজাদা নসুরুল্লা সহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি হলিয়া প্রত্যাহার
৭। ডা. মাহমুদের তদন্ত
৮। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গুলির নিন্দা
৯। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালু
১০। হেলিকপ্টার দুঃ ডাঃ মাহফুজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে।

Recorded by me,
Sd/SI, DIO
Satkania
27.03.66

আবদুল মন্নান, এম ইউ সি, ২৭.০৩.৬৬
Written in my presence. Sd/27.03.66

উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch of Father of the Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Volume 10, p. 334

পরিশিষ্ট: ১২

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত স্থিরচিত্র

The New York Times.

LATE CITY EDITION

NEW YORK, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1965 TEN CENTS

AUTO TOLL NEARS HIGH FOR HOLIDAY; ONE DEATH IN CITY

INDIAN TROOPS DRIVE ON LAHORE; PAKISTAN CHUTISTS RAID PUNJAB; THANT TO FLY ON A PEACE MISSION

Downed U.S. Pilot Saved Off Vietnam

HE WILL GO 'SOON'

U.N. Chief Responds to Council Call for Maximum Effort

FIGHTING IS HEAVY

New Delhi's Forces Reported Near City —Planes in Action

HURRICANE WINDS LASH AT BAHAMAS

Storm Heads Toward Cuba —Southeast Florida Coast Is Struck Glancing Blow

Ayub Exhorts Pakistanis, Warns 'We Are at War'

পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়ে The New York Times পত্রিকার খবর।

উৎস: মোরশেদ শফিউল হাসান, স্বাধীনতার পটভূমি, ১৯৬০ দশক।

পৃ- ১৬০

স্কোয়াড্রন লিডার আলম। যিনি পাক-ভারত যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন।
উৎস- মোরশেদ শফিউল হাসান, স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৪, পৃ- ১৬০

তাসখন্ড চুক্তি স্বাক্ষরের পর করমর্দনরত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (মাঝে), ভরতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (বাঁয়ে) ও সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন (ডানে)। আইয়ুবের পেছনে জুলফিকার আলী ভুট্টো (বাঁয়ে) ও খাজা শাহাবুদ্দীনকে (ডানে) দেখা যাচ্ছে। উৎস- মোরশেদ শফিউল হাসান, স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ- ১৬০

পরিশিষ্ট: ১৩

৬-দফা সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থির চিত্র

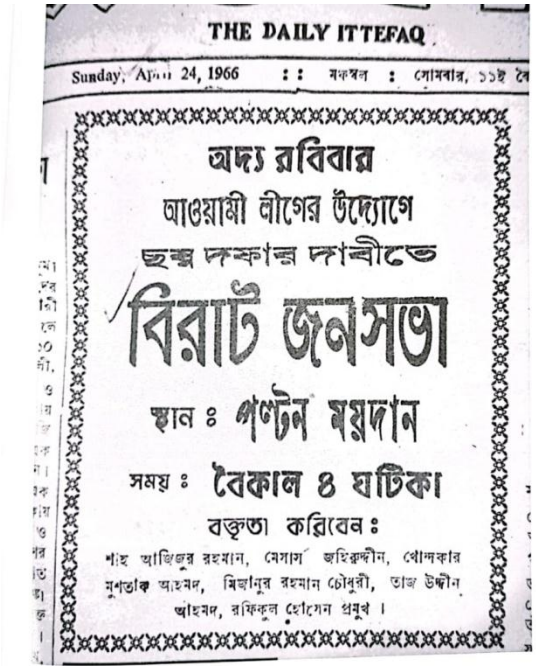

THE DAILY ITTEFAQ

Sunday, April 24, 1966 : : মফস্বল : সোমবার, ১১ই বৈ

অদ্য রবিবার

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে

ছয় দফার দাবীতে

বিরাট জনসভা

স্থান ঃ পল্টন ময়দান

সময় ঃ বৈকাল ৪ ঘটিকা

বক্তৃতা করিবেন ঃ

শাহ আজিজুর রহমান, মেসার্স জহিরুদ্দীন, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, তাজ উদ্দীন আহমদ, রফিকুল হোসেন প্রমুখ।

৬ দফার পক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত পল্টনে জনসভার পোস্টার।

উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ লাহোর: শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাঙালির মুক্তির সনদ

লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬ দফা ঘোষণা।

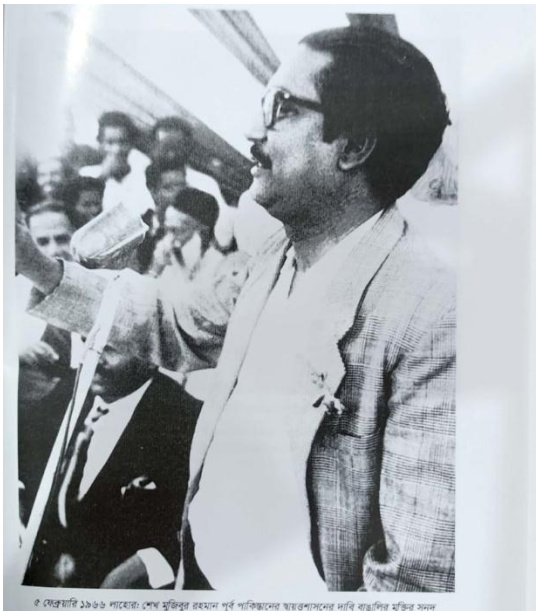

উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 547.

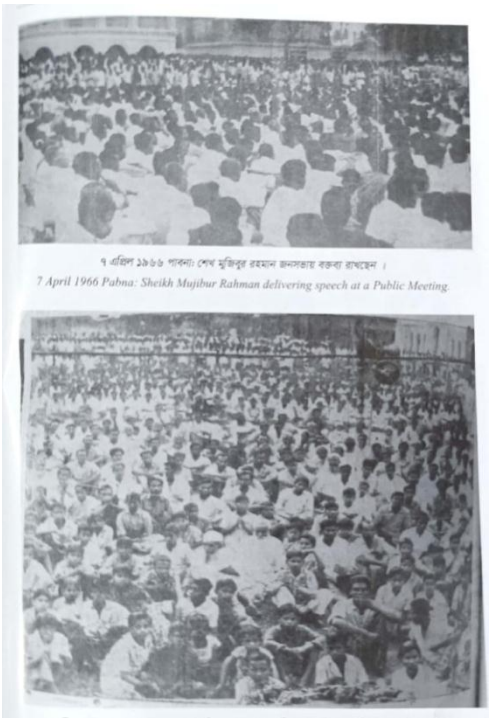

৭ এপ্রিল ১৯৬৬ পাবনা: শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় বক্তব্য রাখছেন।

7 April 1966 Pabna: Sheikh Mujibur Rahman delivering speech at a Public Meeting.

৬ দফার প্রচারনার লক্ষ্যে পাবনা ও রংপুরে শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভা। উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 551.

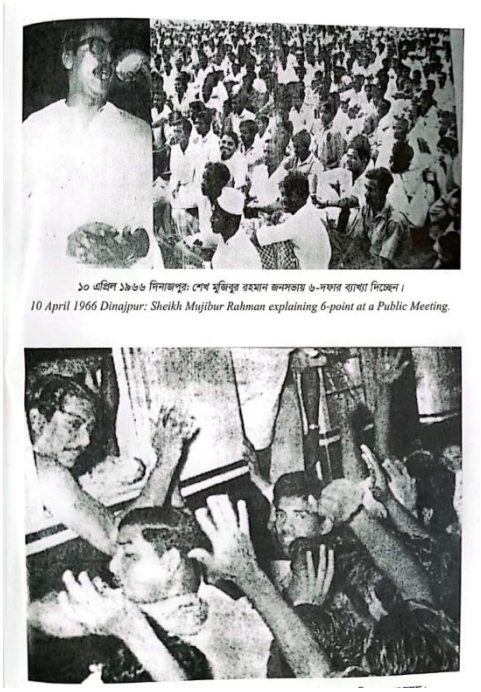

১০ এপ্রিল ১৯৬৬ দিনাজপুর: শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় ৬-দফার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।
10 April 1966 Dinajpur: Sheikh Mujibur Rahman explaining 6-point at a Public Meeting.

দিনাজপুর ও সিলেটে ৬ দফা প্রচারনায় শেখ মুজিবুর রহমান। উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 553.

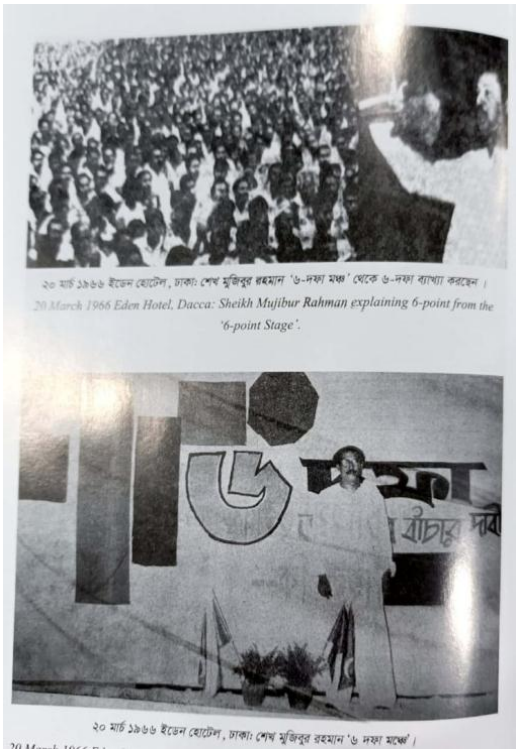

২০ মার্চ ১৯৬৬ ইডেন হোটেল, ঢাকা: শেখ মুজিবুর রহমান '৬-দফা মঞ্চ' থেকে ৬-দফা ব্যাখ্যা করছেন।
20 March 1966 Eden Hotel, Dacca: Sheikh Mujibur Rahman explaining 6-point from the '6-point Stage'.

২০ মার্চ ১৯৬৬ ইডেন হোটেল, ঢাকা: শেখ মুজিবুর রহমান '৬ দফা মঞ্চে'।

ঢাকার ইডেন হোটেলে ৬ দফা ব্যাখ্যারত অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান। উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 550.

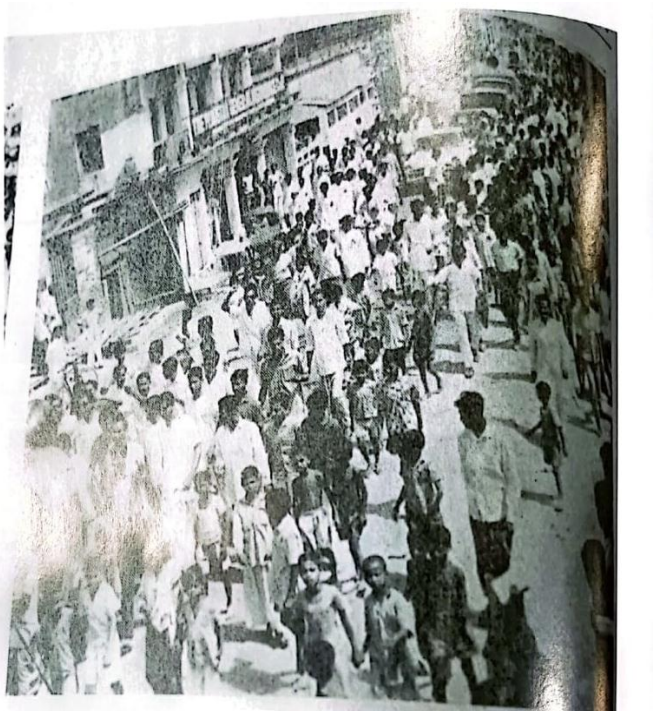

৬ দফার জনসমাবেশ শেষে সাধারণ জনগণ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা। উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 552.

লাহোরে ৬ দফা ঘোষণার পরে দেশে ফিরছেন শেখ মুজিবুর রহমান। উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 10, Page 584.

সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) সমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান।
উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 09, Page 684.

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্মিলিত বিরোধীয় দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী ও মিস ফাতেমা জিন্নাহ।
উৎস: Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Vol 09, Page 684.

পরিশিষ্ট: ১৪
১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত স্থিরচিত্র

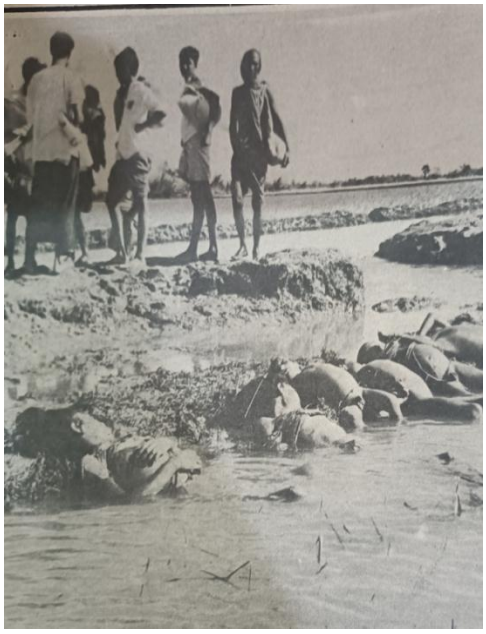

ঘূর্ণিঝড়ের পরে ভেসে উঠেছে মানুষ ও পশুর মৃতদেহ।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা 'হেলপ'এর ত্রাণসামগ্রী নিয়ে চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবীরা।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্ম।
উৎস: দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর, ১৯৭০।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী চরে ভেসে ওঠা মানুষের মৃতদেহ।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

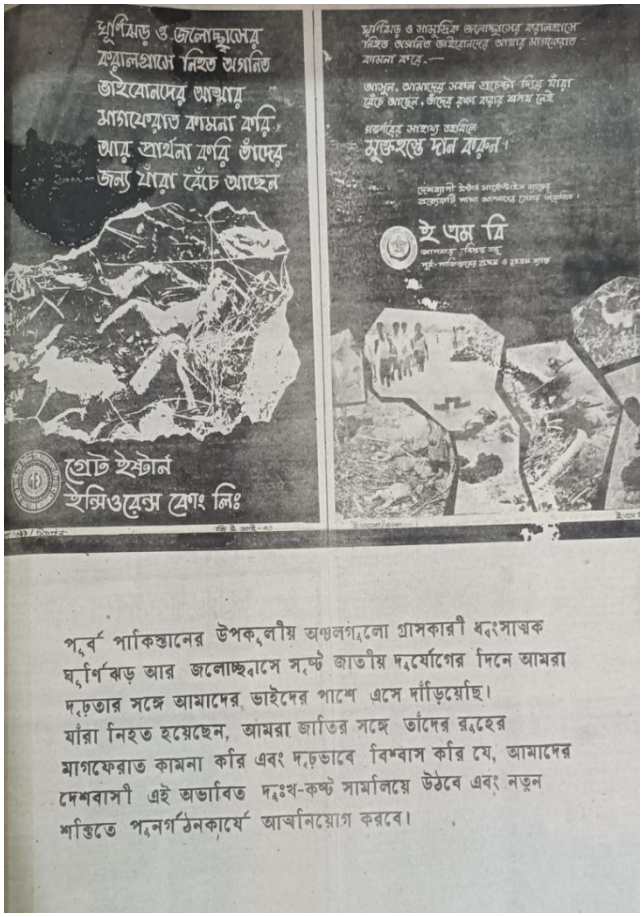

দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আহবান।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর, ১৯৭০।

জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী শংকাগ্রস্থ মানুষ।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

ঘর হারানো মানুষগুলো রিক্ত অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

অনাহারী মানুষ মাটিতে পড়ে থাকা খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

আপনজনদের হারিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ এই নারী।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

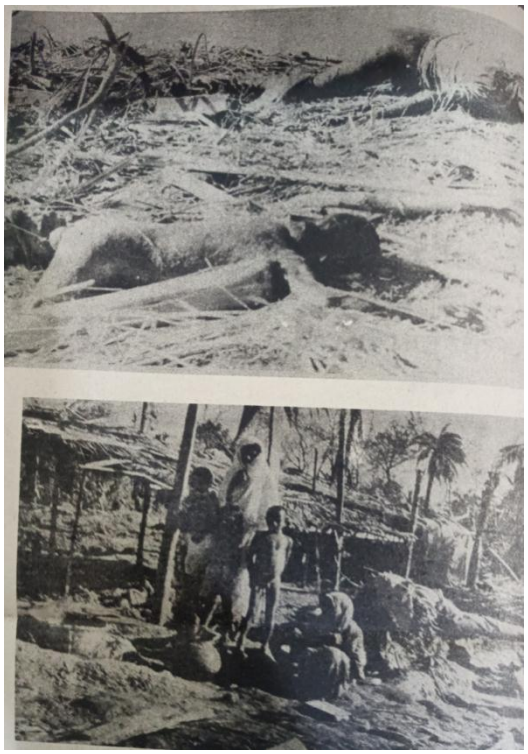

আবর্জনা স্তূপে পড়ে আছে মানুষের মৃতদেহ (উপরে), রিক্ত পরিবারটি অসহায়ভাবে বসে আছে ভাঙা ঘরের সামনে (নিচে)।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

বীভৎস হয়ে উঠেছে লাশগুলো (উপরে), কাঁদায় মিশ্রিত খাবার কুড়াচ্ছে দুই নারী (নিচে)। **উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।**

ঝড়ের রাতে গাছ ও মাটির নিচে নিহত মানুষের মৃতদেহ। উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

সেই দুঃস্বপ্নের রাতে ঘূর্ণিঝড়ের করাল গ্রাস মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এমনি অসহায় কচি শিশুকে —দৈনিক পাকিস্তান

নাবালক শিশুও ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব থেকে রক্ষা পায়নি।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

চরে ভেসে ওঠা মৃতদেহের বীভৎস ছবি।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

মানুষ ও সাপ মরে পড়ে আসে পাশাপাশি। উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৬৫।

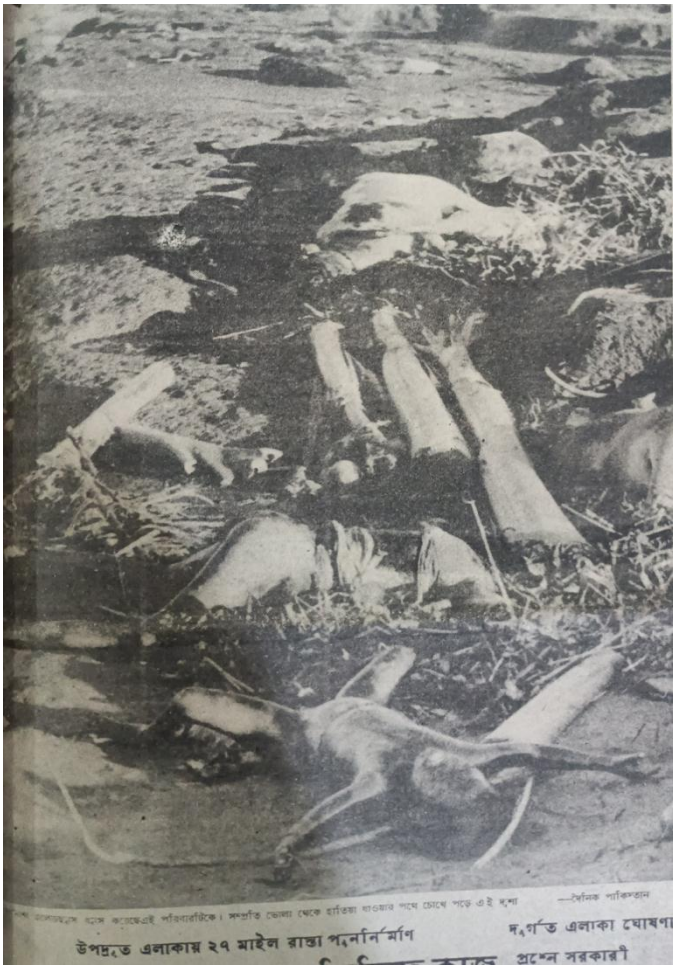

জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে একটি পরিবারের সবাই নিহত।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

ভেসে আসা লাশের বীভৎস রূপ। শনাক্ত করার কোন উপায় নেই।
উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

মা সহ সদ্য প্রসবজাত সন্তানের মৃতদেহ। ঘূর্ণিঝড় রেহাই দেয়নি ভোলার এই পরিবারটিকে। উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

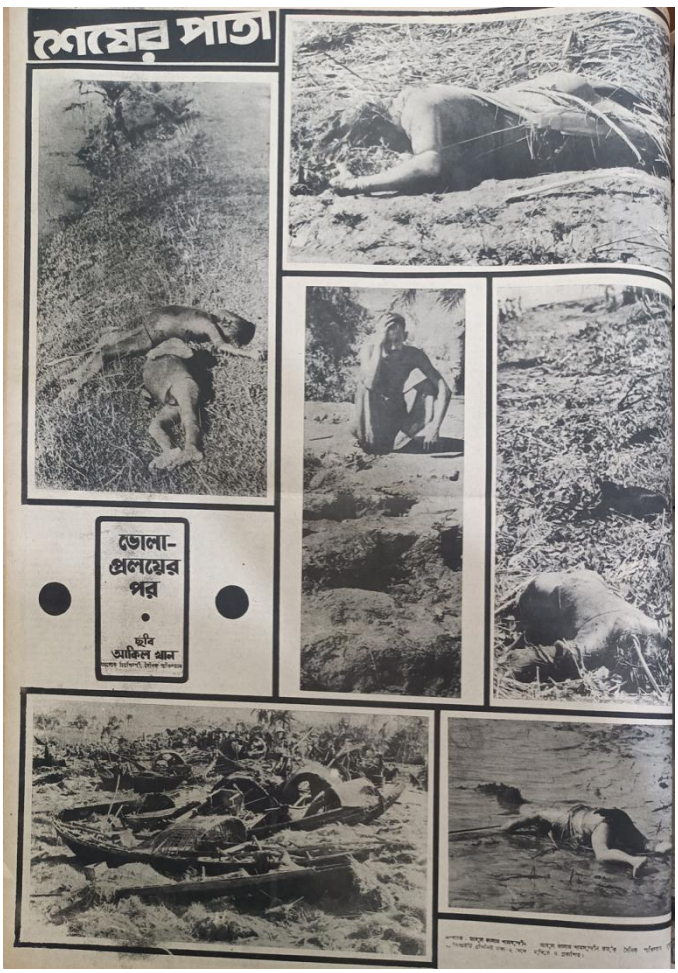

প্রলয়ের পর দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার রিপোর্টারের উঠানো কিছু মর্মান্তিক ছবি। উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

কাদামাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যেন এই মৃহ দেহটি। উৎস: দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

পরিবার পরিজন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে ছবির লোকটি (বামে), বি:ৃ -
মৃতদেহ দেখে প্রকৃত লোকটাকে যেন চেনার উপায় নেই (ডানে),
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

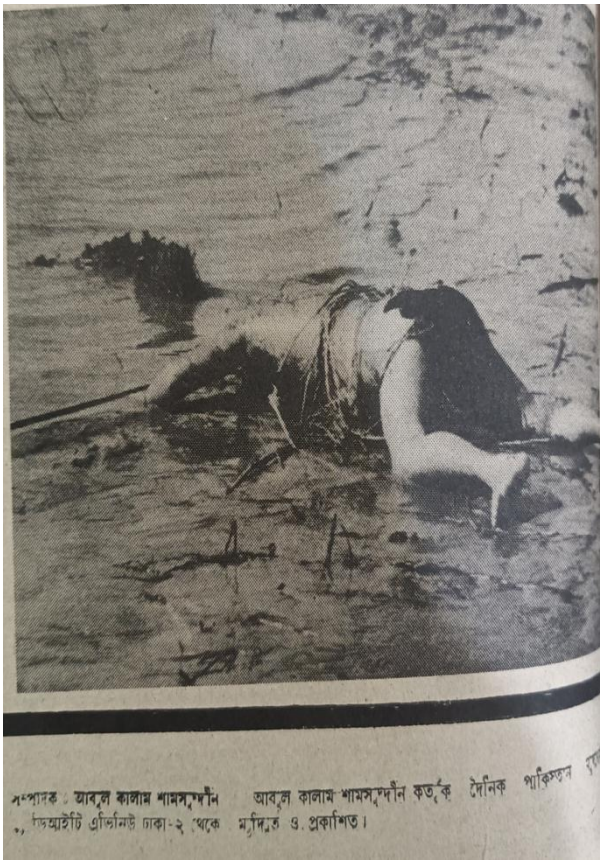

নদীর চরে ভেসে ওঠা এক বালকের মৃতদেহ।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

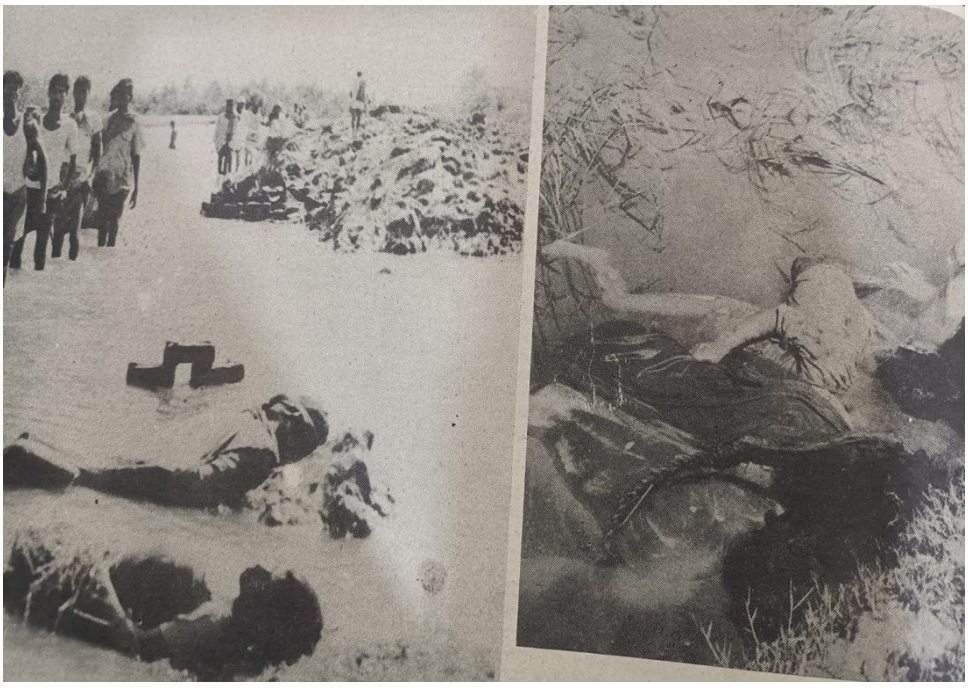

পরিচিতজন কিনা-সেটা দেখতে এসেছে বানভাসী জীবিত মানুষেরা (বামে), শেষ যাত্রায় মা ও সন্তান যেন
একে অপরকে ছাড়তে চায়নি (ডানে)
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

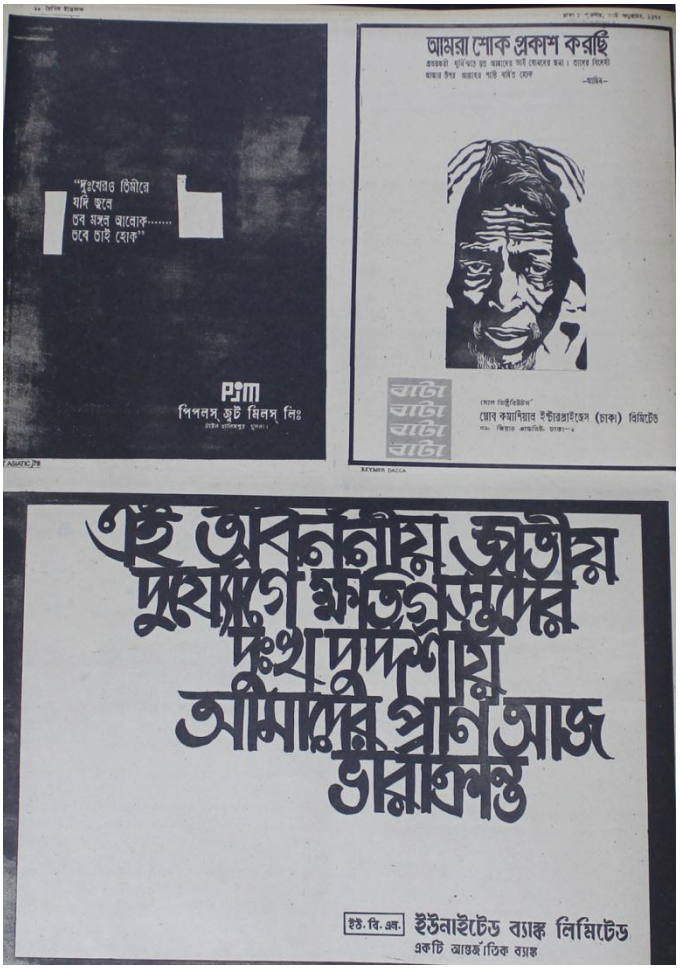

দূর্গত মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ অগ্রহায়ন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

বিশৃঙ্খলভাবে দুইটি শিশুর নিথর দেহ পড়ে আছে। উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

মানুষ আর পশুর লাশে একাকার ভোলার চরাঞ্চল। এ যেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত কোন বিরান ভূমির ছবি। উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭০।

পানি সরে যাওয়ার পর এক বাবা তার স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে হন্যে হয়ে খুজছে। উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৬৫।

নাম না জানা এক মানুষের লাশ পড়ে আছে মাটিতে।
উৎসঃ দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ১৯৬৫।

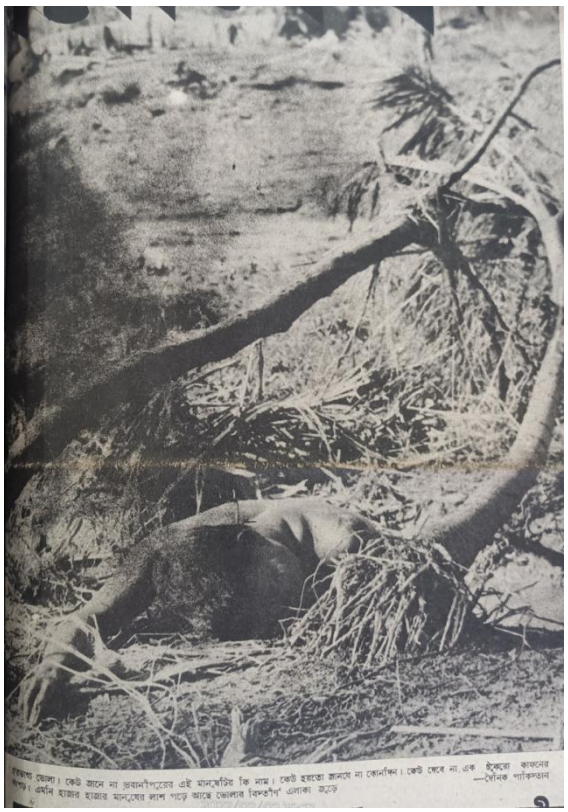

Union Council Leader checking master roll to be sure relief distribution is fair.
Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-158.

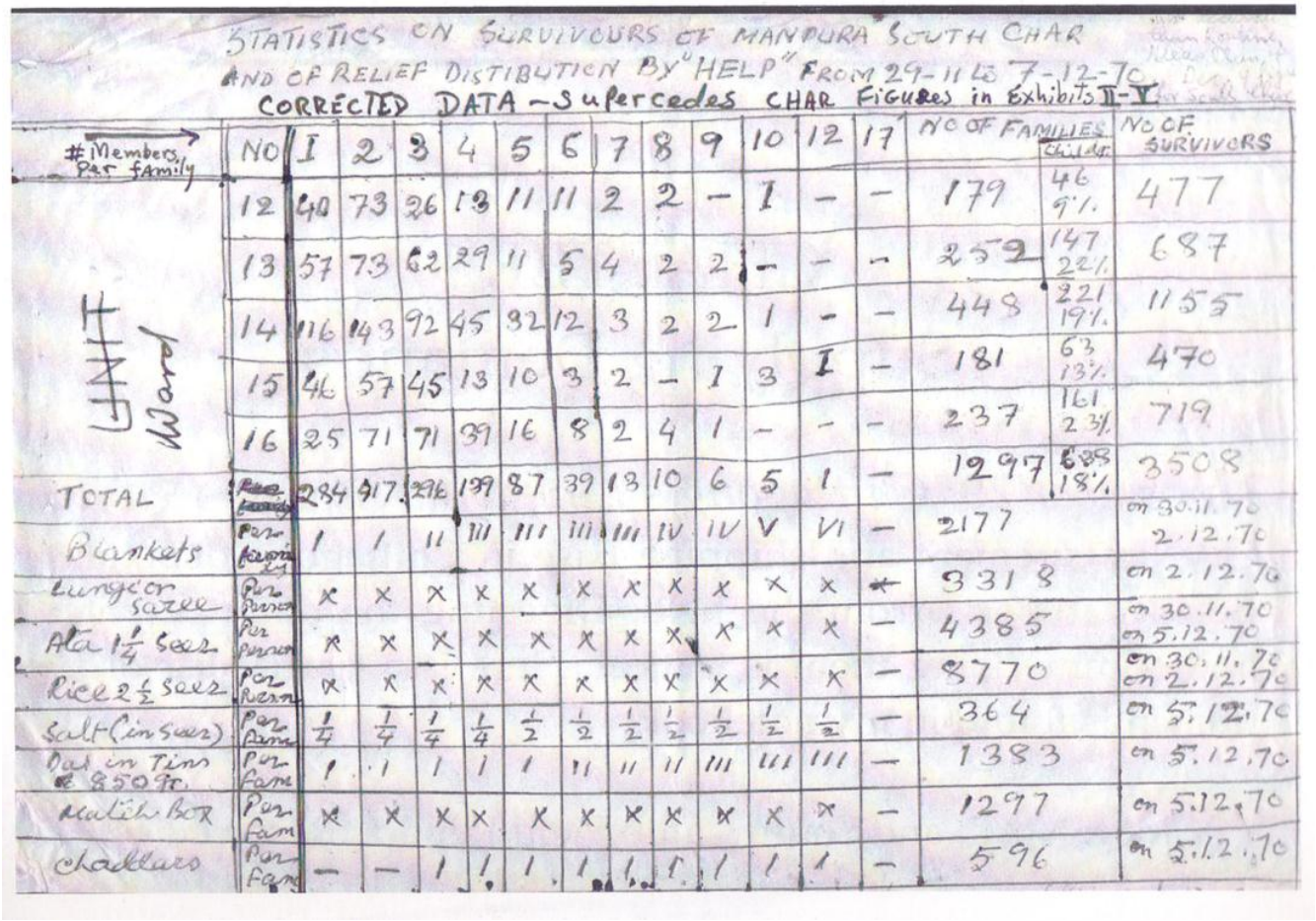

STATISTICS ON SURVIVOURS OF MANPURA SOUTH CHAR
AND OF RELIEF DISTIBUTION BY "HELP" FROM 29-11 to 7-12-70
CORRECTED DATA — Supercedes CHAR Figures in Exhibits II-V

# Members, Per family →	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	17	NO OF FAMILIES	Children	NO OF SURVIVORS
UNIT Ward	12	40	73	26	13	11	11	2	2	—	1	—	—	179	46 9%	477
	13	57	73	62	29	11	5	4	2	2	—	—	—	259	147 22%	687
	14	116	143	92	45	32	12	3	2	2	1	—	—	448	221 19%	1155
	15	46	57	45	13	10	3	2	—	1	3	1	—	181	63 13%	470
	16	25	71	71	39	16	8	2	4	1	—	—	—	237	161 23%	719
TOTAL	Per family	284	417	296	139	87	39	13	10	6	5	1	—	1297	638 18%	3508
Blankets	Per family	1	1	11	111	111	111	111	IV	IV	V	VI	—	2177		on 30.11.70 2.12.70
Lungi or Saree	Per person	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	3318		on 2.12.70
Ata 1¼ Seer	Per person	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	4385		on 30.11.70 on 5.12.70
Rice 2½ Seer	Per person	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	8770		on 30.11.70 on 2.12.70
Salt (in seer)	Per fam	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	—	364		on 5.12.70
Dal in Tins @ 850 gr.	Per fam	1	1	1	1	1	11	11	11	111	111	111	—	1383		on 5.12.70
Match Box	Per fam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	1297		on 5.12.70
Chaddars	Per fam	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	596		on 5.12.70

Data sheet of relief distribution on South Char.
Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone.
Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-159.

Engineering student giving out relief supplies.
Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone.
Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-108.

The line for women and children.
Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone.
Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-106.

Receiving relief food. Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-154.

Volunteer doctor conducting a medical examination (Up). One of the few female survivors (Down). Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-94.

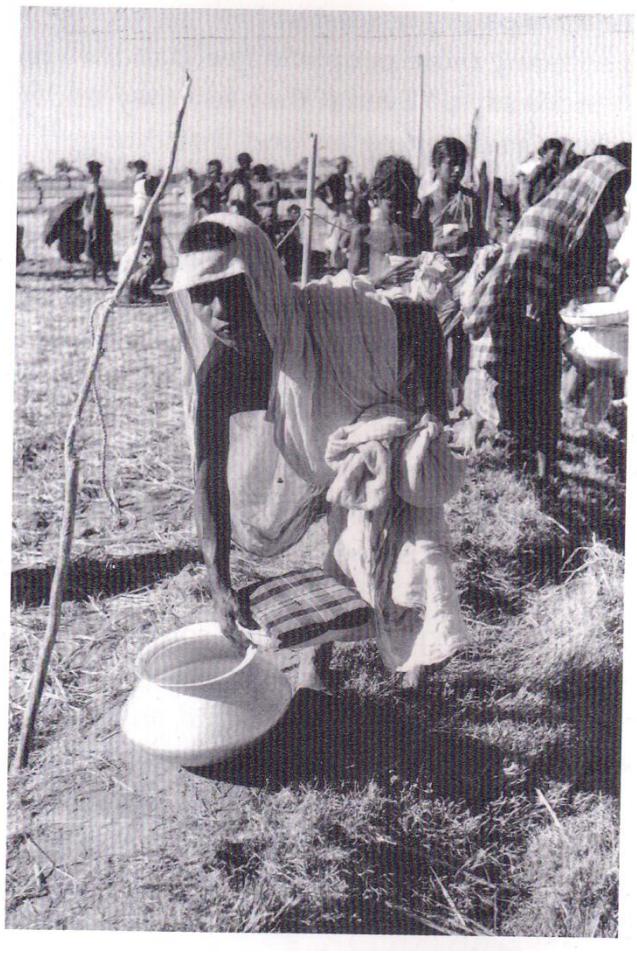

Cyclone victim with relief supplies from HELP. Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-98.

ত্রাণবাহী হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় দূর্গত জনগণ. Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-105.

Dhaka University Institutional Repository

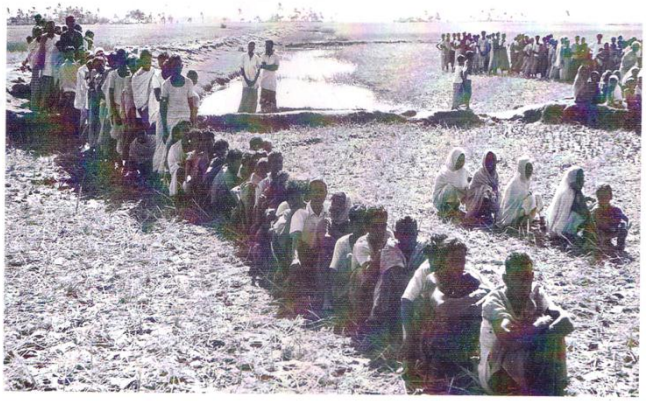

ত্রাণের অপেক্ষায় সারীবদ্ধভাবে বসে আছে দূর্গত মানুষ। Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-104.

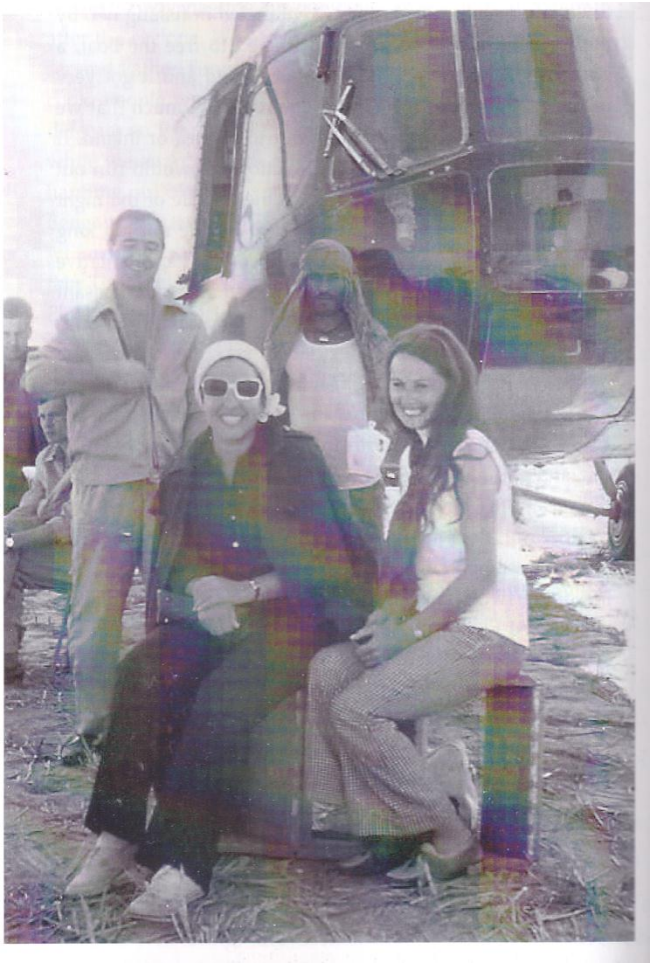

রুশ পাইলটদের সাথে দুইজন স্বেচ্ছাসেবী। Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-228.

দূর্গত মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ। Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-92.

Dhaka University Institutional Repository

ত্রানের জন্য অপেক্ষারত বানভাসীরা। Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-224.

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দিয়ে ত্রাণ বিতরণ কার্য্যক্রম। Source: Cornelia Rohde, CATALYST, In the Wake of great Bhola Cyclone. Shahitya Prakash, Dhaka- 2015, p-161.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০-এর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এই দুর্যোগের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অনীহা ডিসেম্বরের নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিলো। উৎস- গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ১৫

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্থিরচিত্র

মানুষের কাঁধে বৃদ্ধা শরনার্থী। উৎস- গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, একটি নির্দলীয় ইতিহাস, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০৩

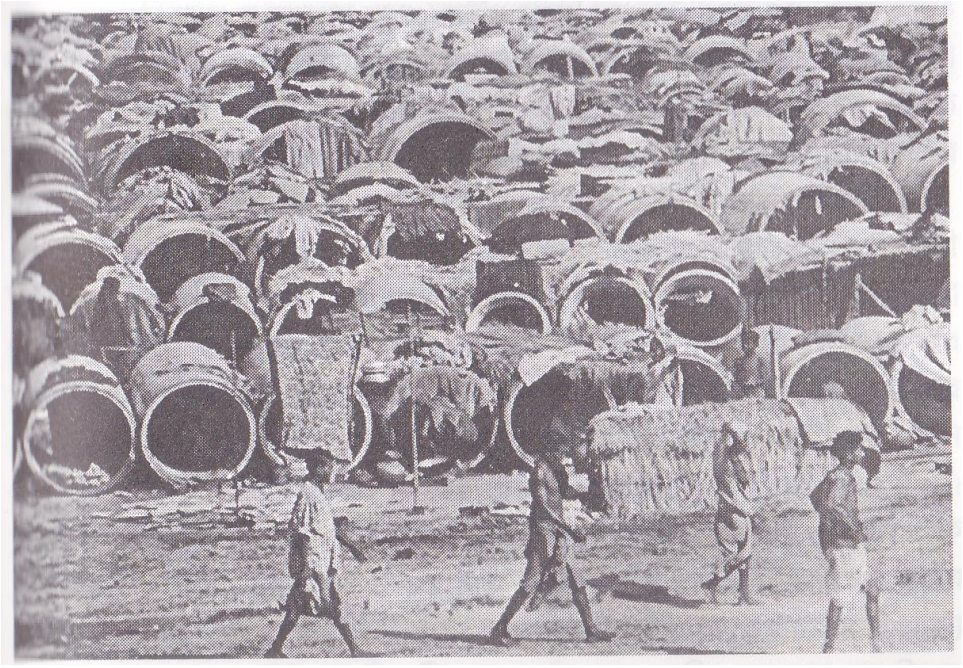

কলকাতার শরণার্থী আশ্রয় শিবির। উৎস- গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, একটি নির্দলীয় ইতিহাস, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ-১০১

Dhaka University Institutional Repository

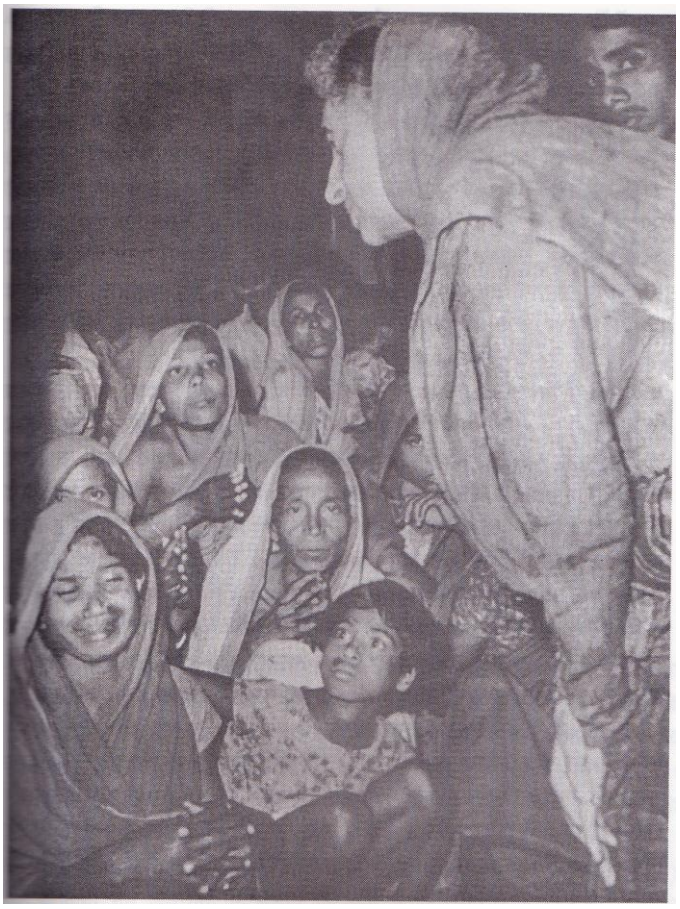

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
উৎস- গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, একটি নির্দলীয় ইতিহাস,
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ-১০৫

ভারত অভিমুখী শরণার্থী।
উৎস- গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, একটি নির্দলীয় ইতিহাস,
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ-১০০